পিতৃদেব ৺রামলাল হালদার

ও

মাতৃদেবী ৺হরিপ্রিয়া দেবী-র

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের কয়েকখানা গ্রন্থ :

শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন (C. U.) (সম্পাদিত)

লোকসাহিত্যের ত্রিধারা (মঙ্গলকাব্যের সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা

সাহিত্যের গল্প

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যে
অতীন্দ্রিয়বাদের
ভূমিকা

ভূমিকা

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব মনে জাগ্রত আছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই মানব মন অধিকার করে থাকে। অতি শৈশবে শিশুরাও পূজা অর্চনার দিকে আকৃষ্ট হয়। ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ তারা বোঝে না, মন্ত্রের অর্থও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু ভক্তির ন্যূনতা বা শ্রদ্ধার অভাব থাকে না শিশু মনে। আস্তিকের কথা ধরছি না, কিন্তু অতি সাধারণ লোকের মাথাও নত হয় দেবতার চরণে, যখন সে অতিক্রম করে কোন দেবালয়। আবার অর্থ বুঝতে না পারলেও সাধারণ লোককে দেখেছি অতীব ভক্তির সংগে শুনতে গীতা, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ। তাদের চোখ-মুখের ভাবে দেখেছি আনন্দের উচ্ছলতা।

আনন্দই ব্রহ্ম। শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা শুনলে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস ব্রহ্ম লাভ হয় সেই মুহূর্তে। এই আনন্দ বা ব্রহ্ম লাভ হয়ত সাময়িক, কিন্তু সাময়িক হলেও এ অমূল্য। কোন ভাবেই হয় না এর কোন প্রকার তুলনা। গীতায় শ্রীভগবান্ তাই বলেছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তত্‌পরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯। ৪ অঃ

সুতরাং শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধর্মকথা শুনলে পরমজ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানই পরম আনন্দ লাভের সোপান। কারণ এই জ্ঞান থেকেই ধ্যানের ইচ্ছা জাগে মনে। আর এরই পরিণতিতে আসে মনে পরম আনন্দ। এই আনন্দ অহেতুক। অহেতুক আনন্দ লাভই ব্রহ্মলাভ।

একটা ঘটনার কথা বলছি। সেটা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমি তখন প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষক। আমার জন্ম পল্লী কানাইদিয়াতে (খুলনা জেলা, অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) একটি আখড়া ছিল। ঐ আখড়াতে নিয়মিতভাবে গীতা, চৈতন্য ভাগবত আর চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেছি আমি বহুদিন। নিজের কথা বলছি। ঐ গ্রন্থগুলির মর্মার্থ বা অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারিনি যেমন তখনও, পারি না তেমন ঠিক এখনও। কিন্তু আনন্দ লাভের ব্যাঘাত ঘটেনি কোন দিনও।

প্রাচীন আর্যঋষিরা ধ্যানধারণা করতেন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম লাভের জন্য। ঈশ্বরোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ হয়েছিল তাঁদের—এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস। তাঁদের সেই উপলব্ধ সত্য দান করেছেন আমাদিগকে নানা ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে।

ধর্মগ্রন্থগুলিতে তাঁদের সাধনার ফল যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে তার মূলে আছে ঐ আনন্দ লাভ। কিন্তু আনন্দ হল অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। আনন্দ বর্ণনাতীত। আনন্দ অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য হলেও অধস্তন পুরুষকে লব্ধ আনন্দ দান করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি তাঁরা। আর তাঁদের সেই প্রচেষ্টা যে ফলবতী হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ পেয়েছি আমরা আমাদের অমূল্য ধর্মগ্রন্থগুলি।

আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইহা অবাঙ্‌মনসগোচর। তাই ইহা অতীন্দ্রিয়। উপলব্ধিই এর একমাত্র উপায়। "যে জিনিসটি উপলব্ধির বিষয়, যাকে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করতে গেলে যার ভাব হয়ে যায় খণ্ডবিচ্ছিন্ন অথবা ভাষা হয়ে যায় মূক, তার সংজ্ঞা আসবেই বা কি করে।" (দ্রষ্টব্য—অতীন্দ্রিয়বাদ—পৃ: ১৫)।

নানা গ্রন্থের মধ্যে এই আনন্দ কেমন ভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে, তা জানবার এষণা এসেছিল মনে সেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু আসেনি সুযোগ। প্রথম সেই সুযোগ এল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই থেকে চলেছে অনুসন্ধান আর অধ্যয়ন। অকপটে স্বীকার করছি—আশা মেটেনি। যেটুকু বুঝেছি—তাও পারিনি প্রকাশ করতে। আমার চিন্তার অনুকূল কোন বাঙলা গ্রন্থ পাইনি আমি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে সব গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি, যথাস্থানে দিয়েছি তার পরিচয়।

আমার চিন্তার অনুকূলে কোন বাঙলা গ্রন্থ পাইনি বলে, চিন্তাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার ইচ্ছা জাগে মনে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে। কিন্তু রূপ দিতে যেয়ে ভাব ব্যাহত হয়েছে পদে পদে। যা বলতে চাই, লেখনীর সাহায্যে তা ফুটিয়ে তুলতে পারি না। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাতেও তা সফল করতে পারি নি। যা উপলব্ধি করেছি, তার অতি সামান্যই প্রকাশ হয়েছে।

যত মত তত পথ। এ বাক্যে আমি বিশ্বাসী। কিন্তু এও আমার স্থির বিশ্বাস- এক জায়গায় যেয়ে সব পথ মিশে গিয়েছে। যে পথেই যাওয়া যাক না কেন, পথের শেষে সেই এক জায়গায় যেয়ে মিলতে হবে। তাই হল আনন্দ। এই আনন্দই ব্রহ্ম। এর যে নাম দেওয়া যাক না কেন—ব্রহ্ম ছাড়া তা আর

কিছু নয়। চর্যাপদের মধ্যে যে নির্বাণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে আছে ঐ আনন্দের অনুভূতি। ঐ আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে, উহা অতীন্দ্রিয় আনন্দ, উহাই হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ব্রহ্মানন্দ লাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে। এই লীলার মধ্যেও সেই আনন্দ রসই আস্বাদন করা যায়। এই আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। শ্রীচৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলিতে মহাপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁর লীলার মধ্যেও ঐ আনন্দ রস লাভ ঘটে। এখানেও সেই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। শাক্ত পদাবলীতে মহাশক্তির মধ্যে ভক্ত শাক্ত কবি মহাশক্তির যে মাতৃমূর্তি দর্শন করেছেন তা বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতার একটি মূর্তির প্রকাশ মাত্র। "কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে,"—প্রভৃতি উক্তির মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্ন ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। আর শাক্ত কবি যে আনন্দের কথা বলেছেন, তা বৈষ্ণব কবিদের আনন্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। বৈষ্ণব শাক্তে দ্বন্দ্ব নেই, আছে মহামিলনের সন্ধান। অতীন্দ্রিয় আনন্দের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন বিহারী লাল। যে নূতন আনন্দ অনুভূতির সংবাদ দিয়েছেন তিনি তাঁর সারদামঙ্গলে তার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতায়। এই অতীন্দ্রিয় আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে বিহারী লাল ও রবীন্দ্রনাথের তপস্যায়। যে অতীন্দ্রিয় আনন্দের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে চর্যাপদে, রবীন্দ্রনাথে এসে তা পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য বিহারী লাল ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু মূলে ঐ অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ।

বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিবর্তনে এসেছে রাধাবাদ। এর মূলে আছে বাঙালীর অবদান। আর সেই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী কেন্দুবিল্বের শ্রীজয়দেব গোস্বামী। মহাভারতের চক্রধারী কৃষ্ণের হাতের চক্র সরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন বাঁশী। আর তাঁর সেই বাঁশীর সুরে ভারত মুগ্ধ হয়ে আছে। এই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত রূপটিও আমি প্রকাশ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। জয়দেবের প্রভাব কিভাবে সারা ভারতে প্রভাবিত হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়েছি।

অতীন্দ্রিয়বাদ-এর সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নয়। কারণ যা অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য—তার সংজ্ঞা দেওয়া সাধ্যাতীত। তাই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বরূপ ও অতীন্দ্রিয়বাদ বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আবার

স্বীকার করছি—ঐ কার্যে সফলতা লাভ করতে পারিনি। সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। ঐটিই আমার জীবনের বড় ট্রাজিডি। প্রথম পরিচ্ছেদে ঐ প্রচেষ্টার প্রমাণ মিলবে। আবার ঐ প্রথম পরিচ্ছেদ বাকি অংশের ভূমিকা রূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ অংশে থিওরি আর বাকি অংশে চলেছে বিশ্লেষণ। যা আমি উপলব্ধি করেছি অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে, বাঙলা সাহিত্যে তা কি ভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে—কাব্য সাহিত্যের অংশ বিশেষ উদ্‌ধৃত করে নিজের ভাবে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এর ভাল-মন্দ, সফলতা-বিফলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পূর্ণ আমার।

উদ্‌ধৃতির বাঙলা অনুবাদে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছি। আর সর্বত্র চলিত ভাষা। উদ্‌ধৃতির পূর্বে বা পরে গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্তার বা কবিতা ও কবির নাম উল্লেখ করেছি। সকলের কাছে আমি ঋণী।

প্রথম পরিচ্ছেদটি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সুবর্ণ বণিক সমাচার পত্রিকায় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৭০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ, মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে উভয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ডাঃ শ্রীযুত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুত বিভাস রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যে সমস্ত বই পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি, সেই সব গ্রন্থ পড়বার সুযোগ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থকর্তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করে ঋণভার লাঘব করব না।

এই গ্রন্থ সম্পর্কিত আশা-নিরাশার দুটি দিনের কথা আজ মনে পড়ছে। ইংরাজি ১৮।১২।৬৭ ও ২০।৬।৬৯। এই দুটি দিন আমার জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমার তিনজন হিতৈষীর উপকারের কথাও মনে পড়ছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার দাশ আমাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ক্যালক্যাটা বুক হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত

পরেশ চন্দ্র ভাওয়াল এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর ঋণের কথা চিরকাল আমার স্মরণে থাকবে।

যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের নামের তালিকা দেওয়া গেল পরিশিষ্ট (ক) ও (খ) অংশে।

সন্ধ্যা সন্নিকট। শরীর ও মন অবসন্ন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁরই পথে চলতে চেষ্টা করেছি। প্রতি পদে নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেছি। তবুও চলেছি। বিচ্যুতির চিহ্ন আছে সর্বত্র। তবু যদি সাধু সজ্জনের আশিসে ও যাঁর ইচ্ছায় এ পথ পরিক্রমা করেছি, তাঁর কৃপালাভে সমর্থ হই—ধন্য হ'ব আমি।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীযোগীলাল হালদার
১০৪ বি, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড
কলিকাতা—১৫

॥ ১ ॥

: অতীন্দ্রিয়বাদ :

অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার, জ্ঞানাতীত বস্তুকে সীমায়িত জ্ঞানের দ্বারা বিচার করবার ইচ্ছা সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনে জেগেছে। এ ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্য মানুষও তার সমস্ত শক্তিকে সেইদিন থেকে নিয়োজিত করেছে। ইচ্ছা পূরণের জন্য মানব মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল—সেই প্রথম দিনের সেই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে যুগে যুগে। এই দ্বন্দ্ব হতেই এসেছে মানুষের শ্রেয়ঃ তপস্যা, প্রেয়কে লাভ করবার কঠোর প্রচেষ্টা। এই তপস্যার পরিসমাপ্তি নেই, নেই এর বিরাম-বিশ্রাম। মানুষ শুধু তার পথে এগিয়ে চলেছে, এই চলার পথেরও শেষ নেই, চলারও বিরতি নেই। শ্রেয়ঃ-তপস্যার পথে চলতে চলতে মানুষ কি পায়নি, তার হিসাব করবার দিন এখনও আসেনি ; কি পেয়েছে তারই দিন এসেছে।

সাধারণের ধারণা প্রাচীন আর্যঋষিরা তপস্যা করেছিলেন ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য। কেউ মনে করেন—তাঁরা তপস্যা করেছিলেন নির্গুণ পরম ব্রহ্মকে লাভ করবার জন্য। আবার এক সম্প্রদায় মনে করেন ব্রহ্মকে উপলব্ধির জন্য প্রাচীন আর্যঋষিরা তপস্যা করেছিলেন। ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বরত্ব কি, ব্রহ্মত্বই বা কি ; নানা প্রশ্ন জাগে আমাদের নীচের তলার লোকের মনে।

কিন্তু ব্রহ্ম, ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বর বা ঈশ্বরত্ব—এসব কি ব্যাখ্যা করে বুঝান যায় ? বিচারের দ্বারা কি এসবের সমাধান হয় ? যা অনুভূতির বিষয়, যে বস্তু অনুভব-বেদ্য—কেমন করে সম্ভব তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝান ? 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি'—এ ঋষি বাক্যের মধ্যে যে ভূমার কথা আছে, সেই ভূমার কি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলে ? যা অনন্ত, অসীম, যা নিত্য, শাশ্বত, চিরন্তন—তাই তো ভূমা। যা বাক্যাতীত, জ্ঞানাতীত, চিন্তাতীত—তাই তো ভূমা। যা রূপাতীত, গুণাতীত —তাই তো ভূমা। যা সসীম, সান্ত, অনিত্য, বাক্যজ্ঞান-চিন্তাধৃত, তাতে চিরশান্তি বা শাশ্বত সুখ নেই। অথচ যুগ যুগ ধরে আর্যঋষিদের ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য যে শ্রেয়ঃ-তপস্যা চলেছিল, তার মূলে ছিল ঐ ভূমাকে লাভ। তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আর্যঋষিরা প্রচার করলেন,—সেই পরমব্রহ্ম—'অবাঙ্ মনসগোচর'।

সেই পরমব্রহ্ম বাক্যের অতীত। ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। অনুভূতির দ্বারাই শুধু ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। চিৎস্বরূপ যে

আনন্দ; সেই আনন্দকে লাভ করবার জন্য ভক্তজন নির্গুণ পরম ব্রহ্মের জ্যোতিতে ডুবে থাকেন। তাই বিশ্বকবি সেই পরম ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে জানালেন আপন মনের আকুতি—

'বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী,
বল দাও মোরে বল দাও
প্রাণে দাও মোর শকতি।'

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম **omnipresent, omniscient and omnipotent** অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০। ১০ অঃ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই এবং আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশস্বরূপ অর্থাৎ আমিই জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতির কারণ।

সুতরাং ব্রহ্ম সর্বভূতে সর্বাবস্থায় বিরাজমান। ব্রহ্মময় গতিশীল জগতে জন্মতে ব্রহ্ম, স্থিতিতে ব্রহ্ম এবং মৃত্যুতেও ব্রহ্ম। এমনি করে আদিকাল থেকে ব্রহ্মের লীলা চলছে; আর এ লীলারও অন্ত নেই। অথচ এই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম অতীব আশ্চর্যের বিষয়। এর বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই চিন্তা বেড়ে যায়। বিস্ময় ক্রমশঃ বেড়ে চলে। যতই জানতে পারা যায়, ততই অজানার মধ্যে যেয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এর ফল হয় আরও আশ্চর্য। ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে জানতে যতই অজানার মধ্যে যেয়ে পড়তে হয়, ততই আনন্দ বেড়ে চলে। নিত্যের সংগে অনিত্যের তফাৎ এই যে, অনিত্যের মধ্যে শাশ্বত শান্তি নেই, নেই শাশ্বত আনন্দ। কিন্তু নিত্যের মধ্যে আছে শাশ্বত শান্তি, আছে শাশ্বত আনন্দ। নিত্য বা ব্রহ্ম যতই জানতে পারা যায়, ততই যেন অজানাও গভীর রহস্যময় হয়ে গড়ে। তার ফলে আসে আনন্দ। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে; কিন্তু অদ্ভুত লাগে বলেই ইহা আশ্চর্য। অদ্ভুত বলেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার উদগ্র কামনা মানুষের মধ্যে সমানভাবে চলে আসছে। নানাজনে নানাভাবে

সেই অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার চেষ্টা করছে। এর না আছে বিরাম, না আছে বিশ্রাম। এ প্রচেষ্টা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। যারা আস্তিক তাদের কথা বলছি না, যারা নাস্তিক তাদের কথাই বলি ; নাস্তিকেরাও ঈশ্বরের চিন্তা বরং আস্তিকের চেয়ে বেশী করে। ব্রহ্মের অস্তিত্বে আস্তিক বিশ্বাসী, স্বতরাং আস্তিক তার নির্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মের চিন্তা করে। আর নাস্তিক করে সর্বক্ষণ। ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে যেয়ে নাস্তিককে প্রতিক্ষণই ব্রহ্মের বিষয় ভাবতে হয়। ব্রহ্মের এই লীলা পরমাশ্চর্য।

আধুনিক জড়বাদী বিজ্ঞান ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল বলেই আমরা মনে করি। আমরা বরং মনে করি বৈজ্ঞানিকেরা বড় দার্শনিক এবং পরম আস্তিক। তাঁরা ব্রহ্মকে না বুঝে বিশ্বাস করেন না, বুঝে বিশ্বাস করেন। পরমাণুর উৎপত্তি কি করে হোলো— এই উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যেয়ে নিশ্চয় তাঁদিগকে Nature বা প্রকৃতির কথাই বলতে হবে।

অতএব যদি তাঁরা Nature বা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন তবে তাঁরাও আস্তিক। Nature থেকে যদি সব সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ Nature যদি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ হয়, তবে তাঁরা ত দর্শনের কথাই বল্লেন বা দর্শনের সংগে একমত হলেন। কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির কথাই আছে। অবশ্য Adam এবং Eve এর সংগে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির একটু প্রভেদ আছে। Adam এবং Eve এর চালক God, যেমন নর এবং নারীর চালক বা যন্ত্রী সেই পরম ব্রহ্ম। সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি সক্রিয়। এই সক্রিয় প্রকৃতিই জগৎসৃষ্টিকারিণী। কিন্তু পুরাণে দেখছি 'এক' 'বহু' হতে মানস করলেন। কিন্তু তিনি ত নিরাকার এবং নির্গুণ। তিনি ত সৃষ্টি করতে পারেন না এ অবস্থায়। তাই তিনি সগুণে সাকার হলেন। ব্রহ্ম এইরূপে সগুণে সাকার হয়ে পুরুষ প্রকৃতিতে বিভক্ত হোলেন। বিভক্ত হয়েও এঁরা মনে করতেন 'এক' এবং 'অভিন্ন'। এই পুরুষ-প্রকৃতি ব্রহ্মেরই বিভাব।

'যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবং। ৫৬ ॥
যথা ক্ষীরেচ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথ্ব্যাং গন্ধোরস স্তথাহং ত্বয়ি সন্ততঃ। ৫৭ ॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলং।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচন।
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তুমহং ক্ষমঃ। ৫৮ ॥

যে আমি সেই তুমি, আমাদের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নেই। সতি! যেমন ক্ষীরে ধবলতা, অনলে দাহিকা শক্তি ও পৃথিবীতে গন্ধ রস বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ সর্বদা আমি তোমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। যেমন কুলাল মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট এবং স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ ভিন্ন কখনও কুণ্ডল প্রস্তুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার আশ্রয় ভিন্ন আমি কোনোরূপে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহি।

। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্--শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম্। ১৫শ অঃ।

এই পুরাণের এই অধ্যায়ের অন্যত্র ব্রহ্ম প্রকৃতিরূপিণী রাধিকার স্তব প্রসংগে তাঁর দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার কথাই বলেছেন। আরও বলেছেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রেই পুরুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ-সঞ্জাত এবং রাধিকা সর্বজীবের সর্বশক্তিস্বরূপা।

'যথাসমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাংশাংশজীবনঃ।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং তথা তেষু স্থিতা তদা। ১০৬॥
পুরুষাশ্চ হরেরংশাস্ত্বদংশা নিখিলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আত্মায়ং দেহরূপস্ত্বং যস্যাধারস্ত্বমেব চ। ১০৭॥
অস্য প্রমাণৈ স্ত্বং মাত স্ত্বৎ প্রাণৈরয়মীশ্বরঃ।
কিমহো নির্মিতঃ কেন করুণাশিল্পকারিণা। ১০৮॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ ক্রমে সঞ্জাত হইয়া অবস্থান করিতেছে. তুমি সেই সমস্ত জীবে সর্বশক্তিস্বরূপা হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছ। পুরুষ সকল হরির অংশজাত এবং নারী সমুদয় তোমার অংশজাত। আর এই দয়াময় হরি আত্মাস্বরূপ এবং তুমি দেহস্বরূপা। বিশেষতঃ তুমি সকলের আধারভূতা হইয়াছ। মাতঃ! তুমি এই দয়াময় হরির প্রাণবিশিষ্টা হইয়া সর্বেশ্বরী এবং এই হরিও তোমার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া সর্বেশ্বর হইয়াছেন! কি আশ্চর্যের বিষয়। কোন্ করুণাময় শিল্পকারী যে এরূপ নির্মাণকর্তা, তাহা কোনরূপে বলিতে পারি না।

। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্--শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম্, ১৫ অঃ।

দর্শন ও পুরাণের বহু পূর্বে উপনিষদে আনন্দময় ব্রহ্মের উপলব্ধির বিষয় প্রচারিত হয়েছে। উপনিষদের আলোচনার পূর্বে বেদ বিভাগ জানা প্রয়োজন।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদের প্রত্যেকটি নানা শাখায় বিভক্ত। এর যে কোন একটি শাখা থেকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যায়। বেদের প্রতি শাখার দুইটি ভাগ- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের

অধিকাংশ স্থানে প্রকৃতির বিভিন্নরূপের স্তব দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ বিভিন্নরূপের বিভিন্ন নাম আছে। উষা, সন্ধ্যা, ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রভাগের কোন কোন অংশে পরব্রহ্মের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণভাগের প্রথমে যজ্ঞের প্রণালী বলা হয়েছে এবং শেষে আরণ্যক বা দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। আর্য ঋষিরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে অরণ্যে অবস্থান করতেন। এই সময়ে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করে তাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন। ইহা দর্শন। আরণ্যকে এই দার্শনিক অলোচনা আছে। সাধারণতঃ প্রতি আরণ্যকের শেষে একটি উপনিষদ আছে। বেদের শাখার অন্তে উপনিষদ্ থাকায় উপনিষদের নাম হলো বেদান্ত। অধিকাংশ উপনিষদ বেদের ব্রাহ্মণভাগে থাকলেও কোন কোন উপনিষদ্ বেদের মন্ত্রভাগেও আছে। ঈশোপনিষদ্ যজুর্বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগে যুক্ত আছে।

গীতায় যেমন কর্মবন্ধন ছিন্ন করে ব্রহ্ম বা ভগবানকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে, উপনিষদেও ঠিক তেমনই সংসারবন্ধন ছিন্ন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ বর্ণিত হয়েছে।

বেদ অপৌরুষেয়। প্রাচীন আর্যঋষিগণ বেদ রচনা করেননি, তাঁরা বেদের বিভিন্ন অংশ দর্শন করেছিলেন। যা তাঁরা দেখেছিলেন, তাই প্রচার করেছিলেন। আর সকলে সেই প্রচারিত সত্য বংশপরম্পরায় শুনে শিখেছিল। সাধারণতঃ মানব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রয়াসী। আবার জ্ঞানী ব্যক্তি শুধুই মোক্ষপ্রয়াসী। জ্ঞানীরা জানেন যে, ব্রহ্মকে লাভ না করলে মোক্ষ লাভ হয় না, সুতরাং মোক্ষ বা ব্রহ্মলাভই তাঁদের জীবনের সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। সবই অনিত্য, কেবল ব্রহ্মই নিত্য। বিবিধ সাধনার দ্বারা এই নিত্য ব্রহ্মকে লাভ করবার জন্য প্রাচীন আর্যঋষিরা প্রাণমন অর্পণ করেছিলেন। কত সহজে সেই প্রার্থিত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়—তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সুদূর অতীত কাল থেকে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয়নি আজও। যিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন, প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন সেই উপলব্ধ সত্যকে প্রচার করতে। তাই ব্রহ্মকে জানার নানা মত ও নানা পথ আমরা দেখতে পাই উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে ও কাব্যসাহিত্যে। যাঁরা এর স্রষ্টা, তাঁরা সকলেই সাধক কবি।

ধ্যানধারণা সাধ্যসাধনার দ্বারা প্রাচীন আর্যঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অর্থ ও কাম নিত্যের পথে কোন কাজে আসে না। মৃত্যুর সময়ে সবই পড়ে

থাকে। আবার যজ্ঞকর্মের দ্বারা ধর্মলাভ করা যায়, স্বর্গেও যাওয়া যায়। কিন্তু পুণ্যবল ক্ষীণ হলে পরে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ফিরে আসতে হয়। মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করলেই কোন না কোন্ দুঃখ ভোগ করতে হবেই। কিন্তু মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না, পরন্তু ব্রহ্মকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না—একথা গীতাতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ৮।১৬

হে কৌন্তেয়। ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোকের পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু অর্জুন! কেবল একমাত্র আমাকেই লাভ করিলে আর কিছুতে পুনর্জন্ম হয় না।

ব্রহ্ম উপলব্ধিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্ম উপলব্ধির উপায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মকে জানা অতি কঠিন ব্যাপার। এর কারণ কি? কারণ, ব্রহ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত। মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মকে এজন্যই সহজে লাভ করতে পারে না। ব্রহ্মকে জানলে আর কিছু না-জানা থাকে না। ইন্দ্রিয়াতীত এই ব্রহ্মকে লাভ করা যে কত কঠিন, সে সম্বন্ধে গীতায় আছে -

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ১২।৫

আমার অব্যক্তস্বরূপে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশজনক।

সুতরাং ব্রহ্মের কৃপা না হলে ব্রহ্মকে জানতে পারা যায় না। ব্রহ্মকে জানবার উপায় কি? শুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মের উপাসনা করলে ব্রহ্মলাভ হয়। চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? নিষ্কাম যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির উপায়। চিত্তশুদ্ধি হলে ভক্তি আসে। চিত্তে ভক্তি এলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই ব্রহ্মলাভ হয়। গীতায় আছে—

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ৫।২৬

কাম ক্রোধ বিমুক্ত সংযমচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ কি ইহলোক, কি পরলোক উভয় লোকেই ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, ব্রহ্মলাভের মূলে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান। উপনিষদে বহুস্থানে এজন্য কর্মের কথা বলা হয়েছে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥ ঈশ উঃ

পৃথিবীতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিবার ইচ্ছা করিবে। ইহা ভিন্ন তোমার অন্য উপায় নাই। কারণ শাস্ত্রসম্মত কর্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে মানুষ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিবার অবসর পায় না।

কর্ম না করে মানুষ মুহূর্ত মাত্র বসে থাকতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিই এরূপ। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, কাজও ঠিক তেমনি সর্বদা মানুষকে আকর্ষণ করে। তাই মানুষ কখনও স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে না। যা হয় সে একটা করবেই। ভালো কাজ করতে না পারলে সে মন্দ কাজের পিছনে লেগে থাকবে।

তাই মানুষের কর্তব্য--সর্বদা শাস্ত্রসম্মত যে কোন কাজে লেগে থাকা। অন্ততঃ যে কাজের দ্বারা কারও কোনো প্রকার অনিষ্ট হবার বিন্দুমাত্র ভয় নেই, এমন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। গীতাতেও শ্রীভগবান এই কথাই বলেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫ ॥

কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ-সকল সকলকেই বশীভূত করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করায়।

অতএব ভাল কাজ, শাস্ত্রসম্মত কাজ, দেশের ও দশের কাজ না করলে মানুষকে কি করতে হবে? এ সম্বন্ধেও গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ১।৩৯

ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্মে লিপ্ত হইতে হয়। অধর্মে লিপ্ত হইলে অধর্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যজ্ঞাদি কর্ম করবার কথাও বলা হয়েছে। কোন উপনিষদে স্পষ্টভাবে যজ্ঞের কথা আছে, আবার কোথাও আছে কর্ম করবার কথা। এই কর্ম অন্য কিছু নয়—ইহা বেদ-বিহিত কর্ম।

বেদবিহিত কর্মের কি ফল হয়? বেদবিহিত কর্ম করলে চিত্ত ঈশ্বরমুখী হয়। এরই ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পর ব্রহ্মলাভের অধিকারী হয় মানব। বেদে যেমন যজ্ঞাদি কর্মের ফলশ্রুতিতে ব্রহ্মলাভের উপায় নির্ণীত হয়েছে, গীতাতেও ঠিক তেমনিই নিষ্কাম কর্মসম্পাদনের কথা বলে হয়েছে। নিষ্কাম কর্মের ফল কি হয়? নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে হৃদয় প্রশস্ত হয়, বিশ্ব এসে তখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়। ইনি আপন, উনি পর, এই ভেদ-বিভেদ হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়। ইহাই জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞানই ভক্তিমার্গে উন্নীত করে। ভক্তিই ব্রহ্মলাভের পথ। এই পথে অগ্রসর হতে হলে যোগসাধন প্রয়োজন।

যোগের দ্বারা বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়, চিত্ত স্থির হয় এবং তার ফলে চিত্ত শতদলে ব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটে এবং তখনই মানব ব্রহ্ম দর্শনজনিত অব্যক্ত আনন্দ লাভ করে। শুধু সাধক কবিরাই এই ব্রহ্মদর্শনজনিত আনন্দের কতকাংশের বর্ণনা দিতে পেরেছেন। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাতীত ব্রহ্মকে, অলৌকিককে, অতীন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ করে কোন কোন সাধক কবি আবার কিছুই প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁদের জীবনটাই হল কাব্য। তাঁদের জীবনী আস্বাদনের বস্তু। ঐ জীবনটা আস্বাদন করতে পারলে মহাকাব্যের রস আস্বাদন করা হয়।

কাদের ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। আলোচনা করে দেখা গেছে সাধক কবিদেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ ঘটেছে। অবশ্য তাঁদের এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার একভাবে ঘটেনি--বিভিন্ন উপায়ে এঁদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটেছে। আবার একই সাধক কবি বিভিন্নভাবে ব্রহ্মকে চিৎ-শতদলে প্রতিষ্ঠিত করে আনন্দরস পান করেছেন। কাব্যসাহিত্যে এই বিভিন্ন ভাবের নামকরণ হয়েছে। আবার কি কি মাধ্যমে যে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়েছে তাও বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম উপলব্ধির যে বিভিন্ন ভাব, তার নাম দেওয়া হয়েছে ইংরাজীতে Mysticism. স্ফী সাহিত্যে ইহাকে বলা হয়েছে স্ফীবাদ। ভারতীয় সাহিত্যের কোথাও অলৌকিক প্রত্যক্ষবাদ, কোথাও ভাব কুহেলিবাদ, কোথাও অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাকে বলা হয় ভাবসম্মিলন। Mysticism-এর ঠিক কি প্রতিশব্দ হতে পারে, তার সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে আমাদের দেশের কোন কোন সমালোচক সমস্যা এড়ানোর জন্য মিষ্টিকবাদ নাম দিয়েছেন। আমরা এর সমস্ত ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে এখানে 'অতীন্দ্রিয়বাদ' এই নাম গ্রহণ করেছি।

Mysticism—বা অতীন্দ্রিয়বাদের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ দিতে পারেন নি। হয়ত পারা সম্ভব নয় বলেই কেহ সে চেষ্টাও করেননি। কারণ যে জিনিসটি উপলব্ধির বিষয়, যাকে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করতে গেলে যার ভাব হয়ে যায় খণ্ড বিচ্ছিন্ন অথবা ভাষা হয়ে যায় মূক, তার সংজ্ঞা আসবেই বা কি করে? মনে হয় এই জন্যেই সকলে সংজ্ঞা না দিয়ে Mysticism বা অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যা করে এর স্বরূপটি বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

ব্রহ্ম উপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শনের যে ভাব—যাকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়েছে—সেটি বিজ্ঞান না কলা বা শিল্প। আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ব্রহ্ম উপলব্ধির ভাব বা অতীন্দ্রিয়বাদ হল দর্শন। প্রমাণের দ্বারা যে সত্য আবিষ্কৃত হয় সেটি দর্শনশাস্ত্র। আবার সমৃদ্ধ কল্পনার দ্বারা যে ভাবটি উপলব্ধ হয়, সেই কলা বা শিল্পটিও দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত। অতএব বিজ্ঞান, কলা বা শিল্পের শেষ পরিণতি দর্শনশাস্ত্রে। যদি শেষ পরিণতিতে বিজ্ঞান এবং কলা এক মোহনায় এসে মিলিত হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য আর থাকে না। সেখানে বিজ্ঞান এবং কলা এক। বিজ্ঞানী সত্য আবিষ্কার করতে করতে এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হন যেখানে সব এক হয়ে যায়, তখন বিজ্ঞানী প্রমাণ করবার খেই হারিয়ে ফেলেন। আবার কলাবিদ্ সাধক কবিও সত্য দর্শন করবার জন্য ক্রমেই এগিয়ে চলেন। এগিয়ে যেতে যেতে এমন এক মহাসত্যের মহাসংগমে উপস্থিত হন, যেখানে তিনি সম্বিৎ হারিয়ে ব্রহ্মানন্দ বা সচ্চিদানন্দ বা মহানন্দ লাভ করেন। Heraclitus, Plato, Hegel প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে এরই সমর্থন মেলে।

ব্রহ্ম উপলব্ধি বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ বা ভাবসম্মিলন যখন হয়, তখন এক বিরাট রহস্যের নিরসন হয়। মানসে হঠাৎ এমন এক ভাবের উদয় হয়, যা প্রকাশের অতীত, যা শুধু আস্বাদন করা যায়। তখন এক মহাসত্যের সন্ধান মেলে—যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং যে মহাসত্য শুধু পূর্ণানন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। এই উপলব্ধির সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক সমালোচক Bertrand Russel বলেছেন,—"The mystic insight begins with the sense of a mystery unveiled of a hidden wisdom now suddenly become certain beyond the possibility of a doubt." (Mysticism and Logic, Page No. 15, Penguine Series.)

ব্রহ্ম উপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত হলেও বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। বলা চলতে পারে, অতীন্দ্রিয়বাদ একটা পৃথক্ দর্শন শাস্ত্র। এখন প্রশ্ন আসে—অতীন্দ্রিয়বাদ এবং দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য কম নয়। যে কোন দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নানারকম তর্কজাল বিস্তার করে বহুসূত্রের ব্যাখ্যা করে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদের বেলাতে কোন যুক্তিতর্ক, কোন প্রমাণ প্রয়োগ বা কোনো ব্যাখ্যা চলে না। এসব যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকে আরম্ভ হয় অতীন্দ্রিয়বাদ। ব্রহ্ম উপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শন কি যুক্তিতর্ক, প্রমাণ প্রয়োগ বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ? তা নয়। যুক্তিতর্ক, প্রমাণ বা ব্যাখ্যা যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনই হয় ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শন। ইহাই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়েও দর্শনশাস্ত্রের অধিক। এজন্য ইহা অতীন্দ্রিয়বাদ। যদি এর কোন ইংরাজী নাম দেওয়া প্রয়োজন হয়, তাহলে বলা সংগত হবে—Philosophical Mysticism. বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মদর্শন বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা অলৌকিক-প্রত্যক্ষ হয় না। ভক্তিই ব্রহ্ম উপলব্ধির একমাত্র কারণ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥ গীতা

হে পরন্তপ, হে অর্জুন, কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ (ব্রহ্ম) আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

সুতরাং গীতার মতে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়। তাঁর সাক্ষাৎকার হয় এবং পরিশেষে তাঁর সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। এই শেষ অবস্থাকে ভক্তিশাস্ত্র অধিরূঢ় ভাব বলে। অধিরূঢ় মহাভাব। শুধু ব্রজগোপীতে লক্ষিত প্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ অমৃতসদৃশ যে ভাব তাহাই মহাভাব। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত, সেটি রূঢ় মহাভাব। রূঢ়ভাবে লক্ষিত অনুভাবসমূহ হতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করলে তাকে বলে অধিরূঢ় মহাভাব। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যারূপে আখ্যাত করা হয়েছে।

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা, বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥

। মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ, সাধ্যসাধননির্ণয়।

ষড়্দর্শনে বা আগমনিগম তন্ত্রসারে সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে একমাত্র ভক্তিপথই আশ্রয় করতে হবে—একথা রামপ্রসাদও উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে জানিয়েছেন।

ষড়্দর্শনে দর্শন পেলাম না আগমনিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে
(আত্মার)॥

সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥

ব্রহ্ম উপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি তত্ত্ব নয়, বা সাধারণভাবে যাকে দর্শনশাস্ত্র বলা হয়, তাও নয়; ইহা একটি বিশেষ ভাব বা অবস্থা।

Mysticism is, in truth, a temper rather than a doctrine, an atmosphere rather than a system of philosophy.—C. F. E. Spurgeon's Mysticism in English Literature—page. 2.

ব্রহ্মোপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিশেষ ভাব বা অবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। ব্রহ্মই আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দ রস আস্বাদন করা যায়, কিন্তু যিনি আস্বাদন করেননি তাঁকে কোন প্রকারে বোঝান যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যিনি কোন দিন রসগোল্লা খাননি, তাঁকে যেমন রসগোল্লার আস্বাদ বোঝান যায় না, ঠিক তেমনি ব্রহ্মানন্দ কেমন যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেননি তাঁকে বোঝান যাবে না। এই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তাঁর কড়চায় বলেছেন,

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি
ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, যেন প্রেমের একটি মহাসমুদ্র। এই সমুদ্র অনন্ত এবং অতলস্পর্শী। স্বীয় প্রেম আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষারূপ বায়ুপ্রবাহে সেই প্রেম-সমুদ্র বিকারযুক্ত বা তরঙ্গযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রেমমহাসমুদ্রের এই বিকার বা তরঙ্গই শ্রীরাধা। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা হতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপ পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হন।

ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষ তলে ধ্যানমগ্ন হয়ে যে বোধি লাভ করেছিলেন, সেই বোধিই ব্রহ্ম। দিব্যোন্মাদ অবস্থাতে শ্রীমহাপ্রভু এই ব্রহ্মানন্দই লাভ করতেন। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার স্বরূপ পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ অন্ত্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

মহাযোগী মহাসাধকের ব্রহ্মোপলব্ধি হলে পর পার্থিব বোধশক্তি লোপ পেয়ে যায়। ইষ্টদেবতার পূজায় বসে তিনি দেবতার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন, এমন সময় তাঁর ব্রহ্ম উপলব্ধি হোলো। ব্রহ্মানন্দে, ব্রহ্মরসে, ব্রহ্মের জ্যোতিতে তিনি ডুবে গেলেন। তখন তাঁর বর্তমান, তাঁর অতীত, তাঁর ভবিষ্যৎ কোথায় চলে গেল। বাহ্যজ্ঞান তাঁর লোপ হোলো। তিনি পুষ্পাঞ্জলি ইষ্টদেবতার পায়ে দিতে দিতে হঠাৎ নিজের মাথায় দিতে আরম্ভ করলেন। এই অবস্থার নাম ভাবসমাধি (Magic)।

সাধক কবি রামপ্রসাদেরও ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়েছিল। রামপ্রসাদ ব্রহ্মকে মাতৃমূর্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা ব্রহ্মকে ব্রহ্মময়ী মা বলে ডাকতেন। সেই ব্রহ্মময়ী মাকে রামপ্রসাদ নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর পূজা করতেন। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পেতেন। আবার এই ব্রহ্মময়ী মায়ের সংগে তাঁর মান-অভিমানের পালাও অভিনয় হোতো। মাকে নিজ অন্তরে উপলব্ধি করে রামপ্রসাদ উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—

'কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্ দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

ব্রহ্ম উপলব্ধির বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিশেষ ভাবটির সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক সমালোচকগণও উপরিউক্ত মতের প্রতিধ্বনি করেছেন। এ সম্বন্ধে R. M. Johnes তাঁর Studies in Mystical Religion নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন,—

Mysticism is "The type of religion which puts the emphasis on the immediate awareness of religion with God, on direct and intimate consciousness of the divine presence. It is religion in its most acute, intense and living stage.'—Introduction P. XV.

দার্শনিক গোথে ঠিক এই ভাবই প্রকাশ করেছেন ব্রহ্ম উপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি সম্বন্ধে। গোথে বলেছেন,—

"It (mysticism) is the scholastic of the heart, the dialectic of the feelings.'—W. R. Inge's Christian Mysticism থেকে গৃহীত।

ধর্মে যাঁদের গভীর অনুরাগ আছে, তাঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয়বাদী। ধার্মিক ব্যক্তি মাত্রেই তাঁর অভীষ্ট দেবতাকে সর্বদা নিজ মনে ধারণ করে রাখেন। এমন কি নিজেকে তিনি অভ্যস্ত কর্মে নিযুক্ত রেখেও অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে কর্মে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। কর্মের মধ্যেও যে এমনি করে অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করা যায়, এই সব অতীন্দ্রিয়বাদীকে না দেখলে তা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কবা যায় না। ভক্ত কবি রামপ্রসাদের জীবন সম্যক্ পর্যালোচনা করলে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। রামপ্রসাদ জমিদারী সেরেস্তায় খতিয়ান, রোকড় ইত্যাদি লিখছেন, আর তার ফাঁকে লিখছেন—

আমায় দে মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।

Evelyn Underhill তাঁর Mysticism নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বোধ হয় এই সব অতীন্দ্রিয়বাদীকে লক্ষ্য করেই লিখেছেন—'No deeply religious man is without a touch of mysticism and no mystic can be other than religious, in the psychological if not in the theological sense of the word.' page No 70.

অতীন্দ্রিয়বাদীই জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে অতীন্দ্রিয়বাদীই উপলব্ধি করতে পারেন। অতীন্দ্রিয়বাদীর ব্রহ্ম অনল, অনিল নভোনীল, ভূধর, সাগর, বিপিন, বিটপী, লতা, জলদ, শশী, তারকা, ভুবনে

—এক কথায় প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান। চর্মচক্ষুতে নহে, মর্মচক্ষুতে তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে পড়েন।

অতীন্দ্রিয়ানুভূতি (**Mystical State**) ও ভাবসমাধি (**Magic**) এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবসমাধি এক এবং অভিন্ন। উভয় অবস্থার সার্থকতম পরিণতি হোলো আনন্দলাভ। আর আনন্দলাভ ও ব্রহ্মলাভের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। অতীন্দ্রিয়বাদী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে পর্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আর তার ফলে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম তাঁর হৃদয়পদ্মে সদা বিরাজিত থেকে তাঁকে সদানন্দে বিভোর রাখে। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয়বাদী এবং তাঁর ব্রহ্ম এক হয়ে যায়। তাঁর মনে তখন আসে 'অহম্ সঃ, সঃ অহম্'। ভাবসমাধিতে ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবতার সংগে মিলিত হন, আর এই মিলনের ফলে সমাধি ভংগ না হওয়া পর্যন্ত তিনি-তাঁর ইষ্টদেবতার সংগে আনন্দলোকে বিচরণ করেন। এই অবস্থাতে 'তিনি আমি'র দূরত্ব অপসারিত হয়ে একীভাব আসে। সুতরাং পরিণতিতে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবসমাধির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

অবশ্য কেহ কেহ এ মত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে Mysticism এবং Magic-এর মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। **The fundamental difference between the two is this : magic wants to get, mysticism wants to give—immortal and antagonistic attitudes, which turn up under one disguise or another in every age of thought—"Mysticism-Evelyn Underhill—P. 70—71.**

ভারতীয় মতবাদের মধ্যে উপরিউক্ত মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আমাদের জানা নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে প্রভেদ এখানে থাকবেই। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তা ভাবসমাধির এক বিশিষ্ট চিত্র। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা, পরমহংস রামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবসমাধি একই পর্যায়ের। এই তিন মহামানবের লোকোত্তর চরিত্রের আলোকে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবসমাধির অবস্থা অনুধাবন করলে বহু সমস্যার নিরসন হবে। অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবসমাধির ব্যবধান দূরীভূত হয়ে উভয়ের তুল্যাবস্থা তখনই স্বীকৃত হবে।

বৈষ্ণব দর্শনে যে বৈধী বা স্বকীয়া (**Sanctioned or Static**) এবং রাগানুগা বা পরকীয়া (**Spontaneous or Dynamic**) তত্ত্বের কথা বলা

হয়েছে, উহা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির চরম কথা। এই তত্ত্বের মূলকথা হোলো 'রতি'। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ এই রতির সংজ্ঞায় বলেছেন—'রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্—৩।১৮০। মানুষের যা প্রিয় তার প্রতি যে সহজ অনুরাগ তারই নাম রতি। বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হলো তার কৃষ্ণ। অতএব বৈষ্ণবের রতি লৌকিক নহে। তাঁদের রতি হল 'কৃষ্ণরতি'। ঠিক এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

শ্রবণ স্মরণ কীর্তনের ফলে এই কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব সঞ্চারীর দ্বারা বৈষ্ণব ভক্তজন মনে ভক্তি রসরূপ লাভ করে। ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে তাই প্রভুপাদ রূপ গোস্বামী বলেছেন,—

'বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

বৈষ্ণব ভক্তজন মনে 'কৃষ্ণরতি' পাঁচ প্রকারে আসে এবং তার সার্থক পরিণতি পঞ্চরসে। প্রথম—শান্ত, দ্বিতীয়—দাস্য, তৃতীয়—সখ্য, চতুর্থ—বাৎসল্য, পঞ্চম—মধুর। এই মধুরই উজ্জ্বল। আর শৃঙ্গার বা আদিরসের সার্থকতম পরিণতি হোলো—এই মধুর। এই মধুর আবার দুই প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া।

মধুরভাবে আসতে বৈষ্ণব ভক্তকে পর্যায়ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথম স্তরে বৈষ্ণবেরা তাঁদের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন শান্তভাবে। এই ভাবের উপাসনা হোলো বিষয় বাসনা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন নিত্যবস্তু জ্ঞানে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ। এই ভাবের উপাসনায় ভক্তভগবানে কোনো প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। শম নামক রতি এই উপাসনার স্থায়ী ভাব। এই ভাবের উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত অনিত্য সংসার হতে মনকে নিবৃত্ত করে নিত্য ভগবানে সমর্পণ করেন—

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন

দ্বিতীয় স্তরে দাস্যভাবের সাধনা। ভগবান এখানে প্রভু এবং ভক্ত তাঁর দাস। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যশালী এবং ভক্ত দীন। সেবা নামক রতি এই দ্বিতীয় স্তরের স্থায়ী ভাব। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানকে সেবা করে ভক্ত জীবন সার্থক করতে চায়। বাইবেলের লর্ড সম্বোধন বৈষ্ণব ভক্তের দাস্যভাবের সাধনার তুল্য। এই দাস্যভাবের সাধনার মধ্যে যুগপৎ শান্তভাবের সাধনার নিষ্ঠা এবং দাস্যভাবের সেবা একীভূত হয়েছে।

শ্রবণ-কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসীরে।
পূজন ধেয়ান আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষীরে॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।*
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
—ভাগবত ৭।৫। ৮

তৃতীয় স্তরে সখ্যভাবের সাধনা। ভক্ত ও ভগবান এখানে পরস্পর পরস্পরের সখা। উভয়ের এক মন ও একপ্রাণ। কিন্তু এই সখ্যভাবের সাধনার মধ্যে শান্তভাবের নিষ্ঠা, দাস্যভাবের সেবা, পরন্তু এই সখ্যভাবের একপ্রাণতা মিশে আছে। সখ্যভাবের সাধনায় ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যভাব অনুপস্থিত। বিপ্রলম্ভ সখ্যভাবের সাধনার স্থায়ীভাব। বৈষ্ণবভক্ত ভগবানকে নিবিড়ভাবে লাভ করবার জন্যে ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে এই ভাবের সাধনায় শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল প্রভৃতি গোপবালকরূপী বৈষ্ণবভক্তগণ নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফল আরাধ্য দেবতার মুখে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল করে মুখ হতে লয়ে সভে দেয় কানু মুখে॥
—বিশ্বম্ভর।

Paradise Lost—এর Adam এবং Eve নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর যখন দেখলো যে Eden উদ্যানে এই ফলই সর্বোৎকৃষ্ট, তখন তারা ঐ ফলটির অর্ধাংশ ভগবানের জন্য রেখেছিল। সখাদের ঐ ফলদান প্রসঙ্গে Paradise Lost—এর ঘটনাটি মনে পড়ে।

* কৃষ্ণের পদসেবা নহে, তীর্থাদি যাত্রা।

বৈষ্ণবী সাধনার চতুর্থ স্তরে বাৎসল্যভাব। এই বাৎসল্যভাবের সাধনায় ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক মাতাপিতা ও পুত্রের--ভক্ত মাতা বা পিতা এবং ভগবান তার সন্তান। এই ভাবের সাধনায় শান্তভাবের সাধনার নিষ্ঠা, দাস্যভাবের সেবা, সখ্যের একপ্রাণতা এবং এই বাৎসল্যভাবের বৎসলতা বর্তমান। বৎসলতা নামক রতি ইহার স্থায়ীভাব।

> থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
> রবি যেন না লাগয়ে গায়।
> যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
> বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

পঞ্চম স্তরে মধুর ভাবের সাধনা। মধুর ভাবের সাধনায় ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কান্তা (স্ত্রী) ও কান্ত(স্বামী)। এই ভাবের সাধনায় শান্তভাবের সাধনার নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের একপ্রাণতা, বাৎসল্যের বৎসলতা এবং এই মধুরভাবের কান্তভাব মিশে আছে। মধুরা নামক রতি ইহার স্থায়ীভাব। ভগবানকে ভালোবাসার সূত্রপাত হয় দাস্য এবং সখ্যে। বাৎসল্যভাবের সাধনার মধ্যে ভালোবাসার আতিশয্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভালোবাসার চরম পরিণতি লাভ করেছে মধুরভাবের সাধনার মধ্যে।

এই মধুর ভাবের সাধনা স্বকীয়া ও পরকীয়াভেদে দুই প্রকার—একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। স্বকীয়াভাবে ভগবান কান্ত (স্বামী) এবং ভক্ত কান্তা (স্ত্রী)। এই প্রকারে বৈষ্ণব সাধনার ধারা দীর্ঘকাল বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। ঊঢ়া (বিবাহিতা) নারী আপন দয়িতের কাছে প্রেমে হৃদয়দ্বার খুলে দিতে পারে অসঙ্কোচে। তার ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ত্রুটি-বিচ্যুতি অকপটে আপন দয়িতের পদে নিবেদন করে সে থাকে নিশ্চিন্ত, কোনো প্রকার সঙ্কোচের জড়িমা সেখানে স্থান পায় না। এক মন এক প্রাণ। এমনি স্বকীয়াভাবে সাধনার পথে বৈষ্ণব ভক্তসমাজ বহুদিন চলেছিল। কিন্তু এই ভাবের সাধনার মধ্যে কোনো প্রকার বৈচিত্র্য না থাকায় একদিন বৈষ্ণবসমাজ এই সাধনায় আর তৃপ্তি পায়নি। এই অতৃপ্তির ফলে তাঁদের চিন্তাধারা দিক্ পরিবর্তন করে নূতন পথে চল্‌তে প্রয়াসী হোলো। এই প্রয়াসের ফলে দীর্ঘদিন পরে তাঁরা পেলেন পথের সন্ধান। এই পথটিই পরকীয়াভাবের সাধনা। আর এই পরকীয়া তত্ত্বই ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের চরম পরিণতি।

বৈষ্ণবী সাধনায় স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয়ই দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয়া ও পরকীয়া—এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়। স্বকীয়াবাদের

সঙ্গে কিছু সংযোজন হয়ে পরকীয়াবাদ এসেছে। পরকীয়াবাদে ভগবান কান্ত, কিন্তু পরপুরুষ, এবং ভক্ত কান্তা, কিন্তু পরনারী। এই ভক্তরূপ পরনারী ভগবানরূপ পরপুরুষের জন্যে পাগলিনী। অতি সঙ্গোপনে, আড়ালে-আবডালে আলো-আঁধারে এদের মিলন ঘটে। সংসারে সকলের মাঝে আছে, অথচ কারো মাঝে নেই। কেউ বুঝতে পারে না যে, কার চিন্তায় সে চিন্তিত। সংসারে নিয়মিত কাজ সে করে যায় যন্ত্রচালিতের মত। কিন্তু মন তার পড়ে থাকে তার দয়িতের পদে। অদর্শনব্যথা তার মনকে করে তোলে ভারাতুর, সংসার তার কাছে হয় ফাঁকা, মনে মনে সে থাকে নিঃস্ব, রিক্ত, একক। কিন্তু এই নিঃস্বতা, রিক্ততা ও এককতার ব্যথা প্রকাশ করবার তার উপায়ও নেই; এই পীড়ায় পীড়িত হয়ে তাকে কাল কাটাতে হয়। তার অবস্থা—

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাই আগুনি॥

এই পরকীয়াবাদের স্বরূপ বৈষ্ণব ভক্ত পরিষ্কার করে শুনিয়েছেন বিশ্বকে।

(তোরা) পর(ম)পতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে॥

এই পরকীয়াবাদের সাধনা অপূর্ব। এর তুলনা বিরল। সুফীবাদ এর খানিকটা কাছাকাছি। রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নারী-পুরুষ নন। ভক্তমাত্রেই শ্রীরাধা এবং শ্রীভগবানই একমাত্র পুরুষ। জীবাত্মা রাধা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। এই পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি। তাই পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার এত আকুতি। সূর্য থেকে যেমন সহস্র কর বেরিয়ে আসে, আবার সেই সহস্রকর

সূর্যই সংহৃত করে নেয়—ঠিক তেমনি পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থা। চরিতামৃতে এর চমৎকার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে।

এই ব্যাখ্যায় কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ—পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণ-ভগবত্তা-জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

॥ আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৮, ৯, ১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ॥

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ-প্রেম মহাসমদ্রবিশেষ। এই সমুদ্রের তরঙ্গ হোলো শ্রীরাধা। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আপন প্রেম আস্বাদন করবার ইচ্ছা থেকে প্রেমের বিলাস-রূপা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা সৃষ্ট হোলেন। অলৌকিক বৃন্দাবনে এক হোলেও লৌকিক বৃন্দাবনে মানবকল্পনাতে এরা পৃথক হয়ে আছেন।

এই পরকীয়াবাদের সাধনা অধিকতর বৈচিত্র্য পূর্ণ করবার জন্য নিত্য-বৃন্দাবনে ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি ষোল হাজার (অসংখ্য অর্থে) গোপিনী এসেছে। নায়িকা শ্রীরাধার প্রতিনায়িকারূপে এসেছে চন্দ্রাবলী আর মথুরার কুব্জা।

সুতরাং রতি, প্রেম বা অনুরক্তি এর মূলে হোল আনন্দ। আর আনন্দলাভ ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতি এক ও অভিন্ন একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সাধক-কবিরা নানাভাবে এই আনন্দলাভের অধিকারী হয়েছেন। তাই বাংলা সাহিত্যে সেই নানাভাবের আনন্দলাভ বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় মেলে।

॥ ২ ॥

ঃ পুরাতন যুগে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা ঃ

॥ চর্যাপদে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ॥

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে।

'According to Theravada Buddhism, the Buddha's Parinirvana occurred in 544 B C. Though the different schools of Buddhism have their independent systems of chronology, they have agreed to consider the full-moon day of May, 1956, to be the 2500th anniversary of the Mahaparinirvana of Gautama the Buddha.'— Foreword, p, 1. S Radhakrishnan, 2500 years of Buddhism.

বুদ্ধদেব রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে তাঁহার নবনির্মিত রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৫৪৪ খ্রীঃপূর্বাব্দে মহারাজ বিম্বিসারের সিংহাসনে অভিষেক হয়। প্রাচীন গিরিব্রজপুরের উত্তরে পাহাড়ের সানুদেশে বিম্বিসার তাঁহার নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন এবং উহার নাম রাখেন রাজগৃহ অর্থাৎ রাজার গৃহ। বর্তমানে এই রাজগৃহের নাম হয়েছে রাজগীর। এই রাজগীর পাটনা (প্রাচীন পাটলিপুত্র) জেলাতে অবস্থিত। রাজগীরের বিপুলা পাহাড়ে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার বাণী প্রথম প্রচার করেন। ওখানকার বৈভার পাহাড়ে যে গুহাপথ আছে, ঐ গুহাপথে বুদ্ধগয়া যাতায়াত করা যেত—এই জনশ্রুতি আছে রাজগীরে।

বঙ্গদেশ হতে এই রাজগীরের দূরত্ব বেশী নয়; কিন্তু ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে প্রচার হতে একটু বিলম্ব হয়েছিল। তখনকার যাতায়াতের অসুবিধাই ছিল এর অন্যতম কারণ। খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহ-জনিত অরাজকতা চলেছিল চার বৎসর। সমস্ত অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে অশোক পাটলিপুত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে। প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করে মহারাজ অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজ্য পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সমতট (পূর্ববঙ্গ) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গে মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে।

বঙ্গদেশে ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলা কঠিন। তবে মহারাজ বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে উহা প্রচারে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বলা যেতে পারে। এর ফলে রাজগৃহের নিকটবর্তী বঙ্গদেশে ঐ ধর্ম নিশ্চয় প্রবেশ লাভ করেছিল। অন্ততঃ মহারাজ বিম্বিসারের পর এবং মহারাজ অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম যে বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল, এ কথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দ পর্যন্ত মোট ২৭৬ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়।

Buddhism had probably obtained a footing in North Bengal even before Asoka's time The great missionary activity of Asoka, and the tradition about him recorded in Divyavadana and also by Hiuen Tsang, make it highly probable that Buddhism was not unknown in Bengal during the reign of that great Emperor. The existence of Buddhism in North Bengal in the 2nd century B. C. may also be inferred from two votive inscriptions at Sanchi recording the gifts of two inhabitants of Punavadhana, which undoubtedly stands for Pundravardhana

Buddhism—Dr. P. C. Bagchi, History of Bengal, p. 411-12 published by Dacca University.

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরেই তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক রাজগৃহে একটি সঙ্গীতি অর্থাৎ ধর্ম মহাসম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশাবলী ও বিনয় বা বৌদ্ধ অনুশাসন লিপিবদ্ধকরণ। কিন্তু বৌদ্ধ অনুশাসন নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে পরে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে প্রায় শতাব্দী ব্যবধানে বৈশালীর শ্রমণগণ অনুশাসনের ধারা শিথিল করবার উদ্দেশ্যে বৈশালীতে দ্বিতীয় ধর্ম মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। পরম সৌগত মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম মহাসম্মেলন আহূত হয়। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ২৩৬ বৎসর পর এই তৃতীয় সভা আহূত হয়েছিল। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুগতের উপদেশাবলী সম্পূর্ণকরণ। পরম সৌগত পণ্ডিত শ্রমণ তিস্স মোগ্গলিপুত্তও ছিলেন এই মহাকার্যের নায়ক। এই সম্মেলনে সমস্ত বৌদ্ধ

যোগদান করেন নি। পরন্তু ইহা ছিল বিভাজ্যবাদী সম্প্রদায়ের একটি দলীয় সম্মেলন বিশেষ। মনে হয়, এই সময় (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে) বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় মত নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। এই মতভেদের ফলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পরবর্তীকালে—সম্ভবতঃ মহারাজ কণিষ্কের সময়ে,—হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে (সম্ভবতঃ খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে) কাশ্মীরে চতুর্থ সম্মেলন আহূত হয়। উত্তর ভারতের হীনযানীরা এই সম্মেলনে সমবেত হন। এই হীনযানীরা প্রাচীন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। মহারাজ কণিষ্ক ছিলেন নব্যতন্ত্রের মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। মহাযানীরা ভগবান সুগতের পাশাপাশি ধ্যানীবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের পূজা করতেন। মহাযানীদের মতে জগতের দুঃখ দূর করতে এবং সত্যপথ দেখাতে বোধিসত্ত্ব বার বার আবির্ভূত হন। মহাযানীরা ঠিক যেন গীতার ধর্মমতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥
৪র্থ অধ্যায় ॥

মহাযানী বৌদ্ধদের উক্ত মতটি নাগার্জুনের চিন্তাসম্ভূত বলে অনেকে মনে করেন, তবে ইনি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক নাগার্জুন কি না বলা শক্ত। ইনি শতবাহন-রাজ যজ্ঞশ্রী গৌতমীপুত্রের (১৬৬-১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) বন্ধু এবং সমসাময়িক ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রবর্তক।

হীনযান ও মহাযান এই দুই দলের মতভেদের কারণ ছিল বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে। হীনযানীদের সাধনা ছিল নিজেদের নির্বাণের জন্য। তথাগত যে জীবকে ভালবেসে তাদের দুঃখ দূর করতে, তাদের মুক্তির উপায়ের জন্য রাজ্য-ঐশ্বর্য-সুখ-সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন, হীনযানীরা সে উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। বরং তারা যেন নিজেদের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের এই হীনপনার জন্যই বোধ হয় তারা হীনযানী এবং তাদের মত হীনযান আখ্যা লাভ করে। অপর পক্ষে মহাযানীদের মত ছিল বড় উদার। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে বিচার করলে মহাযানীদের মতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যাবে। মহাযানীরা নিজেদের নির্বাণকে উচ্চে স্থান দেন নি। সকল জীবকে ভালবেসে সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নির্বাণ লাভ ছিল তাঁদের সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

হীনযান মতে সন্ন্যাস-জীবন যাপন না করলে নির্বাণ লাভ হয় না, কিন্তু মহাযান মতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র যে কেহ ভক্তি ও বিশ্বাসে তথাগতের পূজা করবে, আর বুদ্ধের প্রতিরূপ মানুষকে ভালবাসবে, সেই নির্বাণের অধিকারী হবে। ঠিক এইসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে উপনিষদের বাণী—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর মনে পড়ে চণ্ডীদাসের বাণী—'শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আর মনে পড়ে মহাপ্রভুর বাণী—'চণ্ডালোহপি দ্বিজোত্তমঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। আরও মনে পড়ে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' মহাযানীরা নিজেদের মতকে মহা (শ্রেষ্ঠ) যান (পথ) বলে মনে করতেন।

অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাযানীদের এই উদার মত বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—

"The Mahayanists believe that everyman—nay, every being of the world is a potential Buddha ; he has within him all the possibilities of becoming a সম্যক্-সম্বুদ্ধ i.e., the perfectly enlightened one. Consequently the idea of Arhathood of the Hinayanists was replaced by the idea of Bodhisattvahood of the Mahayanists. The general aim of the Hinayanists was to attain Arhathood and thus through নির্বাণ or absolute extinction to be liberated from the cycle of birth and death. But this final extinction through নির্বাণ is not the ultimate goal of the Mahayanists ; their aim is to become a Bodhisattva. Here comes the question of universal compassion (Mahakaruna) which is one of the cardinal principles of মহাযান। The Bodhisattva never accepts নির্বাণ though by meritorious and righteous deeds he becomes entitled to it. He deliberately postpones his own salvation until the whole world of suffering beings be saved. His life is pledged for the salvation of the world, he never cares for his own. Even after being entitled to final liberation the Bodhisattva works for the uplift of the whole world and of his own accord he is ready to wait for time eternal until every suffering creature of the world attains perfect knowledge and becomes a Buddha Himself. (P. 7 Tantric Buddhism.)

হীনযানী ও মহাযানী সম্প্রদায় প্রথমে থেরবাদী (স্থবিরবাদী) ও মহাসাংঘিকবাদী নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধসমাজে যে সময় হতে মতভেদ

দেখা দিক না কেন তার ফলে যে বৌদ্ধধর্মে বিবর্তন এসেছে একথা অনস্বীকার্য। এই বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোড়নে পৃথিবীর বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম সহজে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষে এই বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি এতদূর হয়েছিল যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের টনক নড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই সময় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করে ফেলল। এইরূপ সামঞ্জস্য বিধানের ফলে হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে নিল। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে হিন্দুসমাজে পূজিত হলেন। শ্রীজয়দেব ভগবান বুদ্ধকে তাই পূজা করলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ ॥

বুদ্ধদেব যে নূতন ধর্ম প্রচার করছেন এমন ভাবও তাঁর মনে কখনও আসে নি।

"The Buddha did not feel that he was announcing a new religion. He was born, grew up, and died a Hindu. He was resting with a new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilisation.'—Foreword. p. ix. S. Radhakrishnan. 2500 years of Buddhism.

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম বিরাট হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কৃত শাখা। ইহা ঠিক ঔপনিষদিক ধর্মের অভিনব সংস্করণ। শূন্যতত্ত্বের মূল উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে। আচার্য গঙ্গানাথ ঝাঁ-র মতে আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ-ভিত্তিক অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের নামান্তর। আচার্য রামানুজ এইজন্য আচার্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে বিদ্রূপ করেছেন। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-প্রশস্তি করেছেন, এমনকি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। আর বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধীও নহেন, তিনি শুধু পশুহত্যাসম্পর্কিত যজ্ঞের বিরোধী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে ঠিক এই মতই প্রকাশ করেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
২য় অঃ ॥

হে পার্থ, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত। তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায় স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাত-মনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে ; এই সকল শ্রুতিসুখকর বাক্য দ্বারা অপহৃত চিত্ত ভোগৈশ্বর্য-আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্যাকার্য নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না অর্থাৎ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

"Traditions differ as to why the second council was called. All the accounts, however, record unanimously that a schism did take place about a century after the Buddha's parinirvana because of the efforts made by some monks for the relaxation of the stringent rules observed by orthodox monks. The monks who diviated from the rules were later called the Mahasanghikas, while the orthodox monks were distinguished as the Theravadins (Sthaviravadins). It was rather 'a division between the conservative and the liveral, the hierarchic and the democratic' There is no room for doubt that the council marked the evolution of new schools of thought.'—Principal Schools and Sects of Buddhism, p99.—2500 years of Buddhism.

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ফলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হীনযানী (থেরবাদী বা স্থবিরবাদী) ও মহাযানী (মহাসাংঘিকবাদী) এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু এখানেও সব সমস্যার নিরসন হয় নি। প্রয়োজনবোধে উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব মত ও পথ জনগণের গ্রহণীয় করে তুলতে উদারতর করে তুলতে থাকলেন। এজন্য উভয় সম্প্রদায় নানা শাখা বিভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। থেরবাদী সন্ন্যাসীরা এগারটি শাখা বিভাগে এবং মহাসাংঘিকবাদীরা সাতটি

শাখা বিভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু শাখা বিভাগের এখানেও শেষ হয়নি। তথাগতের পরিনির্বাণের তিন চার শত বৎসরের মধ্যে এক এক করে বহু শাখা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল।

থেরবাদীদের মতে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাবলে অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যায় এবং মনকে পবিত্র করে সৎ-কে হৃদয়ে ধারণ করা যায়। সৎ চিন্তার দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞাবলে সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধি হয়। ইহা হতে নির্বাণের জ্ঞান জন্মে। তৃষ্ণা, অসদিচ্ছা এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারলে মানব নির্বাণের অধিকারী হয়। সুতরাং নির্বাণ অনির্বচনীয়, কায়বাক্-চিত্তের অতীত অর্থাৎ অবাঙমনসগোচর।

প্রজ্ঞাবলে মানব যখন এই নির্বাণের জ্ঞান লাভ করে তখন তার আর তৃষ্ণা অর্থ বিষয় বাসনা বা ভোগাসক্তি থাকে না। এমন ভাবাপন্ন মানব অর্হৎ অর্থাৎ প্রকৃত মানব নামে অভিহিত হন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যেমন দুই মহা সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেলেন, তেমনি তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থের ভাষাও পৃথক্ করে নিলেন। থেরবাদীরা গ্রহণ করলেন পালি ভাষা আর মহাযানীরা গ্রহণ করলেন সংস্কৃত ভাষা।

থেরবাদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাখা বিভাগ হল সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল মহাযানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু মহামনীষী অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতের নিকট থেরবাদী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। আর এর ফলে মহাযানী সম্প্রদায়ের যে বিজয় লাভ হয়েছিল তার জন্যে মহাযানবাদ অপ্রতিহত গতিতে দিকে দিকে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল।

মহাযানীরা তাঁদের শাস্ত্রবিধি সম্পূর্ণ করে উহা সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম, ধারণী ও বিবিধ এই পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মহাযানীরা থেরবাদীদের মত ভগবান্ তথাগতের মূল সূত্র বা মতগুলি গ্রহণ করেছিলেন। তবে একটু অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, মহাযানীরা সাতটি শাখাবিভাগে ভাগ হলেও তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিভিন্নতার মূলে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ। ঠিক প্রাচীন ঔপনিষদিক ধর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজনে বিবর্তনের পথে গিয়েছিল, মহাসাংঘিকবাদ বা মহাযানবাদও ঠিক যেখানে যেমন প্রয়োজন ঠিক সেখানে

তেমনই পরিবর্তন লাভ করেছে। এ যেন ঠিক উপনিষদের 'চরৈবেতি' অবস্থা। তবে মনে রাখতে হবে, সর্বত্র মানুষের প্রয়োজনই অগ্রাধিকার লাভ করেছে। এমন কি তাঁদের মতে একজন অর্হত্তেরও মানবের কাছ থেকে শিখবার জিনিষ আছে। সুতরাং অর্হৎভাবও নির্বাণের শেষ অবস্থা নয়।

মহাযানীরা জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মানবকে সরাগ বা বিরাগের পথে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ই মানবকে অসৎ অথবা সৎপথে আকর্ষণ করে। মানব ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারলে আসক্তিহীন হতে পারে। আসক্তিহীনতাই নির্বাণের উপায়। প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ সহজতর হয়। মহাযানীরা এইখানে থেরবাদীদের থেকে অনেক দূর এগিয়েছেন।

মহাযানী সম্প্রদায় যে সব শাখা বিভাগে ভাগ হয়েছিলেন তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বহুশ্রুতিয়, মাধ্যমিক এবং যোগাচার বিভাগত্রয়। বহুশ্রুতিয় বিভাগের প্রধান মতবাদ ছিল অনিত্যতা, দুঃখ, শূন্য, অনাত্ম এবং নির্বাণই লোকোত্তর ভাব, কারণ ইহাই মুক্তির পথে চালিত করে। যে বিবর্তিত মহাযানবাদ পৃথিবীর বহুদেশে বিস্তার লাভ করেছিল তার মূলে ছিল ইহার অগ্রদূত বহুশ্রুতিয় বিভাগের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়। বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের প্রচার এই প্রথম পাওয়া গেল।

মহাযানী বহুশ্রুতিয় শাখাবিভাগের সন্ন্যাসীদের দ্বারা শূন্যবাদ প্রথম প্রচারিত হলেও মহাযানী মাধ্যমিক শাখাবিভাগের সন্ন্যাসীদের দ্বারা ইহার সার্থক প্রসারলাভ ঘটেছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন, মাধ্যমিক শাখা বিভাগের প্রবর্তক নাগার্জুন বৌদ্ধ শূন্যবাদের উদ্ভাবক। যা হোক, নাগার্জুন যে শূন্যতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শূন্য বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ও সংসার বা জীবাত্মা অভিন্ন প্রমাণ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মই মহাযানীদের শূন্যতা। সুতরাং বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদাসীয় সূক্তে শূন্যতত্ত্বের কথা আছে। নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ণ মিল আছে। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূলে আছে—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানে তাহাতে আসক্তির অভাব। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু মিথ্যা। নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ বলে কোন বস্তুই নাই। সুতরাং

নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য আছে। আবার চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

[মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা]

আবার বেদে উক্ত হয়েছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইত্যাদি—অর্থাৎ যাহা হতে ভূত জন্মে, ইহাতে ব্রহ্ম অপদান কারক; যাহা দ্বারা ভূত জীবিত থাকে, ইহাতে ব্রহ্ম করণ কারক; পরিণামে যাহাতে ভূত প্রবেশ করে, ইহাতে ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সুতরাং নির্বিশেষ বস্তুর উপযুক্ত কারকত্রয় হওয়া অসম্ভব বলে ব্রহ্ম আবার সবিশেষ। তাই ব্রহ্ম নির্বিশেষ, আবার সবিশেষ। 'তদৈক্ষত প্রজয়া বহু স্যাং'—অর্থাৎ ব্রহ্মের যখন বহু হতে মন হল, তিনি তখন প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করলেন। এই অবলোকন ক্রিয়া দর্শনেন্দ্রিয় সাধ্য। যখন তিনি প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করেছিলেন, তখন প্রাকৃত নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় নি। তথাপি ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনক্রিয়া থাকায় দর্শনেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদিত হল। ইহাই ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্বিশেষ ভাব।

দেখা গেল শূন্যবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আর ঠিক এই কথা বলেছেন—

S. Radhakrishnan,—"By Sunyata, therefore, the Madhyamika does not mean absolute non-being, but relative being" —Indian Philosophy, Vol. I, p. 661.

নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের শূন্য ও সংসারের অভিন্নতা নিয়ে অনেক পণ্ডিত সমালোচনা করেছেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অথবা পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধ

শূন্যবাদের শূন্যতাতে পরিণত হয়েছে। আবার জীবাত্মা অথবা জীবাত্মারূপী রাধা করুণাতে পর্যবসিত হয়েছে। তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-রাধা বা পরমাত্মা-জীবাত্মা। একটু পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শাক্তমতের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিশেষতঃ মহাযানবাদের কোন পার্থক্য নেই। একই কথা শুধু একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে মাত্র।

শিব ও শক্তি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা এবং উপায়। এই প্রজ্ঞা এবং উপায় শূন্যতা এবং করুণায় পর্যবসিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

"The ultimate non-dual reality possesses two aspects in its fundamental nature, the negative (নিবৃত্তি) and the positive (প্রবৃত্তি) the static and the dynamic,—and these two aspects of the reality are represented in Hinduism by শিব and শক্তি and in Buddhism by প্রজ্ঞা and উপায় (or শূন্যতা and করুণা). It has again been held in the Hindu Tantras that the metaphysical principles of শিব-শক্তি are manifested in the material world in the form of the male and the female ; Tantric Buddhism also holds that the principles প্রজ্ঞা and উপায় are objectified in the female and the male. The ultimate goal of both schools is the perfect State of Union— Union between the two aspects of the reality and the realisation of the non-dual nature of the self and the not-self. (P. 3 Tantric Buddhim.)

মহাযানী মাধ্যমিক শাখাবিভাগের পর মহাযানী যোগাচার শাখাবিভাগের নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্য মৈত্রেয় বা মৈত্রেয়নাথ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে এই শাখা বিভাগের প্রবর্তন করেন। এই শাখাবিভাগের মতে বোধি লাভের সর্বোত্তম পন্থা হল যোগ অভ্যাস। যোগের দ্বারা চিত্ত স্থির হলে পর প্রকৃত জ্ঞান বা বোধি লাভ সম্ভব হয়। ঠিক হিন্দুধর্মে ব্রহ্মলাভের উপায় সম্বন্ধে ঐ কথাই বলা হয়েছে। বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করতে প্রাচীন আর্যঋষিরা যোগ অভ্যাস করতে বার বার উপদেশ দিয়েছেন। যোগবলে চিত্তকে অন্তর্মুখী করতে পারলে ব্রহ্মসন্দর্শন হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুম্ ধনঞ্জয় ॥

৯॥ ১২শ অঃ॥

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।

মহাসাংঘিকবাদ বা পরবর্তী মহাযানবাদ কালক্রমে সাতটি শাখাবিভাগে ভাগ হয়েও সমাপ্তি লাভ করেনি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে উহার আরও শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। অবশ্য এই শাখা-প্রশাখাগুলি ঐ মহাযানবাদের অন্তর্গত। হিন্দুধর্মের মধ্যে যেমন বহু সম্প্রদায় আছে (শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব ইত্যাদি) এবং যেমন তাহারা সকলেই হিন্দু, অনুরূপভাবে বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেও ঠিক তেমনি বহু সম্প্রদায় দেখা দিল এবং তাহারা সকলেই মহাযানী বৌদ্ধ।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দের মধ্যে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু উহার প্রভাব প্রথম দিকে খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। তা হলেও ঐ মন্থরতা ধীরে ধীরে অপসৃত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রভাব বৃদ্ধির তীব্রতা অনুভূত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন মহাযানবাদের শাখা-প্রশাখা বাহির হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। শাখা-প্রশাখাগুলি এমনভাবে প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট হয়েছিল যাতে সেগুলি সর্বস্তরের মানুষের গ্রহণীয় হয়। এই শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় দেখতে পাওয়া যাবে। তান্ত্রিক ও সহজিয়া প্রভাব আবার সর্বাপেক্ষা বেশী। বাঙলা, বিহার, নেপাল ও তিব্বতে এই সময়ে যেন বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসেছিল। এই সমস্ত স্থানে বহু মহাবিহার স্থাপিত হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত বিহারে থেকে ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-সাধনা করেছিলেন। এই জ্ঞানসাধনার ফলে বৌদ্ধধর্ম বহু দূরদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। বাঙলা দেশের পাল রাজারা ছিলেন পরম সৌগত। কিন্তু বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ত ছিলই না, বরং তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আনন্দবোধ করতেন। পরধর্ম এবং পরমত সহিষ্ণুতার যে পরিচয় তাঁহারা ঐ সময়ে দেখিয়েছেন তাহা যে কোন কালে যে কোন দেশের অনুকরণীয়। পরবর্তী যুগে যে ধর্মান্ধতার পরিচয় দেশে দেশে দেখা গিয়েছে, বর্ণবিদ্বেষের যে নগ্নরূপ দিকে দিকে প্রকাশ হয়েছে—ঐ যুগে ভারতে তা ছিল অজ্ঞাত। পরম সৌগত পালরাজাদের অনেকেই হিন্দু রাজকুমারী

বিবাহ করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, হিন্দু দেবমন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম করে তাঁরা মহাপুণ্য অর্জন করতেন। কেহ কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ হিন্দুধর্মমতে সম্পন্ন করেছেন। আবার একই পরিবারে পিতা পরম সৌগত, এক পুত্র পরম বৈষ্ণব এবং অন্য পুত্র পরম শৈব এই নিদর্শনেরও অভাব নেই। এই সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,—

'পালবংশীয় নরপতিরা অনেকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয় রাজকুমারীদের। রাজা কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব রাজকুমারীকে; এই রাজপুত্রী রামায়ণ মহাভারত পুরাণে ছিলেন পারঙ্গম। পরম সৌগত কান্তিদেবের এই জননী ছিলেন 'শিবপ্রিয়া'। কাম্বোজেশ্বর গৌড়পতি রাজপালের প্রথম পুত্র নারায়ণ পাল 'বাসুদেব-পাদাব্জ-পূজা-নিরত মানসঃ', এবং দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদিপূর্বক শঙ্কর ভট্টারকের (মহাদেবের) উদ্দেশে তাঁহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্র মুদ্রাদ্বারা পট্টিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই শত-তিন শত বৎসর আগে বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাল রাজারাতো সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যমূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব ত ইহাদেরই উদ্দেশ্য।...ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতো ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়া মনে হইতেছে। সেই শ্রাদ্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ।... কাম্বোজবংশীয় রাজাপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণ পাল ছিলেন বাসুদেব ভক্ত, এবং আর এক পুত্র নয়পাল ছিলেন শৈব।'

—॥ বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩০-৩১ ॥

খ্রীঃ সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের যে প্লাবন এসেছিল, তার ফলে পালবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙলা দেশে ও তৎসন্নিহিত নানাস্থানে বহু বৌদ্ধ মহাবিহার স্থাপিত হয়েছিল। এইসব মহাবিহারে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও অবস্থান করতেন। এই বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-সাধনা লিপিবদ্ধ করতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি মহাযানী বৌদ্ধধর্ম অবস্থিতির ফলে,

বিশেষতঃ পরম সৌগত পালবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাতে মহাযানবাদের মধ্যে বিরাট বিবর্তন এসে গেল। এই বিবর্তনের ফলে বাংলার মহাযানবাদ কয়েকটি স্তরে ভাগ হল। বিভাগগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মন্ত্রযান ও সহজযান। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রভাব দেখা যায় ঐ মন্ত্রযান ও সহজযানের মধ্যে।

যে সব বাঙালী মহাযানী বৌদ্ধ মন্ত্রযান ও সহজযান মতাবলম্বী ছিলেন তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানসাধনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন সন্ধ্যাভাষায়। সন্ধ্যাভাষার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন,—'সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়—খানিক বুঝা যায় না।' (বৌদ্ধগান ও দোহা, ভূমিকা, ৮ পৃঃ।) সন্ধ্যাভাষায় লিখিত উক্ত ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানসাধনা বর্তমানে 'চর্যাপদ' নামে অভিহিত হয়েছে। এই চর্যাপদ নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ শ্রীযুত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বহু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কোর্ডিয়ার সাহেবের যে গ্রন্থ তালিকা আছে তাতে লুইপাদের 'লুইপাদ গীতিকা', তারনাথ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের 'বজ্রানন-বজ্রগীতি', 'চর্যাগীতি' 'দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-ধর্মগীতিকা', ভুসুকুর 'সহজ গীতি', কৃষ্ণাচার্যের বজ্রগীতি, সরহের 'দোহাকোষ গীতি,' দোহাকোষ চর্যাগীতি, ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি, কঙ্কণের 'চর্যাদোহাকোষ গীতিকা', বিরূপের 'বিরূপ গীতিকা', 'বিরূপ বজ্রগীতিকা', শবরের 'মহামুদ্রা বজ্রগীতি', 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থ গীতি' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম আছে। কোর্ডিয়ার যে সমস্ত গ্রন্থের নাম উদ্ধার করতে পেরেছেন এমত মনে হয় না। কারণ বাঙলা, বিহার, তিব্বত ও নেপালের মহাবিহারে যে সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যানধারণা ও জ্ঞান-সাধনা করতেন তাঁদের লিখিত পুঁথিপত্র সব কোর্ডিয়ারের হস্তগত হওয়া আদৌ সম্ভব নহে।

এর পর আছে ইসলামী অভিযান। ইসলামী অভিযান আরম্ভ হলে পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মহাবিহারগুলি ধ্বংস হবার আগেই পালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঙলা ও বিহারের সমতল ক্ষেত্র হতে দূরে পাহাড়ের ক্রোড়ে, নেপালে, তিব্বতে, কাশ্মীরে, আসামে, ব্রহ্মে এবং আরও দূরে চীনে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যখন পালিয়েছিলেন তখন তাঁরা মহাবিহারগুলিতে রক্ষিত পুঁথিপত্র—যতদূর পেরেছিলেন নিশ্চয় সঙ্গে

নিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে কিছু অনুলিপি, কিছু তিব্বতী অনুবাদ আছে। এই সব পুঁথিপত্রের অন্তর্গত মুষ্টিমেয় যে কয়টি পদ পাওয়া গেছে তৎসম্বন্ধেই পূর্বোক্ত বুধমণ্ডলী নানাভাবে আলোচনা করেছেন। মনে হয় যদি সব গ্রন্থ উদ্ধার করা যেত তা হলে সন্ধ্যাভাষায় লিখিত এক বিরাট পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হত।

মহাযানবাদের যে বিবর্তনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় সন্ধ্যাভাষায় লিখিত এই পদগুলির মধ্যে। চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলে জানতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও সহজিয়া মত অতি আশ্চর্যরূপে বৌদ্ধ মহাযানবাদে প্রবিষ্ট হয়ে মন্ত্রযান সহজযানে পরিণত হয়েছে। অবশ্য একথা এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং শাক্ত তান্ত্রিক মত পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি। বৈষ্ণবের সহজ সাধন বা সহজিয়া মত পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল জয়দেবের সময় থেকে মহাপ্রভুর সময়ের মধ্যে আর শাক্ত তান্ত্রিক মতের পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল রামপ্রসাদ ও পরমপুরুষ পরমহংসদেবের সময়ে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মহাযানবাদের বিবর্তনের ফলে যে মন্ত্রযান ও সহজযানবাদের জন্ম হয়েছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও সহজিয়া মতের অপূর্ণ বীজের প্রভাব বিদ্যমান। পরিণত সহজ সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তার পরিচয় পাওয়া যায় রামপ্রসাদের পদে।

কালী হলি মা রাসবিহারী
  নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
  কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা,
  আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি,
  এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
  বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু শ্যামা শ্যাম তনু
  একই সকল বুঝিতে নারি॥

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাযানবাদের বিবর্তন এসেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। সর্বস্তরের মানুষের গ্রহণীয় করবার জন্য মহাযানবাদের বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়েছিল। প্রশাখাগুলির মধ্যে মন্ত্রযান ও সহজযান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লিখিত হয়েছে মন্ত্রযান ও সহজযানের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানসাধনা বর্তমানের চর্যাপদগুলির মধ্যে নিহিত আছে। মন্ত্রযানের উৎপত্তির মূলে ছিল বহুশ্রুতিয়, মাধ্যমিক ও যোগাচার প্রভৃতি মহাযানবাদের শাখাবিভাগগুলির তাত্বিক কাঠিন্য। বৌদ্ধ জনগণ মহাযানবাদের কঠিন তত্ত্ব আদৌ বুঝতে পারেনি, এজন্য নূতন এক সম্প্রদায়ের মহাযানী আচার্য মন্ত্রযানবাদের প্রচার করলেন। ইহাও ঐ মহাযানবাদের একটি শাখাবিভাগ। মন্ত্রই হল এই শাখাবিভাগের যান বা পথ। এদের ধারণা, মন্ত্রবলে বোধি বা জ্ঞান লাভ করা যায়, আর সে জ্ঞানই নির্বাণ লাভের পথ। তান্ত্রিক প্রভাব এই মন্ত্রযানের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময় হতে গুরুর প্রভাব বৌদ্ধ জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

মন্ত্রযানের পর সহজযান। অবশ্য মন্ত্রযান ও সহজযানের মধ্যে বজ্রযানবাদের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু একটু অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বজ্রযানেরই পরিণত অবস্থা হল সহজযান। বজ্রযানবাদ যে মহাযানী মাধ্যমিক বিভাগের গ্রানিট স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত তা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রভেদ শুধু প্রয়োগ কৌশলের। মাধ্যমিক বিভাগ 'শূন্য' ও 'সংসার'-এ যে জটিল তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সহজযানীরা খুব সহজ পন্থায় তার নিরসন করে দিয়েছেন। সহজযানের প্রথম স্তর বজ্রযান মতে জগতের অণু-পরমাণু অবধি সবই শূন্য। শূন্যের এই জ্ঞানই হল বোধি, আর এই বোধিলাভ হলে পর নির্বাণ লাভ হয়। তবে বজ্রযানীরা নির্বাণ না বলে এর নাম দিলেন নিরাত্মা। বোধি লাভ হলে, তাঁদের মতে চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা আসে। আর চিত্তের এই বিশেষ অবস্থার নাম বোধিচিত্ত। বোধিচিত্ত নিরাত্মাতে লীন হয়ে যায়। নিরাত্মাতে লীন হলে পর মহাসুখের উদয় হয়। এই মহাসুখ অবাঙ্‌মনসগোচর অর্থাৎ অনির্বচনীয়, কায়-বাক্-চিত্তের অতীত। চিত্তের ঐ বিশেষ অবস্থা আসে যোগসাধনের দ্বারা। সুতরাং মহাযানী যোগাচার বিভাগের পথও বজ্রযানীরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং উপনিষদের 'পরমাত্মা ও জীবাত্মা' এবং 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তত্ত্ব এখানেও দেখা যায়।

বজ্রযানের চরম বিকাশ দেখা গেল সহজযানের মধ্যে। মন্ত্রযানের মন্ত্র বা মন্ত্র-কল্পিত মূর্তি বজ্রযানে প্রসার লাভ করেছিল, কিন্তু সহজযানে এসে ঐ মন্ত্র বা

মন্ত্র-কল্পিত মূর্তি আর ঠাঁই পেল না। নির্বাণের রূপও পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার স্থানে এল ধর্মকায়। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধর্মকায়ই হল পরমাত্মা। পরমাত্মা থেকে যেমন জীবাত্মার সৃষ্টি হয়, তেমনি এই ধর্মকায় হতে ধর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয় বা ধর্মকায় হতে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হয়। জীবাত্মা যেমন মায়ার অধীন এবং যোগসাধনার দ্বারা মায়ামুক্ত হয়ে পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায়, অনুরূপভাবে বোধিচিত্ত ধর্মকায়ে লীন হয়। এই বোধি বা জ্ঞান লাভ হলে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতার জ্ঞান লাভ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মোহমুক্তির সাধনা করে। এর ফলে কামনার বিলুপ্তি ঘটে ও নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ ধর্মকায়ে মিশে যায়।

নির্বাণের স্বরূপ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, ইহা নিত্য, করুণাভাববিশিষ্ট ও আনন্দময়। বোধি বা জ্ঞান লাভ হলে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতার সম্বন্ধে ধারণা জন্মে আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অহংভাবের অর্থাৎ অহঙ্কারের বিলুপ্তি ঘটে। অহঙ্কারের বিলুপ্তিতে নিত্যতার জ্ঞান আসে, তখন করুণাভাববিশিষ্ট হয়ে আনন্দের মধ্যে ডুবে যায়। এরই নাম ধর্মকায়ে (তথতা বা শূন্যতা) মিশে যাওয়া বা নির্বাণলাভ। সুতরাং নির্বাণ সুখময়। এই সুখময় ভাবই বৌদ্ধ-সহজিয়াবাদ বা সহজযান। সহজযান বা সহজপথ ধরে নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়াই সহজযানের মূল লক্ষ্য। সহজযানের মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া (রাগানুগা বা পরকীয়া) ও শাক্ত তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সহজিয়া (রাগানুগা বা পরকীয়া) তত্ত্বের মধ্যেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির চরম বিকাশ সাধিত হয়েছে একথা নানাভাবে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবের সাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার যে ঐক্য আছে নানাভাবে তাহাও আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণবেরা যেখানে উপাস্য দেবতাকে প্রভু, সখা, পুত্র ও পতিভাবে পূজা করেছেন, শাক্ত তান্ত্রিকেরা সেখানে উপাস্য দেবতাকে কন্যারূপে ও মাতৃভাবে পূজা করেছেন। এ শুধু সাধনার প্রকার ভেদ।

মাধ্যমিকবাদে সুখ বা আনন্দ শুধু তত্ত্ব, কিন্তু সহজযানবাদে সুখ বা আনন্দ তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সহজযানীরা সুখ বা আনন্দের নামকরণ করে এর বাসস্থান ঠিক করে দিয়েছেন। সহজযানীরা সুখ বা আনন্দকে তত্ত্ব হতে টেনে এনে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। আর এই দেবী হলেন ঐ নিরাত্মা। নিরাত্মা হলেন তখন নিরাত্মাদেবী। সহজযানীর ধর্মাকায়ে মিশে যাওয়া অর্থাৎ নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভ হল ঐ নিরাত্মাদেবীর

সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাশূন্যে মিশে যাওয়া। যেমন জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায় এ ঠিক তেমনি অবস্থা। নিরাত্মাদেবীকে সহজযানীরা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন, এ ঠিক ব্রহ্মোপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। ইহা অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। আর এই আত্মোপলব্ধিজনিত আনন্দ অবাঙ্‌মনসগোচর। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই নিরাত্মাদেবীকে উপলব্ধি করা যায় না বলে সহজযানীরা এঁকে অস্পৃশ্যা ডোম্বী বলেছেন, আর ইনি অতীন্দ্রিয়লোকে বাস করেন বলে তাঁরা দেহনগরীর বাইরে এঁর আবাসস্থান নির্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখেছেন,

'নির্বাণ সুখময়, কারণ দুঃখের নিবৃত্তিতেই নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মের ন্যায় ধর্মকায় বা নির্বাণেও সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব অর্পিত হইয়াছে। নির্বাণের এই সুখবাদ হইতেই পরবর্তীকালে সহজিয়া মতের উদ্ভব হইয়াছে। মাধ্যমিক শাস্ত্রে এই আনন্দ তত্ত্বমাত্র, কিন্তু সহজিয়ারা ইহাকে রূপ প্রদান করিয়াছেন, ইহার নামকরণ করিয়াছেন, ইহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি নৈরাত্মাদেবী, নামান্তরে পরিশুদ্ধাবধূতিকা, শূন্যতার সহচারিণী। সাধক যখন পার্থিব মোহ ছিন্ন করিয়া ধর্মকায়ে (তথতা বা শূন্যতায়) লীন হন, তখন তিনি নৈরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া যেন মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন।···নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া অস্পৃশ্যা ডোম্বী, দেহ-নগরীর বাহিরে অবস্থান করে।···তান্ত্রিকমতে তাহার আবাসস্থান দেহসুমেরুর শিখর প্রদেশে, অর্থাৎ উষ্ণীষকমলে।···এই সহজ নলিনীবনে নির্বিকল্প হইয়া প্রবেশ করিতে হয়।' চর্যাপদ, ভূমিকা—পৃঃ ১৮

হিন্দুদর্শনে যেমন নিরাকার ব্রহ্মকে সাকারে রূপদেওয়া হয়েছে, অরূপকে সরূপে আনা হয়েছে, অনন্ত সান্তের মধ্যে এসেছেন, অসীম সসীমে মিশে গেছেন, বৌদ্ধ সহজযানীরা ঠিক তেমনই নিরাত্মাকে নিরাত্মাদেবীরূপে কল্পনা করে নিলেন। সুতরাং যা তত্ত্বের মধ্যে নিহিত ছিল তা পববর্তীকালে রূপের মধ্যে এসে গেল। এখানে হিন্দুদর্শনের দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বই প্রকারান্তরে এসে গেছে। যাহোক. সহজযানীরা যখনই নির্বাণ বা নিরাত্মাকে (তথতা বা শূন্যতা) দেবীর আসনে স্থাপিত করলেন, অমনই অতীন্দ্রিয়বাদ এসে গেল। নিরাত্মাদেবীকে সহজযানীরা যেমনভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করে আনন্দলোকে বিচরণ করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়া, শাক্ত তান্ত্রিক ও বৌদ্ধসহজযানীরা এখানে ঠিক একভাবে সাধনমার্গে চলেছেন।

সহজযানীরা যেভাবে অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করতে চান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কুক্কুরীপাদের একটি পদে তার সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে।

আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥ ২॥

সহজযানী সাধক এখানে অতীন্দ্রিয় আনন্দ উপভোগের প্রয়াসী। তিনি তাই বিআতী বা নিরাত্মাদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, নিরাত্মাদেবী যেন তাকে আঙ্গণ ঘরপণ বা উষ্ণীষকমলে যে আনন্দময় স্থান আছে সেখানে নিয়ে যান। সেখানে গেলে সাধক যোগবলে সুসুরাকে বা শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করে দিতে সমর্থ হবেন, আর বহুড়ী বা নিরাত্মাদেবী জেগে থাকবেন অর্থাৎ সাধক অতীন্দ্রিয় আনন্দলাভ করবেন। সহজযানী সাধক এখানে তাঁর ইচ্ছা মত নিরাত্মাদেবীকে বহুড়ী বা বধূরূপে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকগণ তাঁদের সাধনার সুবিধার জন্য তাঁদের উপাস্য দেবতাকে যখন যেমন ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন, এখানেও ঠিক সেই ভাবটি দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া শাক্ত তান্ত্রিক সাধনার কুম্ভক যোগসমাধির প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। আবার আঙ্গণ ঘরপণ বা উষ্ণীষকমল তান্ত্রিক চিৎ-শতদলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিবাত্মাদেবীকে উপলব্ধি করা যায় না, পরন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় লোকে থাকেন বলে বিরুব তাঁর একটি পদে নিরাত্মাদেবীকে শুণ্ডিনী বা অস্পৃশ্যা নারীরূপে কল্পনা করেছেন। এই শুণ্ডিনী দেবীর সঙ্গ লাভ করতে পারলে যোগীর চিত্ত শুদ্ধ হয়, আর এর ফলে সহজ আনন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়।

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥৩॥

সিদ্ধাচার্য বিরুব তাঁর এই পদে ঠিক তন্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয় আনন্দলাভের কথাই বলেছেন। তান্ত্রিক যোগী যোগবলে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর গতি রোধ করে মূলাধার হতে সুষুম্না নাড়ীপথে আত্মাকে সহস্রার পদ্মে বা চিৎশতদলে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কাছে প্রেরণ করেন। এর ফলে চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি সাধকের চিত্তশতদলে জাগ্রত হন। এই মহাশক্তি জাগ্রত হলে পর সাধক মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হন। ইহাই তান্ত্রিকের অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ, বৈষ্ণবের অভীষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন বা যোগীর ব্রহ্মানন্দ লাভ। বিরুব এই পদে বলেছেন—শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ। দোহার টীকাতে আছে,—

বাম নাসাপুটে প্রজ্ঞাচন্দ্রস্বভাবেন ললনা স্থিতা।
দক্ষিণ নাসাপুটে উপায়সূর্যস্বভাবেন রসনা স্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা। ১২৫ পৃঃ।

তন্ত্রোক্ত ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না ইহারা বিরুবের দুই ঘর অর্থাৎ ললনা ও রসনা এবং 'বারুণী অর্থাৎ অবধূতী নাড়ী। ললনা ও রসনার গতি রোধ করে সহজযানী অবধূতিকারূপিণী নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সহজ আনন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করেন। এই অবস্থার নাম নির্বিকল্প-সমাধি। জাগতিক জ্ঞান রহিত হয়ে যায় এই সময়ে, আর যোগী শুধু আনন্দ-সায়রে ডুবে থাকেন।

গুণ্ডরীপাদের একটি পদে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন,—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি করহু বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥
খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল॥
ভনই গুণ্ডরী অম্হে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা॥ ৪॥

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগের এই চর্যাপদগুলিতে বৌদ্ধ বাঙালী তান্ত্রিক সাধকগণ তাঁদের সাধনার মাধ্যমে যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করেছিলেন, সেই আনন্দ অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের সহজ-সাধনার তত্ত্বগুলিও আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন। যোগবলে যে সহজ-সুখ বা সহজ আনন্দ লাভ হয় সেই আনন্দের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এই চর্যাপদগুলির মধ্যে। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মানন্দ লাভের কথা। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মানন্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহাই মহাসুখ বা সহজসুখ বা সহজ আনন্দ। আর এই সহজ আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। ইহা অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু অপরকে বুঝানো যায় না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই অতীন্দ্রিয় আনন্দকে কিছু প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—তন্ত্রোক্ত এই তিন নাড়ী হোলো গুণ্ডরী পাদের 'তিঅড্ডা' অর্থাৎ ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নাম্নী তিন নাড়ী। নিরাত্মাদেবীকে তিনি 'জোইনি' নাম দিয়েছেন। আনন্দ দান বুঝাতে 'অঙ্কবালী' বলেছেন। 'বিচিত্রাদি-লক্ষণযোগেন আনন্দাদিক্রমং দদাতি।'—দোহাটীকা, ১২৫ পৃঃ। 'কমলকুলিশ ঘাণ্টি' অর্থে বজ্রপদ্ম ঘর্ষণ বা সংযোগজনিত আনন্দ বুঝিয়েছেন। 'সম্যক্‌কুলিশাব্জসংযোগঘৃষ্টৌ আনন্দ-সন্দোহতয়া'—। দোহাটীকা ১২৫ পৃঃ।

ধর্মকায় (তথতা বা শূন্যতা) হতে বোধিচিত্তের উদ্‌ভব একথা সহজযানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বোধিচিত্ত সর্বদা পরিশুদ্ধ। তবে ইহা অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন থাকে। মোহাচ্ছন্ন হলেও ইহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয় না। মোহজাল ছিন্ন হলেই আবার অমিলন বজ্রপদ্মের মত ধর্মকায় (হিন্দুদর্শনের পরমাত্মা) প্রকটিত হয়। ঠিক এই কথাই Suzuki বলেছেন, "Being a reflex of the Dharmakaya, the Bodhichitta is practically the same as the original in all its characteristics"—Mahayana Buddhism, Page 299. বোধিচিত্তের মোহজাল ছিন্ন হলেই নিরাত্মাদেবীকে (নির্বাণ), আলিঙ্গন করে ধর্মকায়ে লীন হয়। বোধিচিত্তের ধর্মকায়ে লীন হওয়ার অবস্থাটি অতীন্দ্রিয়বাদের চরম কথা। নিরাত্মাদেবীকে লাভ করে ধর্মকায়ে লীন হবার জন্য বোধিচিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ঠিক যেমন পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য জীবাত্মার আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিরাত্মাদেবীর বাসস্থান হোলো সহজযানীদের মতে মস্তকের মহাসুখচক্রে (শাক্ততন্ত্র মতে সহস্রার পদ্মে), আর বোধিচিত্তের

বাসস্থান হোলো মণিকুলে। দোহাটীকার মতে মণিমূলে। 'পুনস্তস্মিন্ ক্রীড়ারসমনুভূয় মণিমূলাৎ উর্ধ্বংগত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতি।'—। (দোহাটীকা)। মোহমুক্ত বোধিচিত্ত নিরাত্মাদেবীকে লাভ করে ধর্মকায়ে লীন হবার জন্য মণিকূল থেকে উর্ধ্বে উঠে মহাসুখচক্রে উপস্থিত হয় আর এখানেই নিরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন করে ধর্মকায়ে লীন হয়।

শাক্ত-তন্ত্র মতে মোহমুক্ত জীব মহাশক্তিতে লীন হয়ে যায়। এই মহাশক্তি চৈতন্যরূপিণী। তিনি মস্তকে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত থাকেন। জীবরূপী আত্মা থাকে মূলাধারে। সেখানে থেকে মুমুক্ষু আত্মা উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে সহস্রার পদ্মে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হন। উপনিষদের পরমাত্মার সঙ্গে মুমুক্ষু জীবাত্মার ঠিক এইভাবেই মিলন হয়।

প্রাচীন চর্যাপদগুলির মধ্যে যেভাবে অতীন্দ্রিয় আনন্দের সমাবেশ হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সাধকেরা আত্মার স্বরূপ বুঝতে পেরে, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, মুক্তির পথে অগ্রসর হয়ে অথবা নির্বাণ লাভ করতে যেয়ে মহা আনন্দ বা মহাসুখ লাভ করেছেন। এই মহাসুখ বা মহা আনন্দের অধিকারী হয়ে তাঁরা জগতের লোককে তাঁদের লব্ধ আনন্দ বা সুখের অংশীদার করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছেন। আর এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাঁরা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। যা প্রকাশের অতীত, যা শুধু অনুভববেদ্য সেই অতীন্দ্রিয় আনন্দকে তাঁরা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। যে পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ঐ আনন্দ লাভ করেছিলেন সেই পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাঁরা। সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা, যোগ সাধনার পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু সর্বদাই গুরুর সহায়তা লাভের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কারণ ধর্মস্যতত্ত্বম্ নিহিতংগুহায়াম্। ধর্মের তত্ত্ব বলে বুঝানো যায় না, গুরু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।

পরবর্তীকালের শাক্ত সাধক-কবির পদের সঙ্গে গুণ্ডরীপাদের এই চর্যাপদটির অপূর্ব মিল আছে। সহস্রার পদে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে পারলে 'প্রাণারাম' বা 'আত্মারাম' অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মার আরাম অর্থাৎ মহাসুখ বা মহা আনন্দ লাভ হয়। এই মহা আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করবার পন্থাটি অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের এই কবিতাটিতে :—

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে।

সাধক গুণ্ডরীপাদ তদীয় পদটিতে বোধিচিত্তের নিরাত্মাদেবীর প্রতি যে প্রবল আকর্ষণের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে পরবর্তীকালের সাধককবি চণ্ডীদাসের একটি পদের আশ্চর্য মিল আছে। গুণ্ডরীপাদ বলেছেন,—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥ ৪ ॥

সাধক নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের প্রয়াসী। নিরাত্মাদেবীর মুখমধু পান করে তবে মহাসুখ বা মহা আনন্দ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। সুতরাং সাধক জোইনি অর্থাৎ নিরাত্মাদেবীকে না দেখে ক্ষণমাত্র জীবনধারণ করতে পারে না। চণ্ডীদাসও ঠিক তাঁর পদে এই ভাবই প্রকাশ করেছেন,—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীবাত্মা পরমাত্মার এক খণ্ডাংশ এইটুকু মাত্র প্রভেদ। কিন্তু কায়া ও ছায়া যেমন পৃথক থাকতে পারে না, জীবাত্মা ও

পরমাত্মা তেমনই পৃথক থাকতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। জীবাত্মা মায়াধীন আর পরমাত্মা সব কিছুর অতীত। তাই পরমাত্মা নির্গুণ, নির্বিকার এবং নিরাকার। উভয়ের সম্পর্ক কিন্তু লৌহ ও চুম্বকের মত। তাই রাধারূপী জীবাত্মা কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার জন্য ব্যাকুলা। আবার কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা রাধারূপী জীবাত্মাকে ছেড়েও যেতে পারেন না। রাধা মায়াধীন জীবাত্মা, তাই সব কিছুর অতীত যে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা তাকে সে ধরে রাখতে পারে না। সে যে অধরা। তাই এই অধরাকে ধরে রাখতে পারবে না বলে রাধারূপী জীবাত্মার এত ব্যাকুলতা, এত ক্রন্দন। বৈষ্ণব সাধক-কবি এমনই করে বিচ্ছেদের দুঃখকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে রূপান্তরিত করেছেন। আর এই রূপান্তরের মধ্যে আছে মহাভাব বা মহা আনন্দ অর্থাৎ প্রাণারাম বা আত্মারাম।

বৌদ্ধ সিদ্ধা কৃষ্ণাচার্যের মতে সহজযানীরাই শুধু নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের অধিকারী। সহজপথই হোলো নির্বাণ লাভের একমাত্র পথ। কৃষ্ণাচার্যের মতে ঐ নির্বাণই হোলো সহজ আনন্দ। আর এই সহজ আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। কৃষ্ণাচার্যের মতে নিরাত্মাদেবীই নির্বাণ দেবী। সুতরাং তাঁর মতে নিরাত্মা ও নির্বাণ পৃথক নয়। নিরাত্মা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, এজন্য নিরাত্মাকে তিনি ডোম্বী অর্থাৎ ডুমনী নাম দিয়েছেন। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই তো অতীন্দ্রিয়। সুতরাং নিরাত্মা দেবী অনুভববেদ্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ। ইন্দ্রিয়াতীত নিরাত্মাদেবীর সঙ্গলাভে উৎসুক হয়ে কৃষ্ণাচার্য ঘৃণালজ্জাহীন নগ্ন যোগী হয়েছেন। যোগীরা যখন ঘৃণা-লজ্জার হাত থেকে মুক্ত হন, তখনই তাঁর অন্তর নিষ্কলুষ হয় এবং তখনই তিনি নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হন। সংসারের মোহ অর্থাৎ অবিদ্যার মোহ কাটাতে পারলে সাধক ঐ নগ্ন যোগীর ভাব পেতে পারেন। এমন অবস্থায় উপনীত হতে পারলে সাধকের মন মহাসুখ বা মহা আনন্দ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ইহাতেই নিরাত্মাদেবী বা নির্বাণ দেবীর সঙ্গে সাধকের মিলন হয়। কৃষ্ণাচার্য এই মিলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেছেন যে তিনি ৬৪ দলযুক্ত পদ্মের উপরে উঠে ডোম্বীর সঙ্গে মহানন্দে নৃত্য করেন। অবিদ্যার মোহ কাটাতে হলে অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীকে ধ্বংস করতে হবে—একথাও কৃষ্ণাচার্য তাঁর পদে স্পষ্টভাবে বলেছেন। কৃষ্ণাচার্যের এই পদে তান্ত্রিক সাধনার সহজ পথ অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধক কবির উদাত্ত কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে,—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্নু কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদ্‌ভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥ ১০॥

অতীন্দ্রিয়বাদী বৌদ্ধ সিদ্ধা কৃষ্ণাচার্য সহজ সাধনার পথে নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলনের পূর্ণানন্দ লাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য অবিদ্যার মোহপাশ ছিন্ন করে তিনি নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলনের আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

তেইশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত পঞ্চাশটি চর্যাপদের মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের পাঠ পাওয়া গেছে। এই পদগুলি অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যাবে প্রত্যেক সিদ্ধাচার্য মহাযানী সহজপথের সন্ধান দিয়েছেন। বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম কেমনভাবে নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের অধিকারী হয়েছে তাহাই ঐ পদগুলির মধ্যে রূপলাভ করেছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হোলো নির্বাণ লাভেই মহাসুখ বা মহা আনন্দ লাভ। আর এই মহাসুখ বা মহা আনন্দই উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ, বৈষ্ণবদর্শনের মহাভাব আর শাক্ত তান্ত্রিক মতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির জাগরণের দ্বারা আত্মারাম লাভ। এ সবগুলিই এক কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি; আর এ সবগুলিই সার্বজনীনভাবে অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। এ বিষয়ে তাঁরা উপনিষদ ও গীতার তত্ত্বই অনুসরণ করেছেন। আর 'নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'।

নিজেকে জানা, নিজেকে চেনাই হোলো হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সারকথা। সব ধর্মেরই ঐ একই সার কথা। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—

উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫ ॥

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ সংসার মায়াতে আবদ্ধ হইতে দিবে না। কারণ সংসারে আবদ্ধ হইতে দিলে আত্মার অবনতি আসে। আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।

গীতার ঐ শ্লোকে যে আত্মার দ্বারা আত্মাকেই উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে উহা একটি রূপক মাত্র। ঐ রূপক বিশ্লেষণ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ 'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান, আত্মাকে চেন, সর্বদা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর। এই চিন্তার দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানতে পারা যায়। অভ্যাস যোগের দ্বারাই ইহা সম্ভব। যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি সংযত ও সংহত হয়। চিত্ত সংহত হলেই আত্মোপলব্ধি ঘটে। ইহাই মহাসুখ বা মহাআনন্দ। এই মহাসুখই ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

নিজেকে জানলেই অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ঘটলেই মনে হবে—'সচ্চিদানন্দ-রূপোঽহং নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্'। এটি হোলোজ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু ভক্তি-মার্গে এভাবে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হয়নি। জ্ঞানমার্গে বলা হোলো—জীব নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই খণ্ডাংশ। যোগ সাধনার দ্বারা সে নিজেকে ব্রহ্মে লীন করে দিতে পারে। ভক্তিমার্গে বলা হোলো,—

পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরি ॥

—এই প্রার্থনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে—জীব মায়াধীন। এই মায়াধীন জীবকে ভগবান যন্ত্রের মত চালিয়ে চলেছেন। এমন অবস্থায় ঐ চলমান জীব তাঁর শরণ নিলে, অনন্যা ভক্তির দ্বারা তাঁর চিন্তা করলে, তাঁকে মনোমন্দিরে স্থাপন করবার বাসনা করলে সে ভগবানকে পেতে পারে। বস্তুত, গীতার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়কেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক কল্পনার প্রকারভেদমাত্র।

এই উভয় আলোচনার উপসংহারে পাওয়া গেল আত্মোপলব্ধি, যার ফলশ্রুতিতে সেই অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ। সুতরাং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের

আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতিতে যে মহাসুখ, হিন্দুধর্ম ও দর্শনে তাহাই 'আত্মানং বিদ্ধি'। আর এসবগুলিকে এক কথায় বলা যায়—অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

মহাসুখ লাভই যে বৌদ্ধ মহাযানী সহজিয়া সাধকসম্প্রদায়ের সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য একথা অনেকগুলি চর্যাপদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই মহাসুখলাভের পন্থা গুরুর নিকট থেকে জেনে নেবার উপদেশ পদকর্তারা সব সময় দিয়েছেন।

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥ ১ ॥

বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হতে মুক্ত না হলে মহাসুখ লাভ করা যায় না। সুতরাং কামনা বাসনার নিবৃত্তিই মহাসুখলাভের একমাত্র পথ। গুরুর নিকট থেকে ইহার উপায় জানতে লুইপাদ উপদেশ দিচ্ছেন।

কম্বলাম্বরপাদের একটি পদে মহাসুখ ও তাহা লাভের উপায় অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। রূপকাশ্রয়ী এই পদটি বিশ্লেষণ করলে উহার অন্তর্নিহিত সত্যটি সাধককবির অমিত কল্পনাশক্তির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ ॥
খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুখ সাঙ্গা ॥ ৮ ॥

চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ থাকে অর্থাৎ চিত্তে নির্বাণের প্রতি আসক্তি সব সময় থাকে। কিন্তু বস্তু জগতের অবিদ্যা নির্বাণ-আসক্তি দূরীভূত করে দিয়ে তার স্থান অধিকার করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। তাই সাধককে সব সময়ে অতি সাবধানতার সঙ্গে নির্বাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গুরু-উপদেশ এই পথের একমাত্র সহায়। এই উপদেশ মত চলতে পারলে নির্বাণ বা মহাসুখ লাভ করা যায়।

সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদের একটি পদে মহাসুখ লাভের উপায় রূপকের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥ ৯॥

মদমত্ত হস্তী যেমন সকল বন্ধন ছিন্ন করে কমলবনে প্রবেশ করে আর মনের আনন্দে ক্রীড়ারত হয়, কৃষ্ণাচার্যও ঠিক তেমনই জ্ঞানবলে নির্বাণ পথের বিঘ্নস্বরূপ সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে মহাসুখরূপ সহজ নলিনী বনে প্রবেশ করে নির্বিকল্প সমাধিতে মহানন্দে আছেন।

করুণা ও নির্বাণকে (তথতা ও শূন্যতা) বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় অভিন্নরূপেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং করুণা লাভই মহাসুখ লাভ। কাহ্নুপাদের একটি পদে রূপকের মাধ্যমে এই করুণালাভের পথটি অতি সুন্দররূপে বিশ্লিষ্ট হয়েছে।

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর॥
পাহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউঁ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥ ১২॥

চিত্ত অবিদ্যাসংযোগে বহু দোষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চিত্ত দোষমুক্ত হলেই স্বরূপে স্থিতিলাভ করে। স্থিতি লাভ করলেই ধর্মকায়ের স্বরূপ লাভ করে। ধর্মকায়ের সঙ্গে চিত্তের এই মিলনের ভাবটি হিন্দুদর্শনের পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের তুল্য। এই মিলনে যে 'নঅবল' লাভ হয়, তাহা অবাঙ্‌মনসগোচর মহাসুখ বা মহা আনন্দ। এই মহা আনন্দই ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ। অবিদ্যাসংযোগে চিত্তমোহাবিষ্ট হলে উহা বিষয়ে ডুবে

থাকে। এমতাবস্থায় সদ্গুরুর উপদেশ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সদ্গুরুর উপদেশে চিত্তের বিষয়ানুরক্তি দূরীভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মোহবিমুক্ত চিত্ত অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের অধিকারী হয়।

অষ্ট ঐশ্বর্য ধ্বংস হলে পর কায়-বাক্-চিত্তে করুণা ও শূন্যের মিলন সাধিত হয়। এই মিলনই মহামিলন এবং এর দ্বারা মহাসুখ বা মহা আনন্দ লাভ হয়। এই মহা আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। কাহ্নপাদের একটি পদে রূপকের মাধ্যমে ইহা আভাসিত হয়েছে।

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেডু আল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥
গন্ধপরসর জইসোঁ তই সোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো ॥
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ১৩ ॥

'অঠক মারী' আর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য ধ্বংস হলে পর 'তিশরণ ণাবীতে অর্থাৎ কায়-বাক-চিত্তে 'করুণা শূণমে হেরী' অর্থাৎ করুণা ও শূন্যের মিলন সংঘটিত হয়। এই মহামিলনে মহা আনন্দ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়।

সহজ আনন্দ অনুভূতিগ্রাহ্য ও অনুভববেদ্য! এই সহজ আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। শান্তিপাদ একটি পদে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

সঅসম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ অলক্খলক্খণ ণ জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই ॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট-সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআমোহ-সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥

সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি না বাসসি জান্তে।
এবা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট-ন-গুমাখড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ ১৫ ॥

সঅসম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ অলক্খলক্খণ ণ জাই অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলে বিষয় বাসনার লোপ পায় আর তার ফলে সহজ আনন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দের অনুভূতি জন্মে। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হওয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত। কারণ ইহা অনুভূতিগ্রাহ্য অনুভববেদ্য বলে ইহার স্বরূপ বুঝান যায় না। এমতাবস্থায় বস্তু জগতের রূপ চলে যায় এবং স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, আর তখনই অতীন্দ্রিয় আনন্দের সঞ্চার হয়। এর ফলই নির্বাণ লাভ। অবশ্য সাধারণ লোকের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ লোক বস্তু জগতের রূপেই ভুলে থাকে, বস্তু জগতের স্বরূপে যাবার কথা তারা চিন্তা করতেই পারে না। যাদের কাছে অর্থ ই সার, পরমার্থ তাদের কাছ থেকে বহুদূরে থাকে।

সহজ আনন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ কিরূপে লাভ হয় এবং তখন সাধকের মানসে কেমন ভাবের উদয় হয় কাহ্নুপাদের একটি পদে তাহা অতি সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে।

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ-লীলেঁ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী॥
তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী॥ ১৮ ॥

চিত্ত অচিত্ততায় লীন না হলে সহজ আনন্দ লাভ হয় না। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলে বিষয় বাসনার লোপ পায়। বিষয় বাসনার লোপ হলে নিরাত্মাদেবী চিত্তে অধিষ্ঠিতা হন। নিরাত্মাদেবী চিত্তে অধিষ্ঠিতা হলেই সহজ আনন্দ

চিত্তে পূর্ণ হয়ে যায়। নিরাত্মাদেবীই তো সহজ আনন্দের মূর্ত প্রতীক। এঁর দুই মূর্তি। এক মূর্তিতে তিনি অবিদ্যা, যিনি মানুষকে বিষয়ে ডুবিয়ে রেখে দেন ও বিষয়াসক্ত মানুষের যে ভোগ—সেই ভোগ তাকে দিয়ে থাকেন, অন্য মূর্তিতে তিনিই নিরাত্মাদেবী, যিনি সাধককে বিষয় বিমুখ করে সহজ আনন্দের অধিকারী করে দেন। এঁর কৃপাদৃষ্টির চাহনিতে সাধকের মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, তার অর্থ ও পরমার্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, আর তার ফলে সাধক সব সময় নিরাত্মাদেবীকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখেন।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে শূন্যবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, পুরুষ ও প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, শিব ও শক্তি—এঁরা দুই হলেও এক। নির্বিকারের বিকার মাত্র। এই বিকারই লীলা। এই লীলার স্বরূপ শুধু সাধকই গ্রহণ করতে পারেন, কারণ এর মর্ম নিহিত আছে গুহার মধ্যে। শুধু সাধনার দ্বারাই সেই গুহার মধ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে। এই শিব ও শক্তি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়। প্রজ্ঞা ও উপায়-এর অন্য নাম শূন্যতা ও করুণা। এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে যে সহজ আনন্দ লাভ হয় রূপকের মাধ্যমে ভুসুকুপাদ সেই আনন্দের কথা অতি সুন্দরভাবে একটি পদে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥
চালিঅ ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু যহজে কহেই॥
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বূঝই সো এথু বুধ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ॥ ২৭॥

শাক্ত-তন্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। জীবরূপী আত্মা মূলাধার হতে বের হয়ে ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতির গতি রোধ করে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে মস্তকে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে সাধক প্রাণারাম বা মহানন্দ

বা সচ্চিদানন্দ লাভের অধিকারী হয়। পরমাত্মা ও আত্মাই হোলো চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি ও জীব। পরমাত্মা ও আত্মাই হোলো শিব ও শক্তি, বৌদ্ধ সহজযানীদের প্রজ্ঞা ও উপায় (শূন্যতা ও করুণা)। ভুসুকুপাদ এখানে সহজ আনন্দ লাভের পথের সন্ধান দিয়েছেন। মহাসুখকে তিনি কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শূন্যতা-সূর্যের কিরণে এই মহাসুখ প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রস্ফুটিত কমলের উপর 'বতিস জোইনী' অর্থাৎ বত্রিশ নাড়ী (ললনা, রসনা, অবধূতিকা প্রভৃতি) ধারা বর্ষণ করে। ললনা, রসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে দোহা টীকাতে আছে—

ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনোপায়সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা॥ দোহাটীকা : পৃঃ ১২৪।

ধারাবর্ষণের ফলে পরিশুদ্ধ চিত্ত অবধূতি পথে উর্ধ্বে উঠে মস্তকে সহস্রার পদ্মে যেয়ে মহাসুখ বা মহা আনন্দে নিমগ্ন হয়।

সাধনায় তন্ময়তা এলে সাধক বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়। তখন সাধক অন্তর জগতের অধিবাসী হয়ে এক বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় এসে ইষ্টদেবতার সঙ্গে সাধকের মিলন ঘটে। এই মিলনে সাধকের মনে যে অপার আনন্দের উদয় হয়, তাহাই মহাসুখ বা সহজ আনন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই যে ভগবদ্‌সম্মিলন ইহাই বৈষ্ণবদর্শনের ভাব-সম্মিলন। অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মূলেই এই ভাব-সম্মিলন। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলে তবে এই তন্ময়তা আসে। রূপকের মাধ্যমে শবরপাদ একটি পদে অতি সুন্দরভাবে এই বিশেষ অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন।

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সাবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে সঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥

গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥ ২৮॥

নিরাত্মাদেবী এখানে অস্পৃশ্যা শবরীরূপে কল্পিতা হয়েছে। নিরাত্মাদেবীকে শবরী বলবার কারণ—নিরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। (তুলনীয়—নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ)। চিত্ত সাধারণতঃ বিষয়াসক্ত থাকে, কিন্তু যখন সাধক সাধনায় আত্মনিযোগ করে তখন ক্রমে তন্ময়তা আসে। বিষয়ানুরক্তি আস্তে আস্তে দূরে যায়। এর ফলে বিষযবিমুক্ত চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়, আর নিবাত্মাদেবীর সঙ্গে এই সময়ে সাধকচিত্তের মিলন ঘটে। এই মিলনেই যে মহাসুখ লাভ হয় তাহাই অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

এই পদেও তান্ত্রিক সাধনাব পন্থা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী' অর্থাৎ শবরীবালা উঁচু পাহাড়ে বাস করে। এই শববী নিরাত্মাদেবী। শাক্ততন্ত্র মতে ইনি চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি। উঁচু পাহাড হোলো নিরাত্মাদেবীর আবাসস্থল মহাসুখচক্র। শাক্ততন্ত্র মতে মস্তকের ঊর্ধ্বদেশস্থিত সহস্রার পদ্ম। এই সহস্রার পদ্মে চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির সঙ্গে জীবরূপী আত্মার মিলন ঘটলে সাধক সৎ-চিৎ-আনন্দ লাভের অধিকারী হয়। ইহাই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন বা নির্বাণলাভ। শবরপাদ এই পদে জানিয়েছেন যে, নিরাত্মা দেবী যে বাহ্যিক সাজসজ্জা ধারণ করে থাকেন তাতে সহজে তাঁকে চেনা যায় না। কিন্তু সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হলে তিনি নিজেই দয়া করে তাকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। নির্বাণের পথে সাধককে টেনে আনাই হোলো নিরাত্মাদেবীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধককে ছেড়ে তিনি যেন থাকতে পারেন না। বিষয় থেকে সাধককে টেনে আনার জন্য তাঁর যেন চেষ্টার অন্ত নেই। ঠিক এই রকম ভাবের চণ্ডীদাসের একটি পদ আছে।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥

রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকাতে এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কবির ব্যাখ্যা—

'ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টাকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।*' আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও ঠিক অনুরূপ ভাবের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে ॥ মধ্যলীলা, ১২শ পরি।

করুণার আবির্ভাবেই মহাসুখ বা মহাআনন্দ লাভ হয়। এই মহা আনন্দ লাভ হলে পর ত্রিলোকের সর্বত্র আনন্দ আছে, কোথাও নিরানন্দের স্থান নেই—এই অনুভূতি জন্মে। সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম যে সর্বব্যাপী হিন্দুদর্শনের এই ভাবটিই সহজযানী বৌদ্ধ সাধকগণ গ্রহণ করেছেন। ভুসুকুপাদের একটি পদে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট হয়েছে।

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভূআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥
জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুয়ে ণিঅ মন দে উলাল ॥

*দ্রষ্টব্য :—বৈষ্ণব পদাবলী (৫ম সং)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫৯

বিসঅ বিশুদ্ধেঁ মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥
এ তৈলোএ এত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেডই অন্ধকারা॥ ৩০॥

চিত্তে করুণার উদয় হলেই অবিদ্যা দূরে চলে যায়। অবিদ্যাব প্রভাব মুক্ত হলেই চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে যায়। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলেই করুণারূপ মহাসুখ বা আনন্দ লাভ হয়। চিত্তে মহানন্দের সঞ্চাব হলে বিশ্বময় শুধু আনন্দেরই আধিপত্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বিশ্ব ছাড়িয়ে তারপর ত্রিলোকময় ঐ আনন্দের বিস্তার অনুভব কবা যায়। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ, তার অন্ত নাই, সে আনন্দ অনন্ত। বৌদ্ধ সহজযানীরা এই অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বরূপ গ্রহণ করেছেন হিন্দুদর্শন থেকে। উপনিষদেব সচ্চিদানন্দরূপী জ্যোতির্ময় পবম ব্রহ্মেবই প্রকাশ এই করুণাতে। গীতায় এই জ্যোতির্ময় রূপেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১॥ ১২॥

আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্যেব প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভাব তুল্য হইতে পাবে।

বিশ্বরূপের এই জ্যোতির্ময় মূর্তিই হিরণ্ময় পুরুষরূপী জ্যোতির্ময় পরমব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ বচন মনের অতীত অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসগোচর এবং ইহাকেই বলা হয় অতীন্দ্রিয় আনন্দ। মহাযোগী যুগ যুগ ধরে কঠোর সাধনার বলে এই রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন লাভ করে থাকেন। এই রূপেই মহাযোগীর ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়। গীতায় ঐ আনন্দের স্বরূপও বর্ণিত হয়েছে।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ॥ ১১॥ ১৪॥

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ব্রহ্মের স্বরূপ ভক্ত যখন হৃদয়ে ধারণ করেন তখন তিনি বিস্ময়ে ডুবেই যান, আর তাঁর শরীরে আসে রোমাঞ্চ। তিনি নির্বাক হয়ে শুধু আনন্দের সাগরেই ডুবে থাকেন বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে। আর তখনই তাঁর সেই অরূপকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়,—

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

বাংলা সাহিত্যের জন্ম লগ্নে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের মানসে যে ভাবের বন্যা এসেছিল তাহাই রূপায়িত হয়েছে চর্যাপদগুলির মধ্যে। তাঁদের এই ভাবই তাঁদের ধর্ম। জ্ঞানের দ্বারা এই ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় দুঃসাধ্য, ইহা ভাবের বিষয়; অ-ভাবীর কাছে ইহার স্বরূপ ধরা পড়ে না। এই ভাব চিত্তে সঞ্চারিত হলে অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়। ইহারই আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে,—"My religion is a poet's religion. All that I feel about it is from Vision and not from Knowledge."—The Religion of Man, Chap—VI.

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চর্যাপদ'—(মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সম্পাদিত) থেকে উক্ত পদগুলির পাঠ গৃহীত হয়েছে।"

॥ ৩ ॥

॥ পরিবর্তন-যুগে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা ॥

: জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব :

প্রবাদ আছে—যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। এই প্রবাদের অর্থ —যা মহাভারতে নেই, তা ভারতবর্ষে নেই। মহাভারতে রাধার উল্লেখ কোথাও আছে বলে জানা নেই। মহাভারতে কৃষ্ণের দুই স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়—রুক্মিণী ও সত্যভামা। এ ছাড়া কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতী ও আরও ষোল হাজার স্ত্রীর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যাচ্ছে। রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, মহাবল, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু নামে দশ পুত্র হয়। অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের কন্যা। এঁর গর্ভে কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। অন্য উল্লেখনীয় স্ত্রী জাম্ববতী ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্রের জন্ম হয়। অন্য ষোল হাজার স্ত্রীর সন্তানাদির কথা জানা নেই। মহাভারতের মৌষল পর্বে পাওয়া যাচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে কৃষ্ণের সারথি দারুকের সঙ্গে অর্জুন দ্বারকায় এলেন। তাঁকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে থাকলেন। দ্বারকার নারীকুলের আকুল ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সেই মর্মভেদী ক্রন্দনের শব্দে অর্জুন ভূপতিত হলেন। রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যতমা মহিষীরা তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পীঠে বসিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী এবং বসুদেবের অন্য তিন স্ত্রী—ভদ্রা, মদিরা ও রোহিণীর, বলরাম, কৃষ্ণ ও অন্য সকলের মৃতদেহ সংকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি জীবিত সকলকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন। এর পর অর্জুন ভোজবংশীয় যাদবপ্রধান[১] কৃতবর্মার পুত্র ও সেই সঙ্গে ভোজ-নারীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর সত্যকের পুত্র ও শিনির পৌত্র সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রাখলেন। অতঃপর অবশিষ্ট বালবৃদ্ধ নারীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এনে কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে[২] তথাকার

১। যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম-অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি, কুকুর। কৃষ্ণবৃষ্ণি বংশীয়।

২। ভাগবতে উল্লিখিত আছে—ইনি কৃষ্ণের প্রপৌত্র, প্রদ্যুম্নের পৌত্র, অনিরুদ্ধের পুত্র।

সিংহাসনে বসালেন। অক্রূরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী ও জাম্ববতী—কৃষ্ণের এই পাঁচ স্ত্রী এখানে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রীসহ সত্যভামা হিমালয় পার হয়ে কলাপ গ্রামে এসে কৃষ্ণের ধ্যানে সমাহিত হলেন।

মহাভারতে রাধার নাম পাওয়া গেল না। এর পর ভাগবত নিয়ে আলোচনা করার পালা। ভাগবতেও রাধার নাম আছে বলে জানা যায় নি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহামুনি শ্রীশুক মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃষ্ণলীলা শুনাচ্ছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম দিকে কৃষ্ণলীলার পরিচয় আছে। এই লীলার বিষয় আলোচনা করলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় যে, ইহা কিশোর কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা। অবশ্য এই দশম স্কন্ধের শেষাংশে বসুদেবসুত 'শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও তাঁহার শৌর্যবীর্যের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীশুক উবাচ,

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ম স্কঃ, ২৯শ অধ্যায়ঃ।

এই উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান কৃষ্ণের রাসমণ্ডলস্থ গোপীগণের সহিত কথোপকথন এবং সেই রাসমণ্ডল হইতে শ্রীভগবানের অন্তর্ধান বর্ণনা করা হইতেছে। শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! (ইন্দ্রের দর্পহরণ করতঃ সর্ববিজয়ী মদনকেও জয় করিবার মানসে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন বিকশিত মল্লিকার শোভায় শোভিতা রজনী দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া যোগমায়াকে অবলম্বন করতঃ রমণার্থ (গোপীগণের মনোরথ পূরণার্থ) ইচ্ছা করিলেন ॥ ১ ॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিনা যথা ॥ ২৭ ॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ম স্কঃ, ৩০শ অঃ।

(ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা উপলক্ষিত কৃষ্ণের চরণের অনুসরণে কৃষ্ণকে অনুসরণ করিতে করিতে অবলাগণ অপর কোন বধূর পদচিহ্নের সহিত কৃষ্ণের চরণ মিলিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত পরস্পর বলিতে লাগিলেন। শ্লোঃ-২৬ শ্লোকঃ, শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধঃ, ৩০শ অঃ)

হে সখি! হস্তীর সহিত গমনকারিণী তাহার পত্নীর ন্যায়, স্কন্ধদেশে বিন্যস্তহস্তা, নন্দনন্দনের সহিত গমনশীলা কোন কামিনীর এই পদচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৭ ॥

হে সখি! নিশ্চয়ই এই রমণী সর্বশক্তিমান্ বিভু সর্বদুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া পাইয়াছে, নতুবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ আনন্দের সহিত ইহাকে একান্তে গ্রহণ করিবেন কেন ॥ ২৮ ॥

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্শ স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥

। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধঃ, ৩৩শ অঃ।

বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বে নিজে ক্রীড়া করে, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হরিও নিজেরই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশস্বরূপ সেই গোপীগণের সহিত এই প্রকারে আলিঙ্গন, করস্পর্শ, প্রেমনিরীক্ষণ এবং চুম্বনাদি ভাবোদ্দীপক ব্যাপারে রাসক্রীড়া করিলেন, বস্তুতঃ গোপীগণ কৃষ্ণ হইতে পৃথক নন ॥ ১৮ ॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্‌ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৯ ॥

। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ স্কঃ, ৩৩শ অঃ।

হে নৃপ (পরীক্ষিৎ)! ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব দেখুন, যদিও গোপাঙ্গনাসহ কৃষ্ণ বিহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার মায়ায় বিমুগ্ধ গোপগণ আপন আপন পত্নীকে নিজের পার্শ্বে বর্তমান মনে করিয়া লোকের কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপও করিলেন না ॥ ৩৯ ॥

সুতরাং ভাগবতকার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় যে সব গোপাঙ্গনার সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণের বিহার বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে রাধার নাম পাওয়া গেল না। কিশোর কৃষ্ণই যে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরি এবং গোপীরা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই অংশে সে পরিচয় পাওয়া গেল। হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ স্বরূপ এই গোপীগণের সঙ্গে তাঁর বিহারের সংবাদটিও তাঁর মায়ায় বিমুগ্ধ গোপগণ জানতে পারল না। সমস্যা দেখা দিল এখানে। শারদীয়া পূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রজনীতে বৃন্দাবনের গোপবধূরা স্ব স্ব স্বামীর শয্যা থেকে উঠে গেল, আর সারা রাত তারা কিশোর কৃষ্ণের সঙ্গে রাসমণ্ডলে রাসলীলা করল, কিন্তু একজন গোপও তার সংবাদ রাখল না। দুই একজনের বেলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এখানে তো দুই একজন নয়, সমস্ত বৃন্দাবনের গোপ-

সমাজের কেহই এই সংবাদ জানতে পারল না। শ্রীমদ্‌ভাগবতকার অবশ্য সুকৌশলে শ্রীভগবানের 'মায়া'—এর কথা এনেছেন।

আমরা অবশ্য 'মায়া'র কথা না বলে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিবর্তনে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকার কথাই বলব। এই বৈষ্ণবধর্মের সার্থক পরিণতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাতত্ত্ব' আলোচনায় ইহা অবতরণিকা। শ্রীমদ্‌ভাগবতকার ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রেম আস্বাদনের ইচ্ছায় প্রেমের বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অলৌকিক বৃন্দাবনে এঁরা এক হলেও লৌকিক বৃন্দাবনে মানব কল্পনাতে এঁরা পৃথক্ হয়ে আছেন। 'এক হয়েও পৃথক্'—এই তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। এক নিজেকে আস্বাদনের জন্য পৃথক্ হলেন—যার মূল কথা আনন্দরস আস্বাদন। ইহাই মানসবিহার এবং এই মানসবিহারই অতীন্দ্রিয়বাদ। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাতত্ত্বে' এই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই পরিপূর্ণতা প্রমাণের ইহাই আমাদের প্রথম প্রয়াস।

যা হোক, শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা যে সারা ভারতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে আছে। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। ভ্রমণব্যপদেশে উত্তর-ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে অল্প-স্বল্প পরিচয় থাকলেও দক্ষিণ-ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধে সেই সৌভাগ্য আসে। ঐ সময় মাদ্রাজে অখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় ঘটে। এখানে অন্যগুলি বাদ দিয়ে মহাবলীপুরম্-এর পল্লবযুগের ভাস্কর্যের বিষয়ই উল্লেখ করব। পল্লব নৃপতিগণের অন্যতম নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ) মহাবলীপুরম্-এ 'পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির' নামে প্রস্তর নির্মিত এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। উহার গাত্রে শিল্পিগণ যে সব ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখেছেন তা সত্যই মনোমুগ্ধকর। পাথর যে এমন করে পালিশ করা যায়, এমনভাবে বিনা বন্ধনে যে গাঁথা যায়, নিপুণতার সঙ্গে যে এমন করে লীলাবিলাসপরায়ণা নারী ও সুভঙ্গিমঠামে পুরুষ মূর্তি খোদাই করা যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই মন্দিরের গাত্রে 'গঙ্গাবতরণ' ও 'গোকুল বা বৃন্দাবন'-এর দৃশ্য সমধিক উল্লেখযোগ্য। গোকুলের দৃশ্যে ভাগবতের উক্ত

রাসলীলার কাহিনীটি অতি নিপুণতার সঙ্গে ক্ষোদিত হয়েছে। সুনিপুণ ভাস্করের ভাস্কর্যের গুণে মন্দির গাত্রের মূর্তিগুলি যেন প্রাণবন্ত। দর্শক তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভুলে ক্ষণেকের তরে শ্রীভগবানের রাসলীলার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবেন। তিনিও যেন তখন ভগবানের পার্শ্বচর।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষের দিকে বসুদেব সুত শ্রীকৃষ্ণের যে পরিচয় ও শৌর্য-বীর্যের বিবরণ আছে তাহা আর্ষ মহাভারতের অনুরূপ। বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-বীর্যের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশুক মহারাজ পরীক্ষিৎকে বল্‌ছেন,—

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥ ৫৩ ॥ (ঐ ১০ম স্কঃ, ৫৪ম অঃ)

হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সমাগত নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া (কুণ্ডিন নগরের রাজা) ভীষ্মক তনয়া রুক্মিণীকে নিজ ভবনে আনিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার সঃ ॥ ৩২ ॥
(ঐ. ১০ম স্কঃ, ৫৬ম অঃ)

এইরূপ শ্রবণ করিয়া সেই মহাবুদ্ধিমান্ জাম্ববান্ (ঋক্ষরাজ) নিজের দুহিতা বিবাহের যোগ্যা সুন্দরী জাম্ববতীকে ঐ মণির (স্যমন্তক মণি) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্ব সুতাং শুভাম্।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৪৩ ॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৬ম অঃ)

বিচার করিয়া এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সত্রাজিৎ (দ্বারকাবাসী জনৈক সূর্যভক্ত) আপন সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে ঐ স্যমন্তক মণিটিসহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমাস্থিতা ॥ ২০ ॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

(কালিন্দী বলিল) মহাশয়, আমি সূর্যদেবের কন্যা; সর্বোত্তম, বরদ শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইব বলিয়া পরম তপস্যা করিতেছি ॥ ২০ ॥

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাং।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥
(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

জিতেন্দ্রিয় অর্জুন নির্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ সকল কথা বলিলে, পূর্বেই কৃষ্ণ এই বিষয় জানিয়াছিলেন, পরন্তু অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া অর্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যত্ত্বৃর্ক্ষ উর্জিতে।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরম মঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

অনন্তর ভক্তগণের পরমানন্দ প্রদানপূর্বক আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ শুভলগ্নে শুভ ঋতু ও শুভ নক্ষত্রযুক্ত সময়ে কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধনবশানুগৌ।
স্বয়ম্বরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃস্বসুঃ।
প্রসহ্যহৃতবান্ কৃষ্ণোরাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

দুর্যোধনের বশবর্তী অবন্তীর অধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ ইহারা স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে অভিলাষিণী নিজ ভগিনী মিত্রবিন্দাকে নিষেধ করিল ॥ ৩০ ॥

(শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন) হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া সেই মিত্রবিন্দাকে সকল রাজগণের সমক্ষে সহসা অপহরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্লাদ্‌ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥

(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

অনন্তর ঐ কার্য দর্শনে চমৎকৃত এবং কৃষ্ণই কন্যার বর হইলেন ভাবিয়া প্রীত হইয়া রাজা কৃষ্ণকে কন্যাদান করিলেন। সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের যোগ্য ঐ কন্যাকে (অযোধ্যার অধিপতি নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতী ও সত্যা এই দুই নামেই প্রসিদ্ধা একটি কন্যা) যথাবিধি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃস্বসুঃ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সন্তর্দনাদি ভ্রাতৃগণ প্রদত্তা কৈকেয়দেশীয় পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সুতাঞ্চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥ ৫৭ ॥

(ঐ, ১০ম স্কঃ, ৫৮ম অঃ)

গরুড় যেমন অসুরগণের মধ্য হইতে সুধা হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বরসভায় শুভলক্ষণযুক্তা মদ্রাধিপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে একাকীই অপহরণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ৫৮ ॥

(ঐ, ১০ম স্ক, ৫৮ম অঃ)

হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)! জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে আহৃত সুন্দরনয়না এইরূপ আরও সহস্র সহস্র রমণী শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

সুতরাং ভাগবতেও রাধার নাম পাওয়া গেল না। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের এবং অন্যান্য পবিচয়ের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষাংশের মিল আছে। দশম স্কন্ধের প্রথমাংশে বর্ণিত কিশোর কৃষ্ণের রাসলীলার বিন্দুবিসর্গও মহাভারতে নেই। তবুও এস্থলে উল্লেখনীয় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও রাধার উল্লেখ নেই। দশম স্কন্ধের রাসলীলা নিয়ে এর আগে অনেক বিদগ্ধ সুধী আলোচনা করেছেন, তাই দশম স্কন্ধ থেকে বিশেষ বিশেষ শ্লোক উদ্ধৃত করে দিয়েছি।

এর পর আমরা 'রাধা' নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব ধর্ম, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হব। সেই আলোচনায় আমরা প্রমাণ করব যে, 'রাধা' নামটি, রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার বাঙালীর সাধনার অপূর্ব অবদান। আর সেই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বের ভক্তসাধক কবি জয়দেব গোস্বামী।

মহাভারতের কৃষ্ণ চক্রধারী। তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে পাওয়া যাচ্ছে—পাণ্ডবেরা বনবাসে চলে গেলে অশ্বত্থমা দ্বারকায় যেয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তার ব্রহ্মশির অস্ত্রের বিনিময়ে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র নিতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিতে চান নি, কিন্তু তাকে বিমুখ না করে তাঁর চক্র ধনু শক্তি বা গদা, এর যা তার ইচ্ছা তাই তাকে দিতে

চেয়েছিলেন। অশ্বত্থমা সুদর্শন চক্র নিতে গিয়ে দুহাতে ধরেও চক্র তুলতে পারেনি। সুতরাং মহাভারতের এই চক্রধারী কৃষ্ণ কিভাবে বংশীধারী কৃষ্ণে রূপান্তরিত হলেন তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভক্তকবি জয়দেব স্বীয় সাধনার দ্বারা মহাভারতের চক্রধারী কৃষ্ণের হাতের চক্র সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে বংশী তুলে দিয়েছেন। সাধনার শক্তিবলে শ্রীজয়দেব গোস্বামী এমনভাবে চক্রধারীকে বংশীধারী করলেন যে, সারা ভারত সেই বংশীধারীর বংশীরবে সম্মোহিত হয়ে গেল। সেই সম্মোহন শক্তির প্রভাব এত প্রবল যে, আজিও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবাসী সেই বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'নিদ্রিত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের ক্ষীণকণ্ঠ শ্রীজয়দেবের সাধনার বজ্রধ্বনিতে ডুবে যাচ্ছে।

শ্রীজয়দেব গোস্বামীই 'গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'-এর প্রবর্তক। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, এই 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' প্রাচীন বৈদিক 'বৈষ্ণব ধর্ম'-এর পূর্ণ পরিণত রূপ। শ্রীরাধা বিষ্ণুর কমলা না হলেও তিনি স্বয়ং যে কমলিনী, এ সত্য আজ বৈষ্ণবভক্তের কাছে পরিপূর্ণরূপে সত্য। ধর্মমলয়ের স্পর্শে এই কমলিনীর পাপড়িগুলি অল্পে অল্পে মেলে গিয়েছে, আর তার সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভক্তমধুকর তার মধ্যে উড়ে উড়ে মধুপানে মত্ত হয়ে আছে। শ্রীরাধার এই কমলিনী রূপের আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে রাধা কমল না হইতে পারেন, কিন্তু কমলিনী বটেন।' —শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে।

পৃঃ ১২৬॥

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' যে প্রাচীন 'বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম'-এর পরিণত রূপ একথা পূর্ব অনুচ্ছেদে উক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক ধর্ম। ঋগ্‌বেদ-এর অনেক শ্লোকে বিষ্ণুর নাম পাওয়া যাচ্ছে। আবার বিষ্ণুকে উরুক্রম, পৃশ্নিগর্ভ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত আছে: 'ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং'—১।২২।১৭। সুতরাং বিষ্ণু যে স্বর্গ, মর্ত ও মহাব্যোম পরিব্যাপ্ত করে আছেন অর্থাৎ তিনি যে সর্বব্যাপী, অনন্ত—এর সম্যক পরিচয় পাওয়া গেল। আবার—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নয়ো দেব যবো মদন্তি ॥
উরুক্রমস্য স-হি বন্ধু রিথা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বা উতে ॥
তাবাং বাস্তূ ন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অযাসঃ ॥
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি ॥
(ঋগ্‌বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৪ সূক্ত, ৫।৬ ঋক্)

বিষ্ণুর পরম পদ মধুর উৎপত্তি স্থান। তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। সেই উরুক্রম উরুগায় বিষ্ণুর আনন্দলোক ভূরিশৃঙ্গ গোরুতে পরিপূর্ণ।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুর রসমূর্তি বা আনন্দময় স্বরূপেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, ঋষিরা সেই মহাবিষ্ণুকে তাহাদের প্রিয় বন্ধুরূপেও উপাসনা করতেন। এই বৈদিক যুগেও ঋষিরা ধ্যানে গোপাল পরিবৃত মহাবিষ্ণুকে দর্শন করেছিলেন। সুতরাং রসময় কৃষ্ণের মহাবিষ্ণুরূপ রসমূর্তি সেই ঋগ্‌বেদের যুগেও আর্য ঋষিরা দর্শন করেছিলেন। অতএব বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাসলীলার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ঋগ্‌বেদে। আবার বৈদিক যুগের ঋষিগণ বিষ্ণুকে তাঁদের বন্ধুরূপেও উপাসনা করেছেন। পরবর্তী কালে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনে যে দাস্যভাবের উপাসনার পরিচয় পেয়েছি তার উৎস এই ঋগ্‌বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বসুদেব-দেবকী-তনয় কৃষ্ণের কথা উল্লিখিত আছে। বৈদিক যুগের বৈষ্ণব ধর্মের দুইটি ধারার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। এই দুইটি ধারা—বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র। বৈখানস ধারার প্রবর্তক স্বয়ং বিখনস বা ব্রহ্মা, আর পাঞ্চরাত্র ধারার প্রবর্তক স্বয়ং নারদ। নারদ আবার ব্রহ্মার নিকট থেকে বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে 'নারদ-সংগ্রহ' বা 'নারদ-পাঞ্চরাত্র' নামে যে গ্রন্থখানি পাওয়া যায় তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। হয় এই গ্রন্থখানিতে সাত নকলে আসল পরিবর্তন হয়েছে, না হয় এখানি অর্বাচীন কালে প্রণীত। কারণ উপনিষদের যুগে রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ-এর কথা কোন গ্রন্থে আছে বলে আমাদের জানা নেই। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তাঁকে মহেশ্বর, পরম দেবতা আখ্যায় আখ্যাত করেছেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।—৬।৭

সুতরাং ঋগ্‌বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত-এ রাধার উল্লেখ পাওয়া গেল না। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়,

মহাভারতে কৃষ্ণের যে বিরাট ভূমিকা আছে তার মধ্যে রাধার নাম গন্ধও নেই। অথচ পরবর্তী কালের পুরাণ, তন্ত্র, সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং নানা স্থানে প্রচলিত নানা কথার সূত্র ধরে কেহ কেহ রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনত্ব প্রমাণে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন। এর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তাতে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নানা স্থানের মন্দিরে বা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ পূর্বোক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের কৃষ্ণলীলা তাঁরা রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতা ও গোপাল তাপনীতে রাধার নাম নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত ব্রহ্মসংহিতার মন্ত্র বিচারে গোপী শব্দের উল্লেখ আছে শুধু, কোন নাম নাই। আবার গোপাল তাপনীতে এক গোপীর নাম গান্ধর্বী বলে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই গান্ধর্বীকে রাধা বলে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, কিন্তু তাতে রাধার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, রাধাতন্ত্রের রাধাকৃষ্ণলীলার কথা আমরা ধরছি না, কারণ আমাদের মতে এগুলি অতি অর্বাচীন কালের গ্রন্থ। আর মহাপ্রভু এবং ষড় গোস্বামী যে জয়দেবের পরবর্তী, একথা উল্লেখ না করলেও চলে।

অনেকের ধারণা, দাক্ষিণাত্যে বহু পূর্বেই নাকি রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ জনসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সূত্রে তাঁরা আচার্য নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলায় রাজা লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর জয়দেব ছিলেন তাঁর সভাকবি। জয়দেবের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিশ্চয় রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁকে তাঁর সভাকবি করেছিলেন। যদি তাই হয়, তবে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে নিশ্চয় মহাকবি জয়দেবের খ্যাতি অন্ততঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই জন্য জয়দেবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পবনদূতের লেখক ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি ধর, বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির। দাক্ষিণাত্য থেকে আচার্য নিম্বার্ক এসে তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছিলেন— একথা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আর একথা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রমাণিত হবে —জয়দেবের রাধাতত্ত্ব আচার্য নিম্বার্কই দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের আচার্য রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজারী ছিলেন। তাঁর পর আচার্য নিম্বার্ক দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণের পূজা প্রবর্তন করেন, ইহাই আমরা

প্রমাণ করতে চাই। একথা প্রমাণিত হলে দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারের সমস্ত সংশয়ের নিরসন হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, 'রাধা' নামটি রাধাবাদ বা রাধাতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার বাঙালীর সাধনার অপূর্ব অবদান। আর সেই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বের ভক্তসাধক কবি জয়দেব গোস্বামী। 'রাধা' নামটি তাঁর সাধনালব্ধ। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র যেমন বোধি লাভ করেছিলেন, বাঙালী সাধক জয়দেব তেমনি আরাধনার দ্বারা 'রাধা' নাম, রাধাতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আর রাধাকৃষ্ণলীলা—যা তাঁর উপলব্ধির ফল—প্রচার করেছেন তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে। তাই বাঙালী জয়দেবের কাছ থেকে রাধামধু সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের ভক্তসাধক-সুধীসমাজ। জয়দেবের সাধনা, জয়দেবের কবিপ্রতিভা যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমাদের মনে হয় ঠিক সেই সময় আচার্য নিম্বার্ক তাঁর কাছ থেকে এই রাধাকৃষ্ণভজনপূজনপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ দেশে রাধাকৃষ্ণের পূজা প্রচার করেন। সুতরাং রাধার প্রাচীনত্ব নিয়ে কথার বাগাড়ম্বর না করে রাধাতত্ত্ব বা রাধাবাদ বাঙালীর বিশিষ্ট অবদান বলে গ্রহণ করাই সমীচীন।

জয়দেবের রাধাকৃষ্ণলীলাই যে আচার্য নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন, এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে আমাদিগকে আচার্যের কাল নির্ণয় করতে হবে। এই কাল নির্ণয়ে আমরা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন-এর Indian Philosophy—Vol 11 থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। ডঃ রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন :

"Ramanuj was born in Sriperumbudur in the year A. D.1027··· Ramanuj wrote Vedantasara, Vedantasamgraha and Vedantadipa and composed his great commentaries on the Brahma Sutra and the Bhagavatgita. The learned among the Vaisnavas gave their approval to Ramanuja's exposition of Brahma Sutra, and it became the commentary (Sribhasya) for the Vaisnavas. Ramanuja toured round south India, restored many Vaisnava temples and converted large numbers to Vaisnavism"—p.665-66.

আচার্য রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজারী ছিলেন। সারা দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে তিনি নানা স্থানে বহু বিষ্ণুমন্দির সংস্কার করেছিলেন এবং বহু লোককে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। আচার্য নিম্বার্ক পরম

বৈষ্ণব ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারও করেছিলেন তিনি। জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দে যে রাধাকৃষ্ণলীলা লিখেছেন, সেই রাধাকৃষ্ণলীলার রাধাই ছিল তাঁর সাধনার ধন, আরাধনালব্ধ ফল। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাই আচার্য নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন। আচার্য নিম্বার্ক আচার্য রামানুজের অনেক পরবর্তী এবং আচার্য মাধবের ঠিক পূর্ববর্তী। শ্রীজয়দেব যখন ভারতবিখ্যাত সাধক কবি, সেই সময় আচার্য মাধব (১১৯৯ খ্রীঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে সাধক কবি জয়দেবের কবিপ্রতিভা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ তাঁহার নূতন সাধনার ধারা ভারতের তদানীন্তন আচার্যগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তারই ফলে জয়দেবের মধুর ভাবের সাধনা—যাকে পূর্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়েছে—সারা ভারতে প্রচার লাভ করেছিল। আচার্য নিম্বার্কই জয়দেবের কাছ থেকে এই সাধনা গ্রহণ করে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন।

এখানে আচার্য নিম্বার্ক ও আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনা করা প্রয়োজন ; কারণ এই দুই আচার্যের জীবনী আলোচনা করলে অনায়াসেই ধারণা করা যাবে যে, আচার্য নিম্বার্ক জয়দেবের গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং তাঁরই সাধনা তিনি তাঁর দেশ দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন। এখানে দাক্ষিণাত্যের আলবারগণেরও নাম উল্লেখনীয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমদভাগবতের কৃষ্ণলীলাই প্রচার করেছেন মাত্র, তার বেশী কিছু তাঁরা করেছেন বলে জানা যায় নি। যা হোক, আচার্য নিম্বার্কের জীবনী সম্বন্ধেও ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর Indian Philosophy, Vol. 11-তে লিখেছেন,

'Nimbarka was a Telegu Brahmin of the Vaishnava faith who lived sometime after Ramanuja and prior to Madhava, about the eleventh century A.D.'—p. 751. ······ 'The Vaishnavism of South India did not pay much attention to the glorification of the Vrindavana lila, though some of the Alvaras refer to Krishna's sports with the Gopis. In the north, however, the case was different In Nimbarka, Radha, the beloved mistress, is not simply the chief of the gopis but is the eternal consort of Krishna The writings of Joydeva, the author of Gitagovinda, Vidyapati, Umapati and Chandidas (14th century), show the growing influence of Radha-Krishna cult in Bengal and Bihar, thanks to

the influence of the Sakta system of thought and practice. Trained in such an atmosphere, Chaitanya, the great Vaishnava teacher (15th century), was attracted by the account of Krishna in the Visnu Purana, Harivamsa, the Bhagabata and the Brahmavaivarta Puranas and by his personality and character gave a new form to the Vaisnava faith.' p 760-61.

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব সারা ভারতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং অনায়াসে ধরে নিতে পারা যায় যে আচার্য রামানুজের সময় পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতের আলবারগণও এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে যে গোপীর লীলার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ঐ গোপীর কথাই আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের উক্ত উদ্ধৃতি হতে জানা গেল যে, আচার্য রামানুজের (১১শ শতাব্দী) পরে এবং আচার্য মাধবের ঠিক পূর্বে নিম্বার্ক আবির্ভূত হন। এখন আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, আচার্য নিম্বার্ক কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণন আচার্য মাধবের জীবনীও আলোচনা করেছেন তাঁর উক্ত Indian Phlosophy, Vol. II. গ্রন্থে। আচার্য মাধবের জীবনী আলোচনায় তিনি লিখেছেন,

"Madhva, also known as Purnaprajna and Anandatirtha, was born in the year 1199 in a village near Udipi, of the South Canara district. He became early vary proficient in the Vedic learning and soon became a sannyasin. He spent several years in prayer and meditation, study and discussion He developed his dualistic philosophy in discussions with his preceptor Achutapreksa, an adharent of Samkara's school. He proclaimed the supreme godhead of Visnu and admitted the validity of branding one's shoulders with the arms of Visnu, a practice accepted by Ramanuja He made many converts to his faith in different parts of the country, founded a temple for Krishna at Udipi, and made it the rallying centre for all his followers. Prohibition of bloodshed, in connection with sacrifices, is a salutary reform for which he is responsible. He died at the age of seventy nine. —page 738.

আচার্য নিম্বার্ক আচার্য মাধবের ঠিক পূর্ববর্তী হলে নিম্বার্ক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারা যায়। রাজা লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ সময়ে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কবিপ্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর সভাকবির আসন দিয়েছিলেন। ইহা হতে অনায়াসে বলা যায় যে, এই সময় আচার্য নিম্বার্কের সঙ্গে শ্রীজয়দেবের মিলন হয়েছিল এবং যার ফলে আচার্য নিম্বার্ক জয়দেবের রাধাতত্ত্ব গ্রহণ করে দক্ষিণাপথে প্রচার করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মসংহিতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানির বহুল প্রচলন দেখেছেন মহাপ্রভু। গ্রন্থ দুইখানি মহারত্ন মনে করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নকল করে আনেন। এই 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর দুটি পাঠ পাওয়া গেছে। একটি দাক্ষিণাত্যের, অপরটি বঙ্গদেশের। দাক্ষিণাত্যের যে পাঠটি পাওয়া গেছে, তার প্রামাণিকতার উপর পণ্ডিতেরা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা দেশের পাঠটির একটি সংস্করণ—যার মধ্যে মাত্র ১১২টি শ্লোক আছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাঃ সুশীল কুমার দে প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশের এই সংস্করণের ১১২টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র দুটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে। এই শ্লোক দুটি ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রাচীনত্ব আলোচনার পূর্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্তি ও দাক্ষিণাত্যের কর্ণামৃতের জনপ্রিয়তার আলোচনা প্রয়োজন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী দোলপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি ৬ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান এবং বৃন্দাবনে তদীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করবার জন্য ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন এসেছিল। ভ্রমণ শেষে জীবনের শেষ ১৮ বৎসর মহাপ্রভু পুরীধামে অবস্থিতি করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু একদা মাধবপুরীর শিষ্য রঙ্গপুরীর নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহে পাঁচ-সাত দিন অবাস্থিতিকালে—

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্ম স্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে কহেন নবদ্বীপ নাম॥

শ্রীমাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী ॥
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করে সন্ন্যাসী ভোজনে ॥
তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি (মৃত) হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥
প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্বাশ্রমের পিতা ॥
এই মতে দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥
দিন চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন ॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্না-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥
॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ ॥

এই পংক্তি-নিচয় থেকে আমরা কতকগুলি তথ্য পেতে পারি। প্রথম—সেই দূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই দাক্ষিণাত্যের মাধবপুরীর শিষ্য রঙ্গপুরী বাংলার জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্ট পরিতোষসহকারে ভোজন করেছিলেন। দ্বিতীয়—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বাদ দিলেও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডুপুর তীর্থে দেহরক্ষা করেন। তৃতীয়—দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণসমাজ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ—দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণসমাজে ব্রহ্মসংহিতা ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর প্রচলন ছিল। পঞ্চম-মহাপ্রভু মহারত্ন মনে করে এই দুই মহাগ্রন্থ নকল করে এনেছিলেন।

সেই দূর অতীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার যে যোগসূত্র ছিল, বাংলার নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দাক্ষিণাত্যের রঙ্গপুরীর আতিথ্য গ্রহণ থেকে সেটা অনায়াসেই ধারণা করা যেতে পারে। আর এই জন্যে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, বীরভূমে কেন্দুবিল্বে অজয়ের তীরে শ্রীজয়দেবের কাব্যবীণার তারে যে ঝঙ্কার অনুরণিত হয়েছিল, তার সম্মোহিনী শক্তিতে আচার্য নিম্বার্ক আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁর রাধাতত্ত্ব অনুধাবন করে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেছিলেন। আচার্য নিম্বার্কের পরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' রচিত হয়—একথা আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি। তা ছাড়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। বিভিন্ন পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর রচনাকাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণকর্ণামৃতের বঙ্গদেশের সংস্করণের যে দুটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে তার প্রাচীনত্বের আলোচনা করব। কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আমাদের উল্লিখিত উক্ত কৃষ্ণকর্ণামৃতের যে দুটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের দুটি শ্লোকের তুলনা করলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব অনায়াসে ধরা পড়বে। প্রথম শ্লোক—

তেজসেহস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ শায়িনে শেষশায়িনে॥ ৭৬॥

যিনি ধেনুপালক এবং লোকপালক, যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত অবস্থায় আছেন, আবার যিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন—সেই তোজোরূপকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে আছে—
পদ্মাপয়োধরতটী পরিরম্ভলগ্ন—
কাশ্মীর মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গ খেদ—
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ১ ॥ ২৬ ॥

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার (রাধার) স্তনতটের কুঙ্কুম লাগিয়া যাঁহার বক্ষদেশ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, মদনসন্তাপ জন্য ঘর্মবিন্দুশোভিত এইরূপ কুঙ্কুম-চিহ্নচ্ছলে যাহার অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্ধন করুন। ১ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার জানাতে গিয়ে সেই তেজোরূপের মহিমা বর্ণনার উপমা প্রসঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের 'পদ্মাপয়োধরতটী পরিরম্ভলগ্ন—কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য'—এই শ্লোকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পরবর্তী, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। আবার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচনাকাল নিয়েও মতভেদ ঘটেছে। সুতরাং তিনি যে কবি-শিরোমণি শ্রীজয়দেবের পরবর্তী, একথা আমরা বলবই।

এক্ষণে আমরা অপর শ্লোকটির আলোচনা করব।
যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যে বা ভাবিত বেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬ ॥

তোমার যে সমস্ত চরিতামৃত ধন্যাত্মগণের অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের রসনাদ্বারা লেহনযোগ্য, রাধাকে অবরোধ করিতে উন্মুখ তোমার সমস্ত শৈশবচাপল্য তোমার কমলাননে ভাবিত বেণুগীতগতিসমূহের লীলা, সে সমস্ত ধারবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকুক।

শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে আছে—

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোল মৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্—
গীতিস্থান কৃতাবধান ললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং
কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ॥ ৩॥১৬॥

গ্রীবা বাঁকাইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুণ্ডল দোলাইয়া, মোহন বংশীরবে গোপাঙ্গনাগণকে অন্যমনা করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে রাধার মধুর মুখচন্দ্রোপরি মুগ্ধ মধুসূদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হয়, সেই তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। ৩॥১৬॥

কৃষ্ণপ্রেমে মজ্জমান কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি শ্রীজয়দেবের রাধাকৃষ্ণলীলায় যে কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পরিচয় মিলছে শ্রীগীতগোবিন্দের উপরিউক্ত শ্লোকের 'সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু'—এই অংশে। এ ছাড়া শ্রীগীতগোবিন্দের ১॥২৬ শ্লোকে শ্রীজয়দেব যেখানে বললেন, 'সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন', কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি প্রায় একই ভাবে একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'সেই তেজোরূপকে নমস্কার।' আবার শ্রীগীতগোবিন্দের ৩॥১৬ শ্লোকে শ্রীজয়দেব যেখানে বললেন, 'সেই তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন', 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি একটু অন্যভাবে বললেন, 'সে সমস্ত ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকুক।' যুক্তিসম্মত যে কোন ভাবে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কৃষ্ণকর্ণামৃতের কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীগীতগোবিন্দের ভক্ত সাধক কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের ছাপ বিদ্যমান।

আজ ভারতের তথা বাংলার ঐতিহাসিকদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতি এই অংশের ইতিহাস রচনা করে ধর্মপিপাসু মানবের উপকার করে শ্রদ্ধালাভ করুন। এ ছাড়াও বাঙালী বিভিন্ন সময়ে যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে পদক্ষেপ করেছে, তারও একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব আজ তাঁদের উপর পড়েছে। আমরা আশা রাখি যে, তাঁরা নিশ্চয় এই সমস্ত কাজে অগ্রসর হয়ে দেশের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আজ একথা না বলে পারি না।

কৃষ্ণকর্ণামৃতে যেমন রাধার উল্লেখ পাওয়া গেছে, ঠিক সেইরূপ আরও দুই চারিখানি গ্রন্থে রাধার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নাম করতে পারি প্রথমতঃ হাল-সাতবাহনের প্রাকৃত গানের সঙ্কলন গ্রন্থ 'গাহা-সত্তসঈ'। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করতেন। কাব্যরসিক ছিলেন তিনি এবং এজন্য প্রাকৃত কবিগণের প্রেমের কবিতার এক সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ গভীর সংশয় প্রকাশ করছেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এমন একটা সময় ছিল যখন বহু কবি কবিযশঃ প্রার্থী ছিলেন না। তাঁরা কবিতা রচনা করে বহু পূর্ববর্তী কোন কবির নামে অনায়াসে চালিয়ে দিতেন। আজ আমরা একথা ধারণা করতে পারি না, কারণ দিন এখন এমনভাবে পালটিয়েছে যে, স্মরণ করলেও আমরা শিউরে উঠি। আগে যা ছিল, এখন ঠিক তার বিপরীত ভাব এসেছে কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাছাড়া একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে একটা 'রাধা' নাম একটি গ্রন্থের একটা বা দুটা স্থানে আসে কিভাবে। বেশি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমরা প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে চাই না, কিন্তু দ্বাদশ শতকের গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সংস্কার করবার জন্য কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ভট্টনারায়ণের 'বেণী-সংহার' ও নবম শতকের আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'-এর উল্লেখ না করে পারছি না। বেণী-সংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে আছে,—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে—
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ং প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

আবার ধ্বন্যালোকে আছে—

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীল ত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

মথুরা প্রবাসকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁর সুহৃদ অক্রুর বৃন্দাবনের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখেই আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন,—'ভদ্র,

সেই গোপবধূদের বিলাসসুহৃদ রাধার সাক্ষী কালিন্দী তীরের লতামণ্ডপগুলির সংবাদ ভাল ত? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না হইলেও খুব সম্ভব এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ ও বিবর্ণ হইতেছে।'

এক্ষণে আমরা ভট্টনারায়ণের উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করব। কবি ভট্টনারায়ণের উক্ত শ্লোকটি আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলে কি ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বের কবি? কবি ভট্টনারায়ণকে আদিশূর এনেছিলেন কান্যকুব্জ থেকে—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ভি. এ. স্মিথ তাঁর বিখ্যাত Oxford History of India—Part I গ্রন্থে আদিশূরের সম্বন্ধে লিখেছেন,—

'Bengal tradition has much to say about a king named Adisura, who ruled at Gaur or Lakshmanavati and sought to revive the Brahmanical religion which had suffered from Buddhist predominance. He is believed to have imported five Brahmans from Kanauj, who taught orthodox Hinduism and became the ancestors of the Radhiya and Varendra Brahmans. His date may be placed in or after A. D. 700.'—p. 185.'

স্মিথ সাহেবের ঐ বিবরণ থেকে কোন সম্ভাব্য ঐতিহাসিক সত্যে উপস্থিত হতে পারা যায় না। বাঙলায় পাল রাজাদের পর এবং প্রথম দিক্‌কার কোন সেন রাজার সমকালে আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। সুতরাং তিনি দ্বাদশ শতকের রাজা। এমত অবস্থায় আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে তাঁর উক্ত শ্লোকটি কি করে স্থান পেল—এ এক আশ্চর্য রহস্য। আবার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal—Vol I. গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের দশম ও একাদশ শতকের কাব্য-অংশে পাওয়া যাচ্ছে,—

"A Bengal tradition of doubtful value, again, would credit Bhatta Narayana, author of the Veni-Samhara, to Bengal; for he is alleged to be one of the five Kanauj Brahmans brought to Bengal by Adisura.'—p 306."

সুতরাং এই বিবরণ থেকেও কোন ঐতিহাসিক সত্যে উপস্থিত হতে পারা যাবে না। আমাদের মনে হয় এবং সত্য বলেই ধারণা, ভট্টনারায়ণ দ্বাদশ শতকের কবি এবং তিনি জয়দেবের সমসাময়িক। আর জয়দেবের প্রভাবে তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আলঙ্কারিক বামনের অলঙ্কার গ্রন্থে

উক্ত শ্লোকটি অনেক পরে কোন এক শুভমুহূর্তে সংযোজিত হয়েছে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।

আনন্দবর্ধন-এর প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ ধ্বন্যালোক-এ উক্ত শ্লোকটিও পরবর্তী কালের সংযোজন। ঊনবিংশ শতকের পূর্বে অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার আগে এমন ভাবে আরও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক আধটি পদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের ইতিহাস গবেষকের গবেষণার বিষয়। এই বিষয়ের গবেষণা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, ঠিক যেমন ভাবে আর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলি মিশে একাকার হয়ে গেছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ঢেলে সাজা হয়েছে—ঠিক তেমনভাবে উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের মূলে পুঁথি লেখকদের কবিসুলভ মনোভাব ক্রিয়াশীল। সেই রহস্য নিরসনে প্রবৃত্ত না হয়ে ঐ কাজের ভার বিদগ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং ঐতিহাসিকদের উপর দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আসি।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'মহাভারতের চক্রধারী কৃষ্ণের রূপ পরিবর্তন।' ঋষি কবি ব্যাসের মহাভারত থেকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাল পর্যন্ত যে সময়টা ছিল, এই সময়ের মধ্যে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তির স্থানে এসেছে তাঁর ঐশ্বর্যভাবমণ্ডিত রূপ। যিনি একদিন ছিলেন 'শত্রুনিসূদন', তিনি হলেন 'গোপীজনবল্লভ'। এইরূপ পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

> আজি হতে শতবর্ষ পরে
> এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
> তোমাদের ঘরে।

এমনই হয়। আর হয় বলে আজ বাল্মীকি, হোমার, শেক্সপীয়র প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় কবিদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন কোন সন্দিগ্ধ মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে।

মহাভারতের মধ্যে ঋষি-কবি ব্যাস অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে চক্রধারী কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তির সঙ্গে তাঁর অতি মানবীয় ভাবগুলির কথাই আমাদের মনে পড়ে। সেই অতি মানবীয় ভাবগুলির পরিচয় মহাভারতের সর্বত্র আছে।

তার পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে আর এক মহাভারত তৈরী হবে। আমরা সবগুলির পরিচয় না দিয়ে কয়েকটির উল্লেখ করে ঋষি কবির অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় দেব।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখতে পাওয়া যায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করছিলেন, তখন তিনি কাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে পারেন জানতে চেয়েছিলেন ভীষ্মের নিকটে। ভীষ্ম তার উত্তরে বলেছিলেন,—

অসূর্যমিব সূর্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥

—সূর্য যেমন অন্ধকারময় স্থান উদ্ভাসিত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত করিয়াছেন।

তখন ভীষ্মের উপদেশে সেই যজ্ঞসভামধ্যে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবিধি দান করলেন এবং কৃষ্ণও সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। এর ফলে চেদিরাজ দুষ্ট শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা আরম্ভ করল সেই সভামধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসার পুত্র হয়েও শিশুপাল বহুপূর্ব হতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরমাত্মীয়দের প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করেছে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর দ্বারকা দগ্ধ করেছে, শ্রীকৃষ্ণ সে সব সহ্য করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিলে পর শিশুপাল যেভাবে কৃষ্ণনিন্দা আরম্ভ করল তাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই নিন্দা সহ্য করা আর সম্ভব হল না। তার ফলে তিনি সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। আর সেই মুহূর্তে সভার সকলে দেখতে পেল, সূর্যের ন্যায় একটি উজ্জ্বল তেজ শিশুপালের দেহ থেকে বেরিয়ে এল ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর দেহে প্রবেশ করল।

মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বে আছে কৌরবসভায় পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন দুর্যোধন কোন প্রকারে তাঁর সেই সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। বরং কৃষ্ণ যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে বলেছিলেন,—

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

—কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েদিলেন কুলরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। দুর্যোধন সেই সংবাদ জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করে রাখবার চক্রান্ত করেছিল। এরপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধির কথা জানতে পেরে তাকে রাজসভাতে ডেকে তিরস্কার করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই সভায় সকলের সমক্ষে এক পরমরূপ ধারণ করলেন। সহসা তাঁর লালটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি, বলরাম ও পঞ্চপাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়ুধ উদ্যত করে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শার্ঙ্গধনু প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্ত্রও উপস্থিত হল। সহস্রচরণ সহস্রবাহু সহস্রনয়ন কৃষ্ণের ঘোর মূর্তি দেখে সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা চেয়ে রইলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে।' এর পর কৃষ্ণ পূর্বরূপ গ্রহণ করলেন।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অর্জুন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যগণকে দেখবার জন্য তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে তাঁর রথ রাখতে অনুরোধ জানালেন। তখন অচ্যুত দুই সেনার মধ্যে অর্জুনের রথ স্থাপন করলে পর দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য-মাতুল-শ্বশুর-ভ্রাতা-পুত্র ও সুহৃদগণকে দেখে অর্জুন বিষাদক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং হৃষীকেশকে জানালেন যুদ্ধে ঐ সব আত্মীয়কে বিনাশ না করে নিরস্ত্র অবস্থায় ধার্তরাষ্ট্রগণ কর্তৃক নিহত হওয়াও তাঁর পক্ষে শ্রেয়। এর পর বিষাদগ্রস্ত অর্জুন আপনার রথের মধ্যে বসে পড়লেন। বিষাদক্লিষ্ট অর্জুনকে হৃষীকেশ অনেক বুঝালেন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে বললেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ ২ ॥ অঃ ॥ গীতা
অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥ ২ অঃ ॥ ঐ
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ ঐ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥ ঐ

—দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। যাঁহার দ্বারা এই বিরাট বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে; কেহই এই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। আত্মা কদাচ জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার জন্মাইবেন না—ইহাও নহে; আত্মা জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীব হত হইলে এই আত্মা হত হন না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নব শরীর গ্রহণ করেন।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥ ২ অঃ ॥ গীতা
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ ঐ
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ ঐ
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥ ঐ
অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ ঐ
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ঐ
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥ ঐ

—যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে এবং মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না। হে ভারত, জীবসকল আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিত কালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর) অব্যক্ত, তবে কি জন্য তোমার এই প্রকার বিষাদ। অপর পক্ষে, তোমার স্বধর্ম বিচার করিয়াও তুমি বিকম্পিত হইতে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই।

উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়গণই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারাইয়া তুমি পাপগ্রস্ত হইবে। যদি যুদ্ধে তুমি নিহত হও তবে স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি তুমি জয়ী হও তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর। সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও, এইরূপ করিলে তুমি পাপগ্রস্ত হইবে না।

হৃষীকেশ অর্জুনকে পরমার্থ বিষয়ে বহু উপদেশ দিলেন। তিনিই যে সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের কর্তা, তিনিই যে বিরাট পুরুষ—সে কথা অর্জুনকে জানালেন। তখন অর্জুন তাঁর বিরাট রূপ, তাঁর অব্যক্ত স্বরূপ, তাঁর পরম বিশ্বাতীত—বিশ্বব্যাপক বিশ্বকারণরূপও দেখাতে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥ ১১শ অঃ ॥ গীতা

—হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষু দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এজন্য তোমাকে দিবচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দর্শন কর।

এক্ষণে 'অনেন স্বচক্ষুষা এবতু' অর্থাৎ এই তোমার নিজ চক্ষুদ্বারা এবং 'তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি' অর্থাৎ তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'স্বচক্ষু' অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষু। এই চক্ষুতে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্র দৃষ্ট হয়। পূর্বে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, যদি ভগবান্ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার যোগ্য মনে করেন—তবে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাতে পারেন (গীতা, ১১শ অঃ, ৪ শ্লোক)। এখানে ভগবান্ বললেন যে, প্রাকৃত চক্ষে কেহ তাঁর সেই বিশ্বরূপ দেখতে পারে না এবং সেই জন্য তার 'দিব্যচক্ষু' প্রয়োজন। অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দেখবার যোগ্য না হলেও ভগবান্ তখন তাঁকে কৃপা করে দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশ্বরূপ দেখালেন। 'দিব্যচক্ষু' অর্থাৎ অপ্রাকৃত চক্ষু। ইহাই যোগনেত্র। যোগবলে এই নেত্র লাভ হয়। তখন চর্মচক্ষু বন্ধ হয় এবং মর্মচক্ষু খুলে যায়। মর্মচক্ষুদ্বার খুলে গেলে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করা যায়। এই অপ্রাকৃত লীলা দর্শনই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। বৈদিক ঔপনিষদিক যুগে আর্যঋষিরা যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করেছিলেন। তাঁরাই আবার প্রাকৃত জনের জন্য অরূপকে রূপে, অনন্তকে সান্তে, অসীমকে সসীমে, আইডিয়ালকে রিয়ালে

এনেছিলেন। তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্রে বা মনস্তত্ত্বস্থানে এর স্থান। প্রজ্ঞার আলোকে এই দিব্যচক্ষুর বিকাশ হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে তাঁর সারথিরূপে অবস্থিত আছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের মানুষী রূপ। অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করে, তন্ময়তা দিয়ে, তাঁর সেই মানুষী রূপের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখালেন অর্থাৎ সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ করলেন। ঐ তন্ময়তাই যোগশক্তি। ভগবানের দয়ায় অর্জুন যোগশক্তি লাভ করলেন, আর সেই মুহূর্তেই ভগবানের মানুষী রূপের স্থানে তাঁর বিশ্বরূপ দেখলেন। ঠিক এই একই ভাবে দেবী ভগবতী তাঁর পিতা নগাধিরাজ হিমালয়কে তাঁর সেই বিশ্বমূর্তি দেখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গটি দেবীগীতায় আছে।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে দেখতে পাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাত্রা করেছেন, তখন তাঁর পথে এক মরু প্রদেশে উপস্থিত হয়ে তিনি মরুবাসী মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের দর্শন পান। কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন উতঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের কাছে। যুদ্ধের পরিণাম শুনে মুনি শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ সমথ হয়েও কুরুপাণ্ডবকে রক্ষা করেন নি, তাঁর মিথ্যাচারের ফলেই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে। আর সেইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনুনয় করে নিরস্ত করলেন এবং জানালেন যে—অল্প তপস্যার ফলে কেহ তাঁকে পরাভূত করতে পারে না, বরং তাঁর তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যায়। এর পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উতঙ্কের কাছে আপনার দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলে মুনি ভগবান্‌কে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মুনির অনুরোধে ভগবান্ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালে মুনি তাঁকে নমস্কার করলেন। তার পর মুনির অনুরোধে আবার তিনি পূর্বরূপ গ্রহণ করলেন এবং মুনিকে বর দিয়ে প্রস্থান করলেন।

মহাভারতের এই চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আমাদের ধ্যানের জগতে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হলেন, কিভাবে ভক্তসাধক লীলাময় অরূপরতনকে সরূপে এনে তাঁর সুমধুর বংশীরবে বিমোহিত হল আর মুগ্ধা নায়িকার মত তাঁর রূপসাগরে ডুবে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করল—সেই ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনার প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক আলেখ্য দেখতে

হলে আমাদিগকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের মানচিত্র দেখতে হবে এবং সম্রাট অশোকের কাল থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দ থেকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কাল অর্থাৎ ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতের ধর্মজগতের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় আসতে হবে। এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে দেখা যাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের সুপ্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের পরিণত অবস্থা, আর এই পরিণতিতে রাধাবাদের মাধ্যমে শ্রীজয়দেব অতীন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিশেষ পরিণত অবস্থায় এনেছেন। এই আলোচনায় সুষ্ঠু সমাধান হলে ধর্মজগতের এক বিশেষ আলো দেখা যাবে।

সম্রাট অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে তাঁর অভিষেক হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়েছিল তার পরিণতি তাঁর মনে সাময়িক জয়ের প্রতি এনেছিল চরম বিতৃষ্ণা। মহারাজ অশোক ধর্মবিজয়ের দ্বারা মানবজয়ের নীতিই চরম পন্থা হিসাবে গ্রহণ করলেন। এর ফলে ভারতের সামরিক শক্তির উপর চরম আঘাত হানলেন তিনি। মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে যেমন বুদ্ধের বাণী প্রচার প্রধান কর্ম হিসাবে গ্রহণ করলেন, তেমনই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তুল্য শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর একটি শিলালিপিতে জানতে পারা যায় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সমান অনুগ্রহ করতেন। এই সময় থেকে যুগপৎ ভারতের সামরিক শক্তির হ্রাস ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ আরম্ভ হল। এর পর হিন্দুধর্মাবলম্বী গুপ্তসম্রাটগণ বৈষ্ণব মতের সমর্থক হওয়াতে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল, আর দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত হয়েছিল। এ ছাড়া পূর্ব সীমান্তে সমতট (দক্ষিণপূর্ব বঙ্গ), দবক (আসামের নওগাঁ), কামরূপ (উত্তর আসাম), নেপাল, কারত্রীপুর (পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলা) প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে সর্বপ্রকার কর দিতেন।

বৈষ্ণব মতাবলম্বী গুপ্তরাজাদের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্ম যে উদ্দীপনা লাভ করেছিল, তার ফলে চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। যিনি ছিলেন বসুদেব-দেবকীসুত তিনি হলেন নন্দ-যশোদাদুলাল। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে যেভাবে কৃষ্ণলীলার নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেইভাবে কৃষ্ণরূপ পরিবর্তন হতে লেগেছে প্রায় ১১৫৬ বৎসর অর্থাৎ কলিঙ্গ যুদ্ধ (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১

অব্দ) থেকে পল্লব বংশীয় শেষ সম্রাট অপরাজিত বর্মণ (৮৭৬—৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত। মৌর্য সম্রাটেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আর গুপ্ত সম্রাটেরা ত বৈষ্ণব মতাবলম্বীই ছিলেন। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ে বৈষ্ণবভক্ত কবিদের সাধনায় বিষ্ণুর ঐশ্বর্যভাব শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হল এবং শ্রীকৃষ্ণের চক্রের স্থানে এল বংশী। কৃষ্ণত্ব ও বিষ্ণুত্ব এক হয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নররূপী নারায়ণ বলে বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হলেন। বিষ্ণুভক্ত হলেন কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্ত কবি যশোদাদুলালকে অবলম্বন করে সাধনায় নূতন রূপ দিলেন। বিষ্ণুভক্তের শান্ত ভাবের সাধনার পরিপূরকরূপে এল ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভক্তের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনা।

প্রাচীন ভারতের জনসাধারণ স্বভাবতঃই ধর্মপ্রবণ ছিলেন। আবার কলিঙ্গ যুদ্ধের পর যেভাবে সামরিক শক্তি হ্রাস হয়েছিল, তার ফলে আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যদিও পল্লব যুগ পর্যন্ত ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল, কিন্তু তার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশে কোন প্রকার বাধা আসে নি। আর ঐ সময় রাজাদের যে ক্ষুদ্র শক্তি ছিল তাতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাও সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির জন্য লোকায়ত হিন্দুধর্ম ও দর্শনেরও বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং এই সময় বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত ভাবটির নানাভাবে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ এসেছিল। তাই দেখা যায় গুপ্তবংশীয় বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যু (সম্ভবতঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করলেও বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটির মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন এসে গেল। গুপ্তবংশীয় রাজাদের আমলেই নানা পুরাণ রচিত হতে থাকল এবং এই সব পুরাণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ঐ লোকায়ত ভাবটির বিকাশ দেখা গেল। এই সময় একদিকে যেমন পুরাণের মধ্যে ঐ লোকায়ত ভাবটির প্রকাশ দেখা দিল, আবার অন্যদিকে ভাস্কর্যের মধ্যেও ঐ লোকায়ত ভাবের রূপ এসে গেল। ঠিক এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের ঐ লোকায়ত ভাবের প্রভাবেই বিষ্ণুর দশাবতারের কল্পনা জেগেছিল সাধারণ বৈষ্ণবের মনে। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক দিকের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়বার কথা নয়। কারণ গভীর তত্ত্ব সমুদ্রে অবগাহন করবার শক্তির অভাব ছিল এই সব সাধারণ বিষ্ণুভক্তের। তারা শুধু মহাবিষ্ণুর নানারূপের কল্পনা করেই সন্তুষ্ট ছিল। বুদ্ধও এই সময় বিষ্ণুর এক অবতার বলে গণ্য হন।

বৈষ্ণবধর্মের এই লোকায়ত ভাবটি এখনও আমাদের দেশে বিশেষভাবে দেখা যায়। এর পরিচয় নিতে হলে যেতে হবে বৈরাগীর আখড়ায়। এমন একটি আখড়ার সঙ্গে একদা আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। সে প্রসঙ্গের উল্লেখ না করেও পারছি না। খুলনা জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) সাতক্ষীরা মহকুমা সহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে দশ এগার মাইলের মধ্যে কপোতাক্ষীর তীরে ফায়লা গ্রাম। কপোতাক্ষী এখানে কুল কুল শব্দে চলেছে সাগরে মিশতে। অবশ্য বঙ্গোপসাগর এখান থেকে বহু দূর। স্বচ্ছতোয়া কপোতাক্ষীর তীরে অবস্থিত ফায়লা গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড় মনোরম। এর সৌন্দর্য অ-কবিকেও কবি করে তোলে। এর তীরে নিধুবন নেই, নেই ময়ূরের দল; কিন্তু আছে স্থানে স্থানে কদম্ব বৃক্ষ আর কেতকীর ঝাড়। প্রাবৃটের ঘন বরষায় তাদের ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করে তোলে। এখানেই ছিল ব্রজ গোঁসাই-এর আখড়া। এ অঞ্চলে তিনি ফায়লার গোঁসাই নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর আশ্রমে রাধাশ্যাম প্রতিষ্ঠিত। গোঁসাই আর তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা রাধাশ্যামের সেবায় ভোরবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত লেগেই আছেন দেখেছি। নাম ও লীলাকীর্তনের সুমধুর ধ্বনিতে আখড়াটি জমজমাট থাকত। নবাগত কেহ সেই আখড়ায় গেলে আখড়াবাসীরা তাঁকে 'রাঃ শ্যাঃ' বলে অভিনন্দন জানাতেন। বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটির আলোচনার অবসর এখানে ছিল না, কিন্তু তার স্থানে ছিল ভক্তহৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস। বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত ভাবটি উপলব্ধি করতে হলে আসতে হবে এই সব আখড়ায়। ভারতের নানাস্থানে এই ধরণের আখড়ার উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে। আর এই লোকায়ত ভাবটির বিকাশের ফলে বৈষ্ণবী সাধনার ধারার মধ্যে এল বৈচিত্র্য, তার ফলে বৈষ্ণবের শান্তভাবের উপাসনার ক্রমবিকাশে পাওয়া গেল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই মধুর ভাবের সাধনা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়াতে ভাগ হয়ে গেল। ঐ সময়কার পুরাণে তার প্রতিফলন পাওয়া যায় এবং ভারতের নানাস্থানের শিল্প ও ভাস্কর্যের মধ্যেও তার স্বাক্ষর আছে।

অতঃপর চক্রধারী কৃষ্ণ বংশী ধারণ করে যেভাবে ভক্ত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করলেন সেই আলোচনা করে আমরা এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানব। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কৃষ্ণের রূপ পরিবর্তিত হতে লেগেছে সাড়ে এগার শত বৎসরেরও অধিক। এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণত্ব ও বিষ্ণুত্ব এক হয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণুর

অবতার রূপে বৈষ্ণবসমাজে পূজা পেয়েছেন। আমরা আরও বলেছি, বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনা কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই শান্তভাবের সাধনায় উহা স্থিতিশীল না হয়ে গতিশীল হয়েছে এবং তাতে ইন্ধন দিয়েছে বৈষ্ণবধর্মের লোকায়ত ভাব। এর ফলে ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তার ফলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের শান্তভাবের সাধনা পর্যায়ক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে পরিণতি লাভ করেছে। মধুর ভাবের সাধনা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়াতে রূপলাভ করেছে। এই সময়ের মধ্যে নারায়ণের লক্ষ্মী বৈষ্ণব ভক্তের কাছে কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণীতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই রুক্মিণী এর পর ভাগবতে প্রধানা গোপীরূপে গৃহীত হয়েছেন এবং কৃষ্ণের অন্যান্য স্ত্রী বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীরূপে রূপলাভ করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও শেষাংশে কুরুক্ষেত্র লীলার বিবরণ থেকে অনায়াসেই ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পল্লব যুগের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। এ পর্যন্ত ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ ঘটলেও তার পূর্ণ পরিণতি লাভ হয় নি। তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও প্রায় আড়াইশত বৎসর অর্থাৎ পল্লব যুগের পর থেকে জয়দেবের আবিভাব পর্যন্ত।

পল্লব যুগের পর থেকে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব কালের মধ্যে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা মহাসমারোহে প্রকাশ লাভ করেছে। আর জয়দেবের আবিভাবে সত্যভামা চন্দ্রাবলী, জাম্ববতী কুব্জা, অন্য ষোল হাজার স্ত্রী ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ষোলহাজার গোপীরূপে রূপলাভ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুক্মিণী রূপিণী ভাগবতের ঐ প্রধানা গোপীকে রাধা নাম দিয়ে শ্রীজয়দেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাগানুগা বা পরকীয়া (spontaneous or dynamic) তত্ত্বের বা রাধাতত্ত্বের বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম সাধনার পথ দেখিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ফলশ্রুতি এখানেই। জয়দেবের সাধনার বৈশিষ্ট্য এখানে।

॥ ৪ ॥

ঃ শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ

'রামচরিত' অবলম্বন করে রামায়ণ রচনা করতে উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলেছিলেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

বালকাণ্ড, ২য় সর্গ, ৩৬-৩৭ শ্লোক।

—যতকাল ভূতলে গিরি-নদীসকল অবস্থান করিবে ততকাল রামায়ণ-কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে। যতকাল তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকিবে ততকাল তুমিও আমার জগতের ঊর্ধ্বে ও অধোলোকে বাস করিবে অর্থাৎ তোমার কীর্তি জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ব্রহ্মার এই উক্তিটি যে কত বড় সত্য, সেকথা আজ আর কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না। বাল্মীকির কাব্যকথা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয়ে সকলের শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হয়েছে। আর রামায়ণ হয়েছে বহু কবির কাব্য ও কবিতার, বহু নাট্যকারের নাটকের উৎস। রামায়ণের প্রভাব বহুভাবে আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

বীরভূমের কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব ও তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ অনুরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বৈষ্ণবসমাজ ও সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যের উপর। বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনা করতে গেলেই এসে যায় শ্রীজয়দেব ও তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের কথা। গৌরচন্দ্রিকা গান করে কীর্তনীয়াগণ যেমন করে কীর্তন আরম্ভ করেন, ঠিক তেমনই শ্রীজয়দেবের প্রশস্তি গান করে, তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ স্মরণবন্দন করে তবে পদাবলীর বিষয় আলোচনা সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দই বৈষ্ণবপদালীর উৎস। বিষয়বস্তু ত বটেই—তা ছাড়াও তার মধ্যে লিরিক বা গীতি কবিতার যে সুমধুর ধ্বনিটি আছে—তারও মূলে আছে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব।

জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবী সাধনার ক্ষেত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব এসেছিল; কিন্তু মধুর ভাবের পূর্ণ পরিণতি আসে নি।

জয়দেবের সাধনায় এসেছিল মধুরভাবের পূর্ণ পরিণতি। আর এই মধুরভাবের পরিপূর্ণরূপ দিয়েছেন জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দে। জয়দেবের সাধনা দিয়েছে বৈষ্ণবসাধককে পথের নিশানা, আর তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সঞ্চারিত করেছে বৈষ্ণব মহাজনদের অন্তরে অমৃতরসধারা। তার ফলে বৈষ্ণব গীতিকবিতার ক্ষেত্র হয়েছে উর্বর। কিন্তু স্বল্পকালের জন্য নয়, নিত্যকালের উপযোগী। জয়দেবের সাধনার মূল তত্ত্ব হল রাগানুগা বা পরকীয়া (spontaneous or dynamic) তত্ত্ব। ইহাই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির চরম কথা।

বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্ব হল—পরমাত্মা নিত্য, জীবাত্মা নিত্য আর এই উভয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেম, তাও নিত্য। প্রেম পরমাত্মার মত অসীম। তাই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগবান প্রেমময়। এই প্রেমসাধনার দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। বৈষ্ণবের ধর্ম তাই প্রেমধর্ম। এই প্রেমধর্ম জয়দেবের সাধনায় পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে। আর সেই পরিণতিই হল—রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনা। এই পরকীয়া সাধনার আলোচনায় আমরা অন্যত্র বলেছি—'রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নারী পুরুষ নন। ভক্তমাত্রেই রাধা এবং শ্রীভগবানই একমাত্র পুরুষ। জীবাত্মা রাধা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। এই পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি, তাই পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার এত আকুতি। সূর্য থেকে যেমন সহস্রকর বেরিয়ে আসে, আবার সেই সহস্রকর সূর্যই সংহৃত করে নেয়—ঠিক তেমনই পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থা। দ্রষ্টব্য—অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব—পৃঃ ১৮-১৯।

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী নারায়ণ নন, তিনি বংশীধারী মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ পুরুষ কিশোর কৃষ্ণ। তার হলাদিনী শক্তিই রাধা। আবার হলাদিনী শক্তিরূপিণী রাধাই হল জীবাত্মা, আর বংশীধারী মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ পুরুষ কিশোর কৃষ্ণই পরমাত্মা। এই জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলা অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রেমসাধনাই জয়দেবের পরকীয়া সাধনা; জয়দেবের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। জয়দেবের এই প্রেমসাধনা বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মূল অন্বেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার মূলে আছে—মাটির মানুষের প্রেম। জয়দেব মাটির মানুষের প্রেমকে অবলম্বন করে তাকে স্বর্গীয় সুষমা দান করেছেন। মানুষের প্রেম অপূর্ব সুসমামণ্ডিত হয়ে মর্ত থেকে স্বর্গে উপনীত হয়েছে, মানুষের প্রেম অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেমে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত হয়ে সাধকের অতীন্দ্রিয়লোকে হৃদি বৃন্দাবনে অতীন্দ্রিয় আনন্দরূপে বিরাজিত হয়েছে। জয়দেবের এই অতীন্দ্রিয়-

তত্ত্বের পূর্ণরূপ দেখা গিয়েছে রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনার মধ্যে। এই পরকীয়া সাধনাই বৈষ্ণবী সাধনার পরম এবং চরম বিকাশ।

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বংশীধারী কিশোর কৃষ্ণ। জয়দেবের পূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাধকেরা দেবকী-বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের রূপ পালটিয়ে তাঁকে চক্রধারী কৃষ্ণের পরিবর্তে বংশীধারী কৃষ্ণে পরিবর্তিত করেছেন, দ্বারকা থেকে তাঁকে এনেছেন গোকুল বা বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ এখানে নন্দ-যশোমতীর সন্তান, আর গোপ বালকগণের সখা। বৃন্দাবনের বৃন্দাবনচন্দ্র রাখালরাজ কৃষ্ণ অক্রূর, উদ্ধব প্রভৃতির দ্বারা পরিসেবিত, আবার সনকাদি ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত। কৃষ্ণ এখানে রাখালবালকদের সখা, মানবসন্তান, আবার মানুষের কান্ত। একটু অনুধাবন করলেই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে—বৈষ্ণবের প্রেমসাধনার মূলে মানবের প্রেম। মানুষের পরিচয় হল মানুষীভাবে। মানুষীভাবের সার্থক পরিণতি হল মনুষ্যত্বে। মনুষ্যত্বে ও দেবত্বে কোন প্রভেদ নেই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ মনুষ্যত্বেই দেবত্বের প্রকাশ। তাই মানুষের প্রেমই ভগবৎপ্রেমে পরিণত হয়। বৈষ্ণব সাধকেরা মানুষের প্রেমকেই ভগবৎপ্রেমে রূপ দিয়েছেন। এই সাধনা তাই প্রেমসাধনা বা অতীন্দ্রিয়সাধনারূপে বৈষ্ণবসাধনতত্ত্বের পরিণতি দিয়েছে।

মানুষের প্রেম কিভাবে বৈষ্ণবের প্রেমসাধনায় রূপান্তরিত হল—এখানে তার আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখি, প্রভু ভৃত্যকে ভালবাসেন, আবার ভৃত্যও প্রভুকে ভালবাসে, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে, পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, আবার পুত্র পিতাকে ভালবাসে, মাতা সন্তানকে ভালবাসেন, আবার সন্তান মাতাকে ভালবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, আবার স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসে। এই ভালবাসাও আবার পাত্রভেদে ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। তাই পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, পুত্রস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, দেশপ্রেম, পত্নীপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক শব্দ (term) আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব সাধকেরা মানুষের এই প্রেমপ্রীতির সূত্র ধরে তার ভগবন্মুখী ভাবকে গ্রহণ করে মর্ত থেকে স্বর্গে উত্তরণ করেছেন। এই ভাবের সাধনাকেই বলা হয় সহজ-সাধনা। এই সাধনারও পূর্ণ পরিণত রূপ অতীন্দ্রিয়সাধনা। সুতরাং প্রেম-সাধনা বা সহজ সাধনার পরিণত রূপই অতীন্দ্রিয়সাধনা। বৈষ্ণবের এই সাধনাকেই উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই—দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ॥
বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার।

(—বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী)

বিশেষকে আশ্রয় করে নির্বিশেষে যাওয়া অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করাই অতীন্দ্রিয়ভাবের সাধনা। সহজ সাধনাই হোক্, আর রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনাই হোক্—একে যে নাম দেওয়া যাক না কেন, এর সর্বশেষ নাম অতীন্দ্রিয়সাধনা। অতীন্দ্রিয়বাদ বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব বৈষ্ণবদর্শনের তথা আত্মদর্শনের সারতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা গীত হয় বলে যে কীর্তন আমাদের ভাল লাগে তা নয়, এই অখিল বিশ্বের মূলে যে নিত্য আনন্দ সেই নিত্য আনন্দের এক খণ্ডাংশের উপলব্ধি হয় পার্থিব প্রেমে ; মানব-প্রেমের মধ্যে আছে সেই নিত্য বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা। পার্থিব প্রেমকে অবলম্বন করে কীর্তন গানের মাধ্যমে আমরা হৃদয়ে অপার্থিব আনন্দ লাভ করি, সবিশেষকে আশ্রয় করে নির্বিশেষকে লাভ করি। কীর্তন তাই আমাদের এত প্রিয়। সেজন্যই ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্বভুবন,
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১ পরিচ্ছেদ, ২৭ শ্লোক॥

রবীন্দ্রনাথই এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'মনুষ্য' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।'

এই অতীন্দ্রিয়সাধনার বিশেষ পরিচয় আছে বাঙালীর গীতি-সাহিত্যের মধ্যে। বাঙালীর কবিমানসের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, গীতি-সাহিত্যের দিকেই তার প্রবণতা অধিক। চর্যাপদ থেকেই বাঙালীর এই স্বাভাবিক গীতি প্রবণতার পরিচয় মেলে। বাঙালী বৈষ্ণবের সাধনা আর বাংলার প্রকৃতিই দিয়েছে বাঙালীর এই বিশিষ্ট গীতিপ্রবণতার প্রেরণা। বাংলার গীতিসাহিত্য তাই বাংলাসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। অবশ্য সার্থক গীতি-কবিতার জন্ম হয়েছে জয়দেবের সাধনায়, আর তার রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর লেখনীতে। বস্তুতঃ জয়দেবই বাংলা দেশের প্রথম সার্থক গীতিকবিতাকার। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি গীতিকবিতার পথ ধরে আমাদের মনের মণিকোঠায় শ্রদ্ধার আসন পেতেছেন। বাঙালী যে যে ভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি দান তার মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবের সাধন-রীতির কাব্য প্রকাশ ঘটেছে

বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে। বৈষ্ণবপদাবলী গীতিকবিতা হলেও ইহা বৈষ্ণবদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, প্রার্থনাবিষয়ক পদ থাকলেও রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদই এর প্রধান উপজীব্য। শ্রীরাধার প্রেম বিদেহী, এজন্য কামগন্ধহীন। কামগন্ধহীন প্রেমই বাঙালী-বৈষ্ণব কবিমানসকে রাঙিয়ে দিয়েছে। বাঙালীর মধুর অনুভূতি এবং ভাবময়তা জীবন-রসে সিক্ত হয়ে এক অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়েছে। বাঙালী তার হৃদয়ের মধু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এই পদাবলীর মধ্যে। বাঙালী সাধক-কবি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে রসরূপ দিয়েছে। তাই বৈষ্ণব-কবিরা ভগবানকে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করে জগতের পরপারে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন নি, তাঁরা পৃথিবী ও স্বর্গ একবারে মিশিয়ে দিয়েছেন।

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রথম কবি শ্রীজয়দেব। তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ইহাই অগ্রদূত। তাই জয়দেব বৈষ্ণব কবিদের গুরু বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ওপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। এমনকি মৈথিল কবিরাও শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাক্‌চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগ। প্রাক্-চৈতন্য যুগের প্রথম কবি জয়দেব। তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু গুরুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেই আমরা এখানে নিরস্ত রইলাম। জয়দেবের পর বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' উপর 'শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব' বিশেষভাবে বিদ্যমান।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বিচার করে স্থির করেছেন যে, চর্যাপদের পরবর্তী বাংলা কাব্যগ্রন্থ হল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চর্যাপদের পর এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বে আর কোন বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল কি না জানা যায় নি। জয়দেবের পর এবং মহাপ্রভুর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতা থেকে তাঁর নাম চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস এবং অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বলে জানা যায়। পদাবলী সাহিত্যে পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাস সুপ্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের পদ বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে আনন্দের ধারা বর্ষণ করে। কিন্তু চণ্ডীদাসকে নিয়ে পণ্ডিতসমাজে যে

সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে, আজিও তার নিরসন হয় নি। একসময় বীরভূম ও বাঁকুড়ার মধ্যে চণ্ডীদাসকে নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছিল। বীরভূমের নান্নুর ও বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাশুলীদেবীর মন্দির আছে। উভয় স্থানের বাশুলীমন্দির এই বিবাদে ইন্ধন দিয়েছিল। রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে চণ্ডীদাস ভণিতায় যে পদাবলী পাওয়া যায়, তার কবি দুজন। একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস, অপর জন দীন চণ্ডীদাস। দীন চণ্ডীদাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের (খ্রীঃ ১৪৮৫—১৫৩৩) পরবর্তী কবি। তার কারণ—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ ॥

এই শ্লোক হতে বেশ বুঝতে পারা যায়, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কবিতা গান করে আনন্দ উপভোগ করতেন। সুতরাং এই চণ্ডীদাস যে মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী—এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের মতে ইনিই দ্বিজ চণ্ডীদাস। অপর পক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিক প্রচলন ছিল না। একখানি মাত্র পুঁথি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের বাড়ী হতে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ মহাশয় উদ্ধার করেন এবং উহাই তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সনের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তেরটি খণ্ডে—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, যমুনা-খণ্ডান্তর্গত কালিয়দমন খণ্ড, যমুনাখণ্ড, যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড, বানখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহ—তেরটি পালায় বিভক্ত। এই গ্রন্থটির স্বরূপ আলোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা একখানি পাঁচালী জাতীয় কাব্য। গ্রন্থখানিতে যেভাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে এই রাধাকৃষ্ণ মাটির সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে নহেন। যদিও এই গ্রন্থে চর্যাপদ, ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব আছে, তথাপি এর রচনা-কৌশল স্বতন্ত্র। গ্রন্থটির রচনা-কৌশল আলোচনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ গ্রন্থ ঝুমুর জাতীয় গান। নাটকের সংলাপের মত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়ায়ি—এই তিনজনের সংলাপে রচিত। যে প্রসাদগুণে ও অতীন্দ্রিয়ভাবে শ্রীগীতগোবিন্দ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত হয়েছে,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার নিতান্ত অভাব। তার পরিবর্তে এর মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবের সমাবেশ হয়েছে—তাতে এর রাধাকৃষ্ণ নাটকের নায়ক-নায়িকায় রূপলাভ করে মর্তপ্রেমের অভিনয়ে যেন মেতে উঠেছে। এর অশ্লীল পালা যে মহাপ্রভু গান করতেন আর তার ভাবে যে বিভোর হয়ে থাকতেন, এমনও মনে হয় না।

কৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ডে গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকের হুবহু অনুবাদ আছে।

বৃন্দাবনে ধীরে ধীরে মলয় পবন প্রবাহিত হচ্ছে, সেই পবন শরীরে সঞ্চারিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ মন্মথশরে বিদ্ধ হয়েছেন। চারিদিকে সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাতে বিরহীর হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গীতগোবিন্দের ৫ম সর্গের ২য় গীতে আছে :—

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।

বৃন্দাবন খণ্ডে বড়ুচণ্ডীদাস লিখেছেন ;—

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহি হৃদয়ে ॥ ল ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাকে বড়ায়ি বলছেন—'রাধে, কানাই তোমার দর্শন না পেয়ে বিরহে বিকল হয়ে পড়েছে। গৃহপরিত্যাগ করে ঘোরবনে মৃত্তিকার উপর শয়ন করে আছে। দিবারাত্র তোমার নাম অতি যত্নে স্মরণ করছে। তুমি সত্বর যেয়ে তার মনোরথ পূর্ণ কর।'

সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি। ৩ ॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥

গীতগোবিন্দ। ৫ম সর্গ ॥

বৃন্দাবন খণ্ডে চণ্ডীদাস লিখেছেন,—

তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞি ল।
তোর বিরহ দহনে ॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
সুতে ধরণী শয়নে।
অহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥২॥
এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞিঁর আশে ॥

বড়ায়ি শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেতে অনুরোধ করে বলছেন,—'রাধে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গে রতিসুখসম্ভোগ জন্য মনোহর বেশে সজ্জিত হয়ে বৃন্দাবনে থেকে বেণু বাজিয়ে সঙ্কেতে তোমায় ডাকছেন। তুমি অবিলম্বে যাও।'

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ ৮ ॥
গীতগোবিন্দ। ৫ম সর্গ।

বৃন্দাবনখণ্ডে চণ্ডীদাস গাইলেন :—

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনে কালিন্দী নদীতীরে মন্দ মন্দ পবন সঞ্চারিত হচ্ছে। সুগন্ধবহ তোমার শরীরগন্ধ বহন করে সেখানে লয়ে যাচ্ছে; আর কানাই বহুমানে সেই গন্ধের ঘ্রাণ 'লয়ে তোমার চিন্তায় বিভোর হয়ে যাছে।

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। ৯ ॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে নতু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি বেণুম্ ॥ ১০ ॥
গীতগোবিন্দ। ৫ম সর্গ।

বৃন্দাবনখণ্ডে চণ্ডীদাসের উক্তি :—

কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥

তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে ॥

বড়ায়ি রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতার সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলছেন,—'গাছের উপর পাখী বসলে তার পাতায় যে মৃদু শব্দ হচ্ছে তাতে তোমার আগমনের শব্দ মনে করে অতি শীঘ্র শয্যা রচনা করছে। তুমি কতক্ষণে আসবে তাই মনে করে দিকে দিকে চাইছে। তুমি সত্বর যাও এবং তার আশা পূর্ণ কর।

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ ১১ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥ ১২ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ১৩ ॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ ১৪ ॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ১৫ ॥

গীতগোবিন্দ। ৫ম সর্গ।

চণ্ডীদাস উহার প্রতিধ্বনি করে লিখলেন,—

পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥
চাহে দশদিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কতখনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥
গলিত বসনহীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী ॥

মথুরার হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়ে বড়ায়িকে নেত্রী করে শ্রীরাধার সহিত ষোল সহস্র গোপী দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলের পসরা সাজিয়ে যাত্রা করল। পথে বৃন্দাবনের সৌন্দর্য দর্শন করে গোপীরা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং বৃন্দাবন ভ্রমণ করতে মানস করল। শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পেয়ে সকলে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে প্রস্ফুটিত কুসুমনিকর চয়ন করতে লেগে গেল। বৃন্দাবনের সৌন্দর্যে গোপীরা এই সময় মদনবাণে বিদ্ধ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে তাদের সহিত রমণ করেন। পরে তিনি শ্রীরাধার নিকট আগমন করে আলিঙ্গন অভিলাষ জানালে শ্রীরাধা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন রাধাকে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা।
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥২॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥ ৩ ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥ ৪ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মমহৃদয়মতিযত্নম্॥ ৫ ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্।
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥ ৬ ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্

রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরস-লসদলক্তকরাগম্ ॥ ৮ ॥
স্মর-গরল্-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ॥
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥ ৯ ॥
গীতগোবিন্দ । ১০ম সর্গ ॥

বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের সুরে সুর মিলিয়ে বৃন্দাবনখণ্ডে অমনি গাইলেন,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে ॥
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে ।
পরতেখ মোর নয়নচকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে ।
বদন কমল- মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥
যবেঁ সত্যেঁ কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে ।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে ।

এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদরূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে নিয়ে কালীদহে জলকেলী করতে ইচ্ছা করেছিলেন। এর প্রধান অন্তরায় ছিল কালীয় নাগ। নাগ কালীদহে বাস করত এবং তার প্রতাপে মাছ ও জলজন্তু উক্ত কালীদহে বাস করতে পারত না। এমন কি তার বিষের জ্বালায় তীরস্থ বিটপিগণ বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে দমন করবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রাখালগণের নিকট উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হয়ে শ্রীরাধিকা বিলাপ করতে লাগলেন। নন্দযশোদাপ্রমুখ গোপ-গোপীগণ ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন। তখন বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার স্তোত্র পাঠ করেছিলেন।

জয়দেব যে 'দশাবতার স্তোত্রম্' লিখেছেন, চণ্ডীদাস কালিয়দমন খণ্ডে তার প্রতিধ্বনি করেছেন,—

মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদিনী বিদারিলেঁ।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥

বামনরূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরামরূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ॥
শ্রীরামরূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন॥
কলকীরূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কংশবধের কারণ॥
হেন সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণনায় জয়দেব লিখিলেন,—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্
সা মন্যতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥ ১১
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥ ১২
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥ ১৩
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্॥ ১৪
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্॥ ১৫
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥ ১৬
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥ ১৭
গীতগোবিন্দ। ৪র্থ সর্গ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধা কাতরা হয়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিলেন। সেখানে নারদের উপদেশে তিনি জানতে পারলেন যে কৃষ্ণ কদম্বের মূলে অবস্থান করছেন। সে কথা শুনে কৃষ্ণের নিকটবর্তী হয়ে রাধা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে জ্ঞানলাভ করে তিনি বড়ায়িকে দূতীরূপে নিজের অবস্থা বর্ণনা করবার জন্য

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করেন। বড়ায়ি এসে কৃষ্ণের নিকটে রাধার অবস্থা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ আছে,—

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥
আল
তোর বিরহ দহনে
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥
কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে॥
দেখি পল্লবশয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

রাধাবিরহ বর্ণনায় জয়দেব অন্যত্র গেয়েছেন—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥১॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥২॥
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥৩॥
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥৪॥
বহতি চ বলিতবিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ ॥৫॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥৬॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥৭॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষাদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥৮॥

গীতগোবিন্দ। ৪র্থ সর্গ।

আর বড়ু চণ্ডীদাস স্বীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধিকার বিরহ বড়ায়ির মুখে আমাদিগকে শুনিয়েছেন,—

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥১॥
আল কাহ্নাঞিঁ ল
রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে ॥
অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥

সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥২॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ।
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।

পূর্ববর্তী কবি জয়দেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বড়ু চণ্ডীদাস যে তাঁর এই কাব্যে জয়দেবের উপর্যুক্ত গীতগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন এতে আমাদের বিস্মিত হবার কারণ নেই। কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পূর্ববর্তী লেখকের ছায়া আমাদের লেখার মধ্যে আসবে—এটা স্বাভাবিক। সুতরাং স্বভাবের স্রোতকে নিবারণ করা যায় না বলেই চণ্ডীদাসের কাব্যে জয়দেবের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু একথা বাদ দিলেও বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে' কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বংশী ও বিরহখণ্ডে বড়ু যে কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে যে ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে কোন্ রসিকজন না মুগ্ধ হয়; সুতরাং জয়দেবের প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকলেও বড়ুর কীর্তি কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। বরং তিনি যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উহা সমাবেশ করতে পেরেছেন তাই তাঁর অসাধারণ কীর্তি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিসাহিত্যের অন্তর্গত না হলেও বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবময়তা এবং অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের পূর্বাভাষ এর মধ্যে প্রথম দেখা গেছে। বংশীখণ্ডের দ্বিতীয় কবিতায় রাধার উক্তির মাধ্যমে কবি লিখেছেন,—

॥১॥ কেদার রাগ : ॥ রূপকং ॥

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকন্তস্য জগাদ জরতী মিদং ।১॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি ।২। এ গোঠ গোকুলে ॥

।১॥ কংসভয়াতুরা রাধা বংশীনিনাদ শুনে কে বাজাচ্ছে—তা জানবার জন্য বড়ায়িকে এ কথা বললেন।

।২॥ বৃদ্ধা গোপী—রাধাকৃষ্ণের মিলনের সহায় ॥

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥১॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখা-এ মোর কাহ্নু অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

উপরি-উক্ত পদটি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব নিহিত আছে সেটি অনায়াসে ধরা পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলী ও পরবর্তী গীতি-সাহিত্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে, এই পদটি যেন তারই ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকচক্রবাল যেমন উষার স্বর্ণাভায় রাঙিয়ে ওঠে এবং তরুণ সূর্যের উদয় ঘোষণা করে, এই পদটিও তেমনি অসতর্ক মুহূর্তে বড়ুর লেখনীমুখ-নিঃসৃত হয়ে বাংলা গীতিসাহিত্যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের আভাষ জানিয়ে দিল। বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত কবিতা আমাদিগকে শুনাচ্ছে,—ভগবানের বাঁশী প্রতিনিয়ত বাজছে। আকাশে বাতাসে, নদীর কলতানে, পাতার মর্মর ধ্বনিতে, পাখীর কলগীতে, মানবহৃদয়ের অতি নিভৃত অন্তঃস্থলে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কেউ শুনতে পায়, কেউ শুনতে পায় না। যে শুনতে পায় সে তা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, তা প্রকাশ করা যায় না। তা শুধু অনুভব-যোগ্য, অনুভূতিবেদ্য। এজন্য এ ভাবটি অতীন্দ্রিয় ভাব। এই আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। এই আনন্দ কেমন? এর স্বরূপ হল—বাঁশীর সুর কানের মধ্য দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে প্রাণ আকুল হয়ে

ওঠে, সব কাজ ভুলে যেতে হয়। সেই কাজ-ভোলা মনের অবস্থা প্রকাশের অতীত। সংসারের সমস্ত বন্ধন তখন শিথিল হয়ে যায়। মনে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিই দাসীর মত। ঠিক যেন পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আত্মসমর্পণ। আনন্দময় ত মহানন্দে মেতে বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু মানব ত সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব কোন প্রকারে ত মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারে না। ছাড়ি ছাড়ি, কিন্তু ছাড়তে পারে না। আর পারে না বলে সংসারের দাবদাহে সর্বদা দগ্ধীভূত হয়। শুধু জ্বালা আর জ্বালা। সে জ্বালার নিবৃত্তি নেই, প্রতিকারও নেই। মায়াবদ্ধ জীবের পরিণতি তো এই-ই।

॥ ৫ ॥

ঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ঃ

জয়দেব আরাধনার দ্বারা যে রাধাভাব-এ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, বৈষ্ণব সাধককে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও কাব্যক্ষেত্রে সেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু উক্ত কবিতার মধ্যে তার বীজ রেখে গেছেন। পরবর্তীকালে এই বীজ পত্রপুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে তার শীতল ছায়াতে বহু পথিককে শান্তি দিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের পর জয়দেবগোষ্ঠীর আর যে সব বৈষ্ণব পদকর্তা বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ভাবের সমাবেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মহাপ্রভুর পূর্বে আমরা আর দুজনের নাম জানি। এঁরা হলেন—বিদ্যাপতি ও দ্বিজ চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হলেও বাঙালীরা তাঁকে আপনজন করে নিয়েছে। তিনি বাঙালী নহেন এ কথা আর বাঙালীরা মানতে চায় না। বাংলার গীতিসাহিত্যে বিদ্যাপতির অবদান অতুলনীয়। সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধেও তিনি জীবিত ছিলেন। মিথিলার দ্বারভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গে তাঁর বাড়ী ছিল। দ্বারবঙ্গ বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল—এই অর্থে বিদ্যাপতি বাঙালী। বাঙালীই বিদ্যাপতির কবি প্রতিভার কথা সর্বপ্রথম সুধীসমাজে প্রচার করেছে। বিদ্যাপতিকে বাঁচাতে বাঙালীই এগিয়েছিল। তাই বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি—অন্ততঃ বাঙালীর অতি প্রিয় কবি। সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন অথচ তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলি তিনি মৈথিল ভাষায় লিখেছেন। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। রাজা শিবসিংহ এবং তাঁর রাণী লছিমা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদ লিখেন। তাঁর কবিতায় পাণ্ডিত্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট, কিন্তু লৌকিক রসে পূর্ণ। অবশ্য পরবর্তীকালে অতীন্দ্রিয়ভাবও স্ফুরিত হয়েছে। মহাপ্রভু তাই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করতেন।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে আর একজন বাঙালী কবি পদাবলীতে অতীন্দ্রিয় ভাব সমাবেশ করে তার সৌন্দর্য চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। ইনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' বা শুধু 'চণ্ডীদাস'। বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস হতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি। বড়ু চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি—এ কথার উল্লেখ আগেই করেছি। দীন

চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পরবর্তী কবি। মহাপ্রভু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন—এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজ চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালের কবিও হতে পারেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের বাড়ী বীরভূমের নান্নুর গ্রামে অথবা বাঁকুড়ার ছাতনা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাষা সরল ও মাধুর্য-মণ্ডিত। অতীন্দ্রিয় ভাবের গভীরতায় তাঁর পদগুলি অতুলনীয়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত। তাঁর পদ যতই আস্বাদন করা যায়, ততই আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিদ্যাপতির মত সুখের কবি নন। তিনি দুঃখের কবি। কিন্তু এই দুঃখই তাঁর সুখ। দুঃখের মধ্যেই তিনি সুখের সন্ধান পেয়েছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুঃখ তাই মাধুর্যে ভরা। বিদ্যাপতির রাধা হাস্যে, লাস্যে ভরপুর, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যৌবনে যোগিনী। অথচ তাঁর সেই বৈরাগ্যের মধ্যে মিলনের আনন্দানুভূতি বিদ্যমান।

প্রাক চৈতন্যযুগের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের আলোচনার পূর্বে আমরা চৈতন্যোত্তর যুগের কয়জন পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছাড়াও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ লিখেছেন। তা ছাড়া সকলেই গৌরাঙ্গের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব প্রচারিত মতবাদে এঁদের পদাবলী পুষ্ট হয়েছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদেও অতীন্দ্রিয় ভাবের সমাবেশ হয়েছে—ঠিক যেভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদে হয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রধান দুজন কবি হলেন—জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। অন্য সকল কবি হতে এঁদের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত বলে আমরা সংক্ষেপে এঁদের পরিচয় দেব। অবশ্য পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়ভাবের সমাবেশ প্রসঙ্গে কয়েকজনের কতকগুলি পদ আলোচনার আশাও আছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম প্রথমেই মনে আসে। জ্ঞানদাস ছিলেন দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। পদলালিত্যে এবং ভাবব্যঞ্জনায় জ্ঞানদাসের পদগুলি চণ্ডীদাসের পদের অনুরূপ। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৩০ খৃঃ অব্দে) জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির উত্তরসাধক কবি। ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদগুলি ধ্বনিমাধুর্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যে এবং অলংকার পারিপাট্যে বাংলা গীতি-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। জীব গোস্বামী তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে

তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি দান করেছিলেন। অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাতামহ কবি ছিলেন, বড় ভাই কবি ছিলেন; আর তাঁর পুত্র ও পৌত্র কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পৌত্র ঘনশ্যামদাস তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক পদ লিখেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৩৭ খৃঃ অব্দে) তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ ও তাঁর বড় ভাই রামচন্দ্র পৈতৃক বাসভূমি কুমারনগরে গমন করেন এবং সেখান থেকে তেলিয়াবুধরিতে (মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকট) বাসস্থাপন করেন। গোবিন্দের মাতামহের নাম দামোদর সেন। মাতার নাম সুনন্দা। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

এখানে দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটু আলোচনারও প্রয়োজন আছে। দীন চণ্ডীদাসের আবিষ্কারক ব্যোমকেশ মুস্তফী দীন চণ্ডীদাসকে উৎকৃষ্ট কবি বলেন নি। তাঁর অনেকগুলি পদ ছিল বলে মনে হয়, কারণ প্রাপ্ত পুথিতে কোন কোন পদের নীচে দুই হাজারের উপরের সংখ্যা লেখা আছে, অথচ ঐ প্রাপ্ত পুঁথিতে মাত্র শতাধিক পদ পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানে এই নয়—চণ্ডীদাসের নামে যা কিছু পাওয়া যাবে তা সব দীন চণ্ডীদাসের লেখা। যদিও দীন চণ্ডীদাস গৌরচন্দ্রিকার ধার ধারেন নি, তথাপি তাঁর কবিতা দেখলে বুঝা যায় যে তিনি গৌরাঙ্গের ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছেন। এর পর মহাজন, গৌরচন্দ্রিকা ও ব্রজবুলি সম্বন্ধেও একটু বলার দরকার আছে মনে হয়।

বৈষ্ণব পদকর্তারা শুধু প্রতিভাশালী কবিই নন, তাঁরা ভক্ত সাধক বটে। তাঁদের অন্তরস্থিত ভক্তি পদগুলিতে রসলাভ করেছে। ভজনের উৎকর্ষের জন্যই যেন পদগুলি রচিত হয়েছে। এইজন্য এই পদরচয়িতৃগণ 'মহাজন' এই নামে অভিহিত হন। গৌরচন্দ্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে গৌরাঙ্গের কথা। হিন্দুর জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল বাঙলার মাটিতে। তাঁর আবির্ভাবে বাঙলার আকাশ হতে দুর্দিনের কালোমেঘ অপসারিত হয়েছিল। বাঙালীর জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে নূতন স্রোতে প্রবাহিত হোলো। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিতে

নূতন জোয়ার এলো। তাঁর আবির্ভাবে বাঙালী কুসংস্কারের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেল। তাঁর ভক্তিধর্ম আচারের গণ্ডী অতিক্রম করে জাতিভেদের জগদ্দল পাথর দূরে সরিয়ে দিয়ে বাঙলাদেশের বুকে প্রেমের বন্যা এনে দিল। মহাপ্রভুর মানবপ্রীতি অতি স্বাভাবিক, কারণ তাঁর উপাস্য দেবতা মহাভারতের মানবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কয়েকটি শ্লোক ছাড়া মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর জীবনই এক মহাকাব্য। তাঁর সেই জীবন কোটি কোটি গ্রন্থ হতে মূল্যবান। সেই জীবনই পৃথিবীর মানবকে মহাপ্রেরণা দান করেছে। সেই প্রেরণার উৎসমুখ অনন্তকাল মানবজাতির প্রাণে রস সঞ্চার করে চলেছে, তা শুকাবার নয় বলে কখনও শুকিয়ে যাবে না। মহাপ্রভুই ভারতের আবালবৃদ্ধ নরনারীর প্রাণে হরিভক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। সুতরাং নগরকীর্তন, নামকীর্তন, রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের প্রারম্ভে যে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে এটি স্বাভাবিক। বৈষ্ণব মহাজনগণ এটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর ফলে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি রচিত হয়েছিল এবং কীর্তনের প্রারম্ভে কীর্তনীয়াগণ পালাগান আরম্ভে সেই পালার রসদ্যোতক গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি গান করে সর্বপ্রথম ভক্তিরস সঞ্চারিত করেন এবং যুগপৎ হরিভক্তিদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পদে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। বৈষ্ণব সমাজের ধারণা গৌরচন্দ্রিকা না গাইলে, না শুনলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আর রাধাকৃষ্ণলীলা গাইবার বা শোনবার অধিকারও জন্মে না। কোন কোন বৈষ্ণবকবি তাঁর পদাবলীতে বহু ব্রজবুলি পদ ব্যবহার করেছেন। 'ব্রজবুলি-পদ' সম্বন্ধে নানাজনের নানামত আছে। অনেকের ধারণা, ব্রজবুলি-পদ ব্রজমণ্ডল বা বৃন্দাবনের ভাষা। তাঁদের ধারণা—রাধাকৃষ্ণ এই ব্রজবুলিতে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রজবুলির সঙ্গে ব্রজভাষা অথবা মথুরা বৃন্দাবনের বর্তমান ভাষারও কোন সম্পর্ক নেই। একদা বৃহত্তর বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল দ্বারবঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা। ঐ সময় মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল এই দ্বারবঙ্গে। এর ফলে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলন সাধন করে অতি মধুর 'ব্রজবুলিতে' তাঁর পদাবলী লিখেছিলেন। বিদ্যাপতি পদাবলীতে 'ব্রজবুলি' পদ সমাবেশ করে পদাবলীর সৌন্দর্য ও সম্পদ শতগুণে বৃদ্ধি করেছেন।

পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রথম—পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে পদকর্তাদের পদগুলি তাঁদের পর্যায় বিভাগ উল্লেখ করে আলোচিত হবে। দ্বিতীয়—মহাপ্রভুর জীবনই এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রয়োজন। তাই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে। ষড় গোস্বামী এবং গোস্বামী সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজির বিষয়সমূহ আলোচিত হবে না।

অতীন্দ্রিয় সাধনার পাঁচটি স্তর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর আবার দুই পর্যায়ে বিভক্ত। স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া বা রাগানুগা (spontaneous বা dynamic) অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরমভাব। এই পরকীয়াতত্ত্বই যে জয়দেবের রাধাতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব, এ সত্য আমরা 'জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বৈষ্ণব পদকর্তাদের উক্ত পঞ্চভাবাত্মক পদগুলি বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন, মাথুর, ভাব-সম্মেলন ও প্রার্থনা—এই পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। এই পর্যায়বিভাগ অনুসারে আমরা উক্ত পঞ্চস্তরের সাধনার আলোচনা করব।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফলগুচ্ছ।
স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞিঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়॥

বটু করে বেদধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায় ॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥

বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই ভক্তসাধক ছিলেন। আর এই সময় গে বৈষ্ণবসমাজে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনাও প্রচলিত ছিল। এর ফলে পদকর্তারা যখন যে ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন, সেই পর্যায়ের পদ তাঁদের লেখনী মুখে নিঃসৃত হত। বৈষ্ণব পদকর্তা ভক্তসাধক উদ্ধব দাস এখানে যুগপৎ দাস্য ও সখ্যভাবে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উক্ত পদটিতে বৈষ্ণবভক্তের দাস্য ও সখ্যভাবের সাধনার পরিচয় আছে। অখিল বিশ্বের আদি কারণ বিরাট পুরুষ আজ লীলার ছলে সামান্য রাখাল বেশে গোষ্ঠবিহার করছেন। তাঁর ভক্তগণ তাঁর গোষ্ঠলীলার সহচর। ভক্তগণ তাঁর দাস এবং সখা। এই অপূর্বভাবে আজ তাঁর লীলা চল্‌ছে। পদকর্তা তাঁর হৃদিবৃন্দাবনে বিরাট পুরুষকে এনেছেন, আর সেই সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা চলেছে। এই অপূর্ব ভাবকল্পনাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব।

বৈষ্ণবভক্ত এখানে দাস ও সখাভাবে ভাবিত হয়েছেন। তাঁর হৃদিবৃন্দাবনে বিরাট পুরুষ আজ সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বিশ্বরূপ ধারণ করে উপস্থিত হন নি। আজ তিনি ভক্তহৃদয়ে রাখাল-রাজ বেশে উপস্থিত। ভক্তসাধক কবি নিজেও একজন রাখাল হয়ে তাঁর লীলাসহচর। ভগবানকে ভক্ত আজ রাখাল-রাজ বেশ দিয়েছে। ফুলের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে, তাঁর মাথায় রাজছত্র ধরে আছে, কেহ বা চামর-ব্যজনে ব্যস্ত। কেহ দূত হয়ে রাখাল রাজের শক্তির বাণী প্রচারে নিয়োজিত। কেহ যুক্ত করে স্তোত্র পাঠে রত। কেহ রাজা বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বেদ পাঠে নিযুক্ত। আবার কেহ কেহ নৃত্যগীতে সভায় আনন্দবর্ধনে ধন্য।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরিমুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥

কহে শুন যাদুমণি তোরে দেব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর॥

পদকর্তা ভক্তসাধক ঘনরাম দাস এখানে বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই বাল্যলীলার এই পদটিতে বাৎসল্যভাবের সাধনার পরিচয় আছে। পরমব্রহ্ম আজ নন্দদুলালের রূপে অবতীর্ণ। ভক্তসাধক এখানে মাতা যশোমতীর রূপে উপস্থিত। ভক্তের মনোমন্দিরে যেভাবে পূজারতি চলছে, সেই ভাবটিতেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তরূপে এখানে মাতা যশোমতী এবং ভগবান এখানে নন্দদুলাল। উপাসনাছলে চলেছে এখানে গার্হস্থ্য ধর্মের খেলা। দধিমন্থনের শব্দ শুনে গোপাল এসেছে মায়ের কাছে। তার চাঁদমুখ দেখে অমনি মায়ের প্রাণ প্রাবৃটের কৃষ্ণমেঘ দেখলে ময়ূরের প্রাণ যেমন আনন্দে নেচে ওঠে, ঠিক তেমনি নেচে উঠল। মা তাঁর আদরের ছেলের চাঁদমুখে চুম দিলেন আর ক্ষীরননীর প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু নাচতে হবে এই চুক্তি। ছেলে তাতেই রাজি। নবনী খেতে খেতে আনন্দে ছেলেও নাচতে আরম্ভ করল। কাজভোলা মা আপন সখীদের নিয়ে আনন্দে করতালি দিতে দিতে প্রেমে বিভোর হয়ে পড়লেন।

এই রূপই ত হয়। ভগবানের খেলা দেখতে পেলে ভবের হাটের খেলা স্তব্ধ হয়ে যায়। আনন্দময়ের আনন্দের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে সঞ্চারিত হলে

যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ হয়, তার কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। বৈষ্ণব সাধকের এই সাধনার তুলনা হয় না।

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

এখানেও পদকর্তা যাদবেন্দ্র বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন বাল্যলীলার এই পদটিতে তাই বাৎসল্য ভাবের সাধনার পরিচয় আছে। সাধক কবি ভগবানকে এখানে ব্রজের রাখাল বালকরূপে সাজিয়েছেন, আর নিজে সেজেছেন যেন মাতা যশোমতী। রাখাল বালকরূপী শ্রীভগবান তাঁর অবোধ শিশু। তাই এই অবোধ শিশুটিকে গোষ্ঠে পাঠাতে তাঁর কতই না ভাবনা যিনি ত্রিজতের ভাবনা ভাবতে বিচলিত হন না, আজ ভক্তরূপী মাতা যশোমতী তাঁর চিন্তায় অতীব বিব্রত। কখনও তিনি পুত্রকে শপথ করতে বলছেন, আবা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের মাথায় পুত্রের হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন অতীন্দ্রিয় সাধনার এই অপূর্ব ভাবটি লীলাকীর্তনের অথবা কৃষ্ণযাত্রার মাধ্যমে চমৎকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অথবা বাংলা দেশের বৈরাগীর আখড়াতেও লোকায়ত ভাবটি আছে তার মধ্যেও এই অতীন্দ্রিয় সাধনার পরিচয় মেলে সেখানেও গোপালের সেবার মধ্যে বৈরাগীসম্প্রদায়ের সাধকসাধিকার মনোভা

মাতা যশোমতীর মনোভাবের সহিত তুলনীয়। ভগবান্ এখানে শিশুরূপে বর্ণিত হলেও ঐ শিশুর বাঁশীর সুরের সঙ্গে ভক্তরূপী 'মাতা'র সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। কবি এখানে সে ভাবটিও প্রকাশ করতে ভোলেন নি। কারণ ভগবানের বাঁশীর সুর যে একবার শুনেছে, সে যেভাবে থাকুক না কেন, ঐ সুর সে ভুলতে পারে না। তাই কোন-না-কোন প্রকারে ঐ বাঁশীর সুরের কথা সে প্রকাশ করবেই। বাঁশীর ঐ সুর তাকে যে-কোন দিকে আকর্ষণ করে, আর সে ঐ সুরে আত্মহারা হয়। বাঁশীর আহ্বানগীত তার অন্তরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। তাই বিশ্বকবি বলেছেন ঃ—

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন ;
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত। (এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা)।

ভক্তরূপী 'মাতা যশোমতী' এখানে ভগবানের এক অসহায় শিশু মূর্তির কল্পনা করেছেন। আর তার জন্য (ভক্তের) চিন্তার অবধি নাই। মহাভারতের চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই নাই। মহর্ষি ব্যাস-কল্পিত অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্তাদের অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের বিরাট ব্যবধান। বৈষ্ণবকবি এখানে অসীমকে সীমার মধ্যে এনে ছাড়েন নি, একেবারে অসহায় শিশু করে ফেলেছেন।

ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় যেখানে অর্জুন বলছেন,—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্বাং স্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥ ১১ শ ॥ গীতা
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্থাবর, জঙ্গমাত্মক বিবিধ প্রাণিবর্গ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদসনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখিতেছি। অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকলদিকেই আমি দেখিতেছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, অন্ত্য, মধ্য, কোথাও কিছু দেখিতে পাইতেছি না। কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিচ্ছন্ন তোমার অদ্ভুত মূর্ত্তি সর্বদিকে সর্বস্থানে আমি দেখিতেছি। তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই।'

মহাভারতের যুগ থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে বৈষ্ণবসমাজের চিন্তাধারার মধ্যেও বিরাট্ পরিবর্তন এসেছিল। ঐ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ভারতীয় অতীন্দ্রিয়তত্ত্বেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সাধনার পরিবর্তনের ফলে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের বাল-গোপালের মূর্ত্তি ধারণ করে বৈষ্ণবী সাধনার নবরূপ দিয়েছেন। এই নব রূপায়ণের ফলেই ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের সাধনার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বৈষ্ণবসমাজে।

ভারতীয় অতীন্দ্রিয়সাধনার চরম বিকাশ ঘটেছিল পরকীয়া বা রাগানুগা (Spontaneous or dynamic) তত্ত্বের মধ্যে। আর এই পরকীয়াতত্ত্বই যে শ্রীজয়দেবপ্রবর্তিত রাধাতত্ত্ব একথা আমরা বহুভাবে আলোচনা করেছি। এই রাধাভাবের সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন, মাথুর ও ভাব-সম্মেলন পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে। শান্তভাবের সাধনার বিশেষ পরিচয় আছে প্রার্থনা পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেথানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

সাধক-কবি চণ্ডীদাস এখানে পরকীয়াভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। পূর্বরাগের এই পদটি মধুর রসাশ্রিত। ভক্ত কবি ভগবানকে এখানে গ্রহণ করেছেন প্রেমিক পুরুষরূপে। এই প্রেমিক পুরুষটি তার প্রণয়ী। তিনি বৈধ পতি নন। কবি নিজে হয়েছেন তাঁর অর্থাৎ ঐ প্রেমিক পুরুষরূপী ভগবানের পরকীয়া পত্নী। অতি সঙ্গোপনে তাঁদের লীলা চলে। আড়ালে-আবডালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই যে লীলা এর তুলনা হয় না। ভগবানের বাঁশীর সুর ভক্তের কানের মধ্য দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে ভক্তকে আকুল করেছে। অতি অস্পষ্টভাবে ভক্তের মুখে তাঁর নাম গীত হচ্ছে। দেহ-মন-প্রাণ অবশ হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্যের বাঁধ আর থাকছে না। যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে—উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরে, গহনবনে অথবা অতল সমুদ্রে, মরুভূমিতে বা কুমারী মেরুতে—সেখানেই যাবার জন্য ভক্তের আকুলতা বেড়েই চলেছে। ভক্ত তাঁকে ভুলতে পারছে না ক্ষণিকের জন্যেও। তাঁকে পেলে যে কি করবে, কোথায় রাখবে, কিভাবে তাঁর সন্তুষ্টি সাধন করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু! কিন্তু পর মুহূর্তেই এই অনিত্য সংসার মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। নানা বাধা এই অনিত্য সংসারে। এখানে সংসার বুদ্ধিরূপা জটিলা এবং আসক্তিরূপা

কুটিলা প্রেমিকপুরুষরূপী ভগবানের কাছে যাবার পরম বাধা। প্রতিনিয়ত তাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ে আছে ভক্তের উপর। কোন মতেই তাদের চোখে ধূলি দিয়ে পালাবার পথ নেই ভক্তের। অথচ জড় সংসাররূপ স্বামী আয়ান ঘোষ ভক্তকে চরম সুখ দিতে পারে না। তাই শ্যাম-সুন্দররূপ চিরসুন্দরকে লাভ করবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে জাগে চরম আকুলতা। আর এই জন্য শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। শুধু ফাঁক খোঁজা। আর ওদের ফাঁকি দিয়ে অবশ মন নিয়ে কোন রকমে সংসারে থাকা। মন-প্রাণ সংসার ছেড়ে যেতে চায় কিন্তু উপায় নেই। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে ভক্তের অন্তরের ভাবটি ভক্তকবির লেখনীতে অতি সুন্দরভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। অতীন্দ্রিয়ভাবের চরম বিকাশ ত এইখানেই।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

ভগবানের রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি কৃষ্ণ, তিনি কালো, কালোবরণ। তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥১১॥ গীতা

—যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সূর্যের প্রভা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে।

এখানে কিন্তু সাধক কবি চণ্ডীদাস পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে তাঁকে অনন্ত রূপের পরিবর্তে সান্তরূপে নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদের চরম পরিণতি দিয়েছেন। অসীমকে সসীমে, অনন্তকে সান্তে, Ideal-কে Real-এ এনে আনন্দরস আস্বাদন করেছেন। এইভাবে আনন্দরস আস্বাদনই বৈষ্ণবভক্ত কবিদের বৈশিষ্ট্য। তাই মাধুর্যভাবের পরকীয়াতত্ত্বে বৈষ্ণবী-সাধনায় অতীন্দ্রিয়বাদের চরম বিকাশ লাভ করেছে।

চণ্ডীদাসের এই কবিতায় ভক্তের ঘর ছাড়া মনের পরিচয় মিলছে। ভক্তরূপী প্রেমিকা ভগবানরূপ প্রেমিক পুরুষের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল। সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় নি। অথচ সংসারের আকর্ষণ আদৌ নেই। ভগবদ্দর্শন না পাওয়ার জন্য অন্তরে যে বেদনা ভোগ করছে তা প্রকাশ করে অন্তরের বেদনা লাঘব করবারও পথ পায় না। ভক্ত হৃদয়ের এই অবর্ণনীয় বেদনা এখানে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। কোন দিকে মন নেই। আহারেও অনিচ্ছা। অন্তরে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে তার বৈরাগীর পরিধেয়ে। কালোবরণকে দেখবার জন্য যেদিকে কালো সেইদিকেই তার দৃষ্টি। কখনও কালো চুল খুলে তার মধ্যে কালোবরণ কৃষ্ণকে দেখছে। আবার পরমুহূর্তে কালো মেঘের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণকে দেখে হাসি-হাসি মুখে দুহাত তুলে মৃদু গুঞ্জনে কি বলছে। পরক্ষণেই ময়ূরময়ূরীর কণ্ঠে যে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ আছে অনিমেষনয়নে সেইদিকে চেয়ে দেখে। এমনি করেই যেখানে কালো সেখানে দৃষ্টি দিয়ে কালোবরণকে দেখবার আকুল প্রয়াস। বৈষ্ণবভক্ত কবির এই অতীন্দ্রিয় ভাবের সাধনার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণবভক্ত কবির কৃষ্ণরূপের কল্পনা বড় সুন্দর, বড় মধুর। যা অনন্ত, যা অগাধ, যা কল্পনাতীত, যা অব্যাখ্যেয়, যা দুর্নিরীক্ষ্য তাই কৃষ্ণ। অগাধ বারিধি কৃষ্ণ, অনন্ত আকাশব্যাপী কালোমেঘ কৃষ্ণ, সীমাহীন অন্ধকার কৃষ্ণ। যা আমরা বুঝতে পারি না, ক্ষুদ্র দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পাই না অথচ সত্য—তাই কৃষ্ণ। এই বিরাট বিশ্বের গাঢ় কৃষ্ণশ্যামবর্ণকেই কৃষ্ণরূপে, শ্যামসুন্দররূপে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় বৈষ্ণবসাধকেরা। আর বৈষ্ণবকবির লেখনী-মুখে নিঃসৃত হয়েছে সেই অমৃতনির্ঝর। কৃষ্ণের রূপ ও শিখিপুচ্ছচূড়া প্রসঙ্গে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র লিখেছেন :—

'The Vaisnavas have tried to interpret the dark blue in a metaphysical way, as is the wont of the Hindus, disregarding

the obvious historical facts. This, they say, is the pervading colour of the universe, of the azure, of the sea and generally speaking of the landscape. As the main colour of the universe this has been, they say, made the symbol of the Diety. There is a crown of peacock feathers on the head of Krishna which indicates a combination of other colours, that decorate the main dark blue of the world. Others seem to maintain that the dark colour symbolises the mystery which enshrouds the unseen and the unknowable. Hence it is sacred with the Vaisnavas.—Vanga Sahitya Parichaya Part 1, Introduction P.47.

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল,
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তই অও পসারএ পাঁখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
সে শুনি মুহু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচ বাণ॥
তনু—পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈখন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু-বলয়া ভাগু॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল না যায়।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
শ্যামসুন্দর কায়॥

সাধক কবি বিদ্যাপতি এখানে পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সার্থক পরিণতি দিয়েছেন। ভক্তকবি ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের অনন্তরূপ এখানে অনুপস্থিত, তার পরিবর্তে তিনি শান্তরূপে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত। এখানেও সেই জটিলাকুটিলা। জড় সংসাররূপ স্বামী আয়ান তাঁকে আদৌ সুখ দিতে পারে না। তাই সংসারে থেকেও নেই। মন পড়ে আছে প্রাণবঁধুর দিকে। কিন্তু উপায়! পথ মিলছে না। সদা ভয়। পাছে লোকে কিছু বলে। চারিদিকে লোকের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তবে ত প্রাণবঁধুকে প্রাণ ভরে দেখে নিতে হবে। কিন্তু কই সে সুযোগ। হায় রে সংসার! এখানে ভক্তিপথের বহু বাধা। যেখানে সকলে অসার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সংসার ছাড়া আর কিছু ভাববার যেখানে বিন্দুমাত্র অবসর নেই, অর্থ ই যেখানে একমাত্র কাম্যবস্তু, আর সেই অর্থের জন্য যে কোন কাজ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না, মনেও ভাবে না যে—অর্থ সঙ্গে আনে নি অথবা অর্থ সঙ্গে নিয়েও যেতে পারবে না, তবু যে-কোন প্রকারে অর্থ লাভে সচেষ্ট। সেখানে কেহ যদি সাধনমার্গে চলতে চেষ্টা করে, তবে সেই ভিন্নপথের পথিককে নানা বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত হতেই হবে। তাই ভক্তের সদা এই ভয়ভাব। লোকভয় সত্যই ভক্তিপথের বড় বাধা।

অথচ—অথচ ভক্তের গন্তব্য পথই ঐ ভক্তিপথ। যে কোন প্রকারে ঐ পথে যেতেই হবে। তাই লুকোচুরির আশ্রয়। এ ছাড়া সংসারে আর উপায় কি! রাধারূপী ভক্তের তাই বড় সমস্যা। প্রাণবঁধু কৃষ্ণকে দেখবার জন্য প্রাণে এসেছে আকুলতা। কিন্তু বাধা লোকভয়। চোখ শাসন মানে না। প্রতি তৃণে, গুল্মে, পত্রেপল্লবে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাচ্ছে। অথচ সংসার বন্ধন ছেদনের উপায় নেই। এই টানাপোড়েনে প্রাণ কণ্ঠাগত। লোকলজ্জার ভয়ে প্রাণভরে পৃথিবীর শ্যামশোভার মধ্যে শ্যামসুন্দরকে দেখবার উপায় নেই। পাছে কেউ আকুল চোখের দৃষ্টি দেখে ফেলে। এই ভয়ে ভক্ত আপন মুখখানা নিচু করে রাখে। কিন্তু যে চোখে একবার শ্যামরূপ দেখেছে অনন্ত শ্যাম শোভার মাঝে সে চোখ বাধা মানবে কেন। চকোর যেমন চাঁদের সুধা পান করবার জন্য ছুটতে থাকে, ভক্তের চোখ দুটিও ঠিক তেমনি প্রাণবঁধুর শ্যামরূপ দেখবার জন্য চারিদিকে ছুটতে থাকল। কিন্তু সেই জটিলা-কুটিলার ভয়, ভয় সেই লোকলজ্জার। সংসারে নানা বাধা। ভক্ত কিছুতেই ভগবানকে ভাববার

সময় পায় না, তথাপি ভগবানের জন্ত তার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। মাঝে মাঝে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভগবানের বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়, আর তখনই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁন্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

ভক্তকবি জ্ঞানদাস এখানে পরকীয়াভাবে ভাবিত হয়েছেন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটি অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাধাভাবে ভাবিত কবির পূর্ণ আত্মসমর্পণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। কবির অন্তরে অন্তরময়রূপে ভগবান্ বিরাজিত। তাই পার্থিব জগতের সর্বত্র তিনি শ্যামসুন্দরের শ্যামরূপ দেখছেন। দেখে তাঁর আশ মিটছে না। আনন্দাশ্রু উপচিয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না বলে প্রাণ তাঁর অস্থির। ক্ষণে ক্ষণে দর্শন ও স্পর্শের আশায় তাঁর শরীর এলিয়ে পড়ছে। কখন কখন তিনি ভগবানের হাসিমুখখানি যেন তাঁর সমুখে দেখতে পাচ্ছেন। গুরুজনদের কাছে থেকেও তাঁর হুঁশ নেই, তাই মাঝে মাঝে তাঁর দেহে অকারণ

অবারণ পুলকের সঞ্চার হয়। নয়নে আনন্দাশ্রু আসে। পুলক ও অশ্রু গোপন করবার জন্য তিনি কত চেষ্টাই না করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের অগোচরে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এই ভাবান্তরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কতই না আলোচনা করেন। ভক্ত তাতে লজ্জা পান না।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥
কি ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

সাধক কবি চণ্ডীদাসের এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মভাবের কথা প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ক অতীব আশ্চর্যজনক। উভয়ের প্রাণ একসূত্রে বাঁধা, মুহূর্তের অদর্শনও ভক্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—অত্যন্ত নিকটে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। ভক্ত ও ভগবানের এ এক আশ্চর্য প্রেম। প্রেম রসাস্বাদনের এক অদ্ভুত নিদর্শন। কবিরা সূর্য ও কমলের ভালবাসার কথা বলে থাকেন বটে, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের তুলনায় সে ভালবাসা কিছুই নয়; কারণ শীতের সময় পদ্ম যখন মরে যায়, সূর্য তখনও দিব্য সুখে থাকে। যে প্রেম একজন আর একজনের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নিতে পারে না, সে প্রেমের সঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের

প্রেমের তুলনা হতে পারে না। মেঘ ও চাতক, পুষ্প ও ভ্রমর, চাঁদ ও চকোর —এদের সম্পর্ক সাময়িক, নিত্যকালের নয়। তাই এদের প্রেমে দুজনের সমান আগ্রহ নেই। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক নিত্যকালের। তাই সর্বব্যাপী ভগবানের অত্যন্ত কাছে থেকে, সর্বত্র তাঁর অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করে, বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। রাধাভাবে ভাবিত বৈষ্ণবভক্তের এই প্রেমের নিদর্শন অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সারকথা। এই অপার্থিব প্রেমের গুহ্যতত্ত্ব অবর্ণনীয়।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনমি অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ (বিদ্যাপতি কহ ?) প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক।

বিদ্যাপতির এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাতীত। এ প্রেম জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না, আবার পুরাতনও হয় না; পরন্তু প্রতি মুহূর্তে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। যে প্রেম ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, যে প্রেম চিরনবীন চিরনূতন—সে প্রেমের স্বরূপ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য; অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের ইহাই চরম ভাব। ভগবান চিরনবীন চিরসুন্দর। তাই তাঁর রূপ নয়নভরে দেখেও দেখার তৃপ্তি হয় না, প্রতিনিয়ত

দেখবার আশা জাগে মনে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র প্রতিনিয়ত যে ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে, তার মধ্যে তাঁরই মধুর স্বর ভক্তের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়। সেই স্বরের এমনি মোহিনীশক্তি যে, জীবনভোর সেই স্বর শুনলেও শোনার আশ মেটে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ভগবানকে হৃদয়ে রেখেও অর্থাৎ ভগবানের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মূদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণি মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের এক অপূর্ব ভাবময়তার সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের বাঁশি যে কখন বাজবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোন সময়ে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বাঁশি বাজতে পারে। তখন আর প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাবে না। সেই না-প্রস্তুতি অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোন শিক্ষা না থাকলে তখন সমূহ বিপদ আসে। তাই সেই অসতর্ক মুহূর্তের জন্য সাবধানী ভক্তের প্রস্তুতি চলছে। যদি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে হয়, তবে সেই পথের কণ্টকে পদতল ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সেইজন্য যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই ভক্ত আঙিনায় কাঁটা পুঁতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস

করছে। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে যদি চলতে হয়, তাই ভক্ত নিজ আঙিনায় জল ঢেলে পিছল করে রাত্রি জেগে চোখ বুজে চলার সাধনা করছে। যদি সেই আঁধার রাতে সাপে কামড়ায়, তাই সাপের সম্মুখে পড়লেও সাপ কোন প্রকার ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য সাপের ওঝার কাছ থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করছে। ভক্তের এই ভাব দেখে গুরুজনে যদি কোন কথা বলে তবে সে তাহা শুনেও শোনে না—যেন সে কালা। সে যে সত্যই কালা এমন ভাব দেখাবার জন্য কখন কখন এক কথার অন্য উত্তর দেয়। অন্য পরিজন যদি ভক্তের এই ভাব দেখে কোন কথা বলে তবে সে বিহ্বলের মত হাসতে থাকে। এমন ভাব দেখায় যেন সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চার আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ (পদ কম্পিত ?) পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতেও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে অভিসার-অন্তে ভক্ত ভগবানের নিকট স্বতঃ-

উৎসারিত মনোভাব নিবেদন করছে। সাধনার দুর্গম-পথে চলতে ভক্তের যে চরম দুরবস্থা ঘটেছিল, ভগবানের পায়ে সেই অবর্ণনীয় দুঃখের সামান্যতম অংশ নিবেদন করে সে শান্তিলাভ করতে চায়। শান্তিলাভের সেই ত প্রকৃষ্ট পথ। ভক্ত একথা ভালভাবেই জানে। আর জানে বলেই সে অকপটে ভগবানের পায়ে তার হৃদয়ভরা দুঃখ নিবেদন করছে।

ভগবানের দর্শন আশা মনে জাগলে পার্থিব সুখদুঃখের কথা আর মনে স্থান পায় না, সংসার অসার বোধ হয়। কঠিন দুঃখভোগের পরে ভক্তের মনোমন্দিরে ভগবানের সঙ্গে তার যে মিলন হয়, সে মিলনের আনন্দ অবর্ণনীয়। জীবনের অনন্ত দুঃখ সেই মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। অতীন্দ্রিয়ানুভূতির এই ত চরম প্রকাশ।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ান ঝরয়ে লোর।
গদগদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রহি আনন্দ-রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল॥
চরণ-কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি-মুখ-শশী হরি-চকোর।
হেরিতে চমক গলয়ে লোর॥
হৃদয় উপরে পুতল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥

প্রেমদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত মান-এর এই পদে রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত ভগবানের নিকট যে কত প্রিয় কত আপন—যেন অভিন্ন—তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবান বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক ও অভিন্ন এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। অতীন্দ্রিয়বাদীর মনে সব সময় 'সঃ অহম্, অহম্ সঃ'—এই ভাবটি

জাগ্রত থাকে। তার ফলে তার মন থেকে 'তিনি—আমি'র দূরত্ব দূর হয়ে মনে একীভাব আসে। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মিলনপ্রয়াসী। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে এই মানস-মিলন এখনও সম্ভব হয়নি। তাই ভক্তের হয়েছে দারুণ অভিমান। সংসারে এরূপ অভিমানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমান সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই মানভঞ্জন যে কত রকমে হয়, কাব্য-সাহিত্যে সব সময় তার পূর্ণ বিবরণ থাকে না। অবশ্য আমাদের আলোচ্য ভগবানের প্রতি ভক্তের এই অভিমান সম্পূর্ণ মানসজ—এবং ইহাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের মৌলভাব।

ভাবটি এইরূপ। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য ভক্ত অস্থির। কিন্তু অস্থির হলে কি হয়। সময় না হলে ত তাঁর সঙ্গে মিলন হতে পারে না। ভক্ত তা বোঝে না। তাই এই অভিমান। পরে যখন তার সজাগ-মনে-পাতা-আসনে ভগবানের আবির্ভাব হল, তখন ভক্তের দারুণ অভিমান। তাই ভগবানের আবির্ভাবে সাড়া দিল না ভক্ত। তখন ভক্তকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান্ তার পায়ে ধরলেন। এ যেন নিজের পায়ে নিজে হাত দিলেন। এই ত—'সঃ অহম্, অহম্ সঃ'। ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভগবানকে মনোবেদীতে বসাল। এখানে জয়দেবের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান। শ্রীগীতগোবিন্দে আমরা পাই—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম। ॥ ৯ ॥ ১০ম সর্গ

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥
অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব
হাম অতি অলপ পরাণ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াওলি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ॥

সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পায়ে সোপলুঁ পরাণ ॥
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদ গদ
হেরইতে রাই বয়ান ॥

গোবিন্দদাসের এই পদটি প্রেমদাসের উপরিউক্ত পদটির ঠিক পরিপূরক। মধুর রসাশ্রিত মান-এর এই পদে অতীন্দ্রিয়ভাবটি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেছে। তাই এখন ভগবানের সেবায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ-এর পালা। কতভাবে এই সেবা। এই সেবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত। ভক্তের একমাত্র কামনা—'যেন তোমার সেবায় রত থাকতে পারি।' এখানে রূপে-অরূপে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।' ভক্ত এখানে ভগবানের সাকার রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের উপাসনায় রত। তাই সুবাসিত বারির দ্বারা তাঁর চরণযুগল ধুয়ে স্বীয় কেশ দ্বারা মুছিয়ে দিচ্ছে। আপন অভিমানের কৈফিয়ৎ দিতে সে বলছে যে, তিনিই তার গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে তাঁর উপর অভিমান করেছিল। এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে তাই ক্ষমা চাইছে,—যেন শ্যামসুন্দর ক্ষমাসুন্দর চোখে তার দিকে দৃষ্টি দেন। আশা আছে ক্ষমা পাবেই সে।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

মধুর রসাশ্রিত আক্ষেপানুরাগের এই পদটিতে দ্বিজ চণ্ডীদাস অতি নিপুণভাবে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ভগবানের বংশীধ্বনি ভক্তের কানের মধ্য

দিয়ে মর্মস্থলে প্রবেশ করলে ভক্ত যে কিরূপ ভাববিহ্বল হয় সাধক কবি চণ্ডীদাস এখানে তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভাববিহ্বল ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য কি না করতে পারে। ভগবৎ-সান্নিধ্য, ভগবৎ-প্রেম লাভের আশায় ভক্ত তার স্বভাব-সংস্কার, আচার-আচরণ এবং এমন কি প্রকৃতির আইন-কানুন পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে তার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়। এর পরেও যখন তাঁর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়, শুধু তখনই ভক্তহৃদয় ব্যথায় ভরে যায়। ভগবৎ প্রেমের স্রোতে ভাসমান ভক্ত কূল না পেয়ে তখন অতি অসহায় ভাবে ভেসে চলে। ভগবানকে না পাওয়ার বেদনায় মাঝে মাঝে তার শ্যাম-সমান মরণকে বরণ করতে সাধ হয়।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা-অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।

চণ্ডীদাস কয় পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

মধুর রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদে চণ্ডীদাস অতি চমৎকার ভাবে অতীন্দ্রিয়ভাবের সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া—যে কোন ভাবে এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। নারী যেমন করে তার দয়িতের পদে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করে—কিছুমাত্র ফাঁক রাখে না—এখানে ভক্ত ভগবানের পায়ে ঠিক সেইরূপে আত্ম সমর্পণ করেছে। ভগবদ্ ভক্ত এখানে মুক্তিপ্রয়াসী নহে। তা ছাড়া বৈষ্ণব ভক্তেরা মুক্তি প্রয়াসী হয়ও না। একটি গানের কথা এখানে মনে আসছে। এক বৈরাগীর আখড়ায় অবস্থানকালে গানটি শুনেছিলাম অনেকদিন আগে। কবির নাম বা পূর্ণ গানটি আজ আর মনে নেই। তবু যেটুকু মনে আছে এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি; গানটির ঐ অংশে আছে—

মুক্তি চাই না হরি (আমি মুক্তি চাই না)।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভালো
দেখিলাম চিন্তা করি (আমি মুক্তি চাই না)॥

বৈষ্ণবভক্ত শুধু মৃত্যুর প্রান্তে নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে প্রাণপ্রিয় বলে মনে করে। তার এই মনোভাব শুধু এক জন্মের জন্য নয়। চক্রের আবর্তনের মত যতবার এই পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করবে ততবারই ভগবান্ তার একমাত্র প্রিয় এই আশাই তার মনে বাসা বেঁধে আছে। ভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতীত ভক্তের বাঁচবার কোন আশ্রয় নেই। কারণ ত্রিজগতে তার আপন বলতে আর কেউ নেই। ভগবানের বিচ্ছেদ মুহূর্তের জন্যও অসহনীয়। তাই তার একমাত্র প্রার্থনা—তিনি যেন তাকে মুহূর্তের জন্য চরণ ছাড়া না করেন।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

মধুর-রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদটিতে জ্ঞানদাস অপূর্ব অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুই প্রকারেই এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের সেই ভাবটি ভক্তের মনোমধ্যে এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের অতি প্রিয় বলে ভক্তের মনে যে একটি নিরীহ গর্বের ভাব থাকে, এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে। ভগবদ্ পাদপদ্ম ছাড়া ভক্তের অন্তরে আর কিছুর ঠাঁই নেই। ভগবানই ভক্তের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এমন কি নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয়তর। শয়নে স্বপনে ভগবদ্ প্রেম উপলব্ধিই ভক্তের একমাত্র কর্ম।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

মধুর রসাশ্রিত মাথুর পর্যায়ভুক্ত এই পদটি বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। এখানেও কবি অতি সুন্দর অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলার কালে কখনও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভক্তের

মন থেকে ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তারপর যখন ভক্ত-হৃদয়ে সম্বিত ফিরে আসে, তখন সে উপলব্ধি করে—তার হৃদয়স্থিত ভগবানের আসনখানা শূন্য। হৃদয়ভরা অনন্ত দুঃখ তখন তার অসহনীয় হয়ে ওঠে। সুন্দর পৃথিবীর সকলেই আনন্দিত, কিন্তু তার হৃদয়ের ধন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পালিয়েছেন বলে তার হৃদয় শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সেই শূন্যতার ভার তার কাছে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। ভগবানের মধুর স্পর্শ-বিনা তার কিভাবে সময় কাটবে, কতক্ষণে আবার ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে তার হৃদয়ে সেই চিন্তায় ভক্তহৃদয় আকুলিত।

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল॥

চণ্ডীদাসের এই পদটি অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম নিদর্শন। মধুর-রসাশ্রিত ভাব-সম্মেলনের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ভক্ত-হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন—শুধু তার অন্তরের আকর্ষণ যাচাই করবার জন্য। যাচাই করে তিনি দেখেছেন যে সে হৃদয়ে একমাত্র তাঁরই স্থান। তাঁর অদর্শনে সেখানে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে, আর সুদক্ষ নাবিকের মত ভক্ত হাল ধরে আছে। বিশ্বাস তার—কূল পাবেই। আজ যে তিনি অনুকূল হয়েছেন,

আজ যে তার শূন্য হৃদয় ভরে যাবে তাঁর আবির্ভাবে পূর্বাহ্ণেই ভক্ত তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে আনন্দের বার্তা আসছে, তা প্রকাশের অতীত। চারিদিকে সে নানা শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। অতীন্দ্রিয়-বাদীর এই আনন্দ শুধু মরমীরাই বুঝতে পারে।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাঞ্জু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
তুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

বিদ্যাপতির এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত ভাবসম্মিলনের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ মিলনের পন্থাটি অতি চমৎকাররূপে প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের দেহই মঙ্গল-আচারের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। দেহ-মন্দিরই ভগবানের অধিষ্ঠানের পরম ধাম। মানুষের তৈরী মন্দির ভগবানের উপযুক্ত স্থান নহে। অন্ততঃ অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নহে। ভক্তের অঙ্গই বেদী। সে তার কেশ দিয়ে সে বেদী ঝাঁট দিবে। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই মিলন বর্ণনাতীত। এ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের পুনরাবির্ভাবে ভাবোল্লাসের সুন্দর চিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

শান্ত-রসাশ্রিত এই পদে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্মের উন্মেষপর্বে এই জাতীয় সাধনাই ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ও পথ। এই পথেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ ঘটে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ভগবানের সামীপ্য লাভই যে বৈষ্ণব ভক্তের একমাত্র কাম্য, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই জাতীয় সাধনার ধারা পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে ক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় পরিণতি লাভ করেছিল, "জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব" প্রবন্ধে তা আলোচনা করেছি। বৈষ্ণবী সাধনার এই প্রথম ধারাটি সর্বশেষে আলোচনার কারণ—বৈষ্ণব মতের ভাব-পরিবর্তন। এটি এখন সাধনার অঙ্গীভূত না হয়ে বৈষ্ণবভক্তের প্রার্থনায় পরিণতি লাভ করেছে। 'যেন সেবায় রত থাকতে পারি'—এই আকুলতাই এই জাতীয় প্রার্থনার ভাবসত্য। ভক্ত তিল তুলসী দিয়ে নিঃস্বত্ব হয়ে ভগবানকে তার দেহ-মন-প্রাণ দান করছে। 'তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি'—এই ভাবই এখন ভক্ত মনে বাসা বেঁধেছে। দিবারাত্র সেই ভাবেই সে এখন চলতে চায়। শুধু সেবা আর সেবা এই তার কাম্য। বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটি এর মধ্যে এই ভাবে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী' (চয়ন) ৩য় সংস্করণ থেকে উক্ত পদগুলির পাঠ গৃহীত হয়েছে ॥

॥ ৬ ॥

অতীন্দ্রিয়বাদের রূপান্তর—প্রথম পর্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতগ্রন্থে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

চণ্ডীদাস গেয়েছেন,

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
ইহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন দেশে॥

মধুর রসাশ্রিত পরকীয়া পর্যায়ভুক্ত বংশী শিক্ষার এই পদে চণ্ডীদাস একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, আবার একটি ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ভক্ত ও ভগবান জীবাত্মা ও পরমাত্মা, real ও ideal-এর এক নিগূঢ় সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে এর মধ্য দিয়ে। একদিন নিরালায় শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর মত:

বাজাতে শিখতে চাইলেন। ইচ্ছা তাঁর—যে বাঁশী তাঁকে ঘর ছাড়া করেছে সেই বাঁশী বাজিয়ে তিনিও প্রাণকৃষ্ণকে কাজ-ভোলা করে তাঁর কাছে বেঁধে রাখবেন। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীমতীর মনোভাব বুঝতে পারলেন। বাঁধা থাকতে তাঁরও আপত্তি নেই। তাই তিনি শ্রীমতীকে তাঁর মত করে বেশভূষা করতে এবং তাঁর মত ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে বললেন। তা না হলে তাঁর বাঁশী তো বাজবে না। তাঁর রাধা নামের সাধা বাঁশীর বৈশিষ্ট্যই যে এই। শ্রীমতী আর কি করেন, অগত্যা তাঁকে তাই করতে হোলো। শ্রীমতী দিলেন তাঁর নীল শাড়ী শ্রীকৃষ্ণকে আর শ্রীকৃষ্ণ দিলেন তাঁর পীতধড়া ও চূড়া শ্রীমতীকে পরবার জন্যে। বেশভূষা বিনিময়ের পর শ্রীকৃষ্ণের মত করে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজাতে লাগলেন। কিন্তু তাকি হয়। যে বাঁশীর সুরে বিশ্ব বিমোহিত, তার মূলে বাঁশী তো নয়--তার মূলে ঐ বাদক। ঐ বাদকের গুণেই তো ঐ সুর বাজে। নইলে বাঁশী তো শুধু বাঁশীই। শ্রিমতি তাই বাঁশীতে তেমন মন ভোলানো সুর তুলতে পারলেন না। দূর নিকুঞ্জ বনে ফুলচয়ে অবচয়ি সখীরা ফিরে আসছিলেন কুঞ্জ-কুটিরে। এমন সময় শ্রীমতীর সেই বাঁশী শুনলেন তাঁরা। শুনেই অমনি পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—আজ কে এই বাঁশী বাজায়। এতো শ্যামের বাঁশী নয়। এ সুর তো সে সুর নয়। আবার এরূপ তো সে রূপ নয়। সে কালো আর এ গোরা। গোরা তো কালা নয়। তবে এ কে ?

সব শেষে চণ্ডীদাস ইঙ্গিত দিয়েছেন,—'এরূপ হইবে কোন দেশে।' এইভাবে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আগমনী গান গেয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে নবদ্বীপে গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে চণ্ডীদাসের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। কবিকল্পনা হোলো সত্যে পরিণত। আবার মহাপ্রভুর মধ্যে রাধাভাবের যে পূর্ণ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাতে বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হোলো। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।

সেইভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥ অন্ত্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

বাঙলা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥ ৪অঃ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ ৪ অঃ ॥

হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি, অর্থাৎ দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই ॥ ৭ ॥ সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্বৃত্তগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৮ ॥

ধর্মের দুটি দিক আছে। তার মধ্যে একটি ব্যবহারিক দিক, অপরটি আধ্যাত্মিক দিক। কৃষ্ণ অবতারে দুটি দিকের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছিল। ব্যবহারিক দিকে তিনি পাণ্ডবগণকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে রাজসূয় যজ্ঞ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটিয়ে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মরাজ্যে তিনি মানবকে শাশ্বত কর্মের আদর্শ দেখিয়ে নিত্যপথের সন্ধান দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্মযোগ', চতুর্থ অধ্যায়ে 'জ্ঞানযোগ' এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ'-এর মধ্যে এই নিত্যপথের সন্ধান আছে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতাবর্ণিত ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক।

ভারতে এই সময় হিন্দুধর্মের বহুমত প্রচলিত ছিল। কিন্তু যে যোগধর্ম প্রাচীন আর্যঋষিদের একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল, তাহা এই সময় লোপ পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তারই পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। কর্মের মাধ্যমে জীবকে জ্ঞান ও ভক্তির পথে চালিত করতে তাঁকে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। আধুনিক কালের নিট্‌স্-এর যুদ্ধবাদ থেকে টলষ্টয়-এর বিশ্বপ্রেম পর্যন্ত সকল তত্ত্বই গীতাতত্ত্বের মধ্যে বর্ণিত আছে। বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট ও মহাপ্রভুকেও অবতার বলা হয়, কিন্তু এঁদের জীবনধর্মের মধ্যে ধর্মের একটি দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা হোলো—উহার আধ্যাত্মিক দিক। মানবকে ধর্মপথে চালিত করে মানবমঙ্গল সাধনই তাঁদের জীবনের ব্রত ছিল।

বাঙলা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ ইঙ্গিতের পরিচয় দেয়। এই সময় এদেশে ইসলামী শাসনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। হিন্দুসমাজ তখন ধর্মের নামে কুসংস্কার, অনুদারতা ও আচারের বন্ধনে ধ্বংসের পথে চলেছিল। হিন্দুধর্মের স্বরূপ, উহার উদারতা যেন লোকচক্ষুর সম্মুখ হতে অন্তর্হিত হয়েছিল। হিন্দুর জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল বাঙলার মাটিতে। তাঁর আবির্ভাবে বাঙলার

আকাশ থেকে দুর্দিনের কালোমেঘ অপসারিত হয়েছিল। বাঙালীর জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে নূতন স্রোতে প্রবাহিত হোলো। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিতে নূতন জোয়ার এলো।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙালী কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেল। বাঙালীর প্রাচীন সংস্কৃতির নব রূপায়ণ হোলো। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম আচারের গণ্ডী অতিক্রম করে জাতিভেদ দূরে সরিয়ে দিয়ে বাঙলা দেশের বুকে প্রেমের বন্যা এনে দিল। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁর ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে অতি পাষণ্ডও মহাপ্রভুর পদতলে আশ্রয় নিল। মহাপ্রভু "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।" তিনি প্রচার করলেন,—

নীচ হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥

মহাপ্রভুর জীবন-কথা নিয়ে সর্বপ্রথম চরিতগ্রন্থ রচিত হয়। বাঙলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ চরিত-গ্রন্থ এর পূর্বে রচিত হয় নি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির যেমন নব রূপায়ণ হয়েছিল, তেমনই বাঙলা সাহিত্যের এক নূতন দিক আলোকিত হয়েছিল। মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৪) বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের ফলে বাঙলা দেশে উহার যে প্লাবন এসেছিল সেই প্লাবনে বাঙলার নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপ (দবীর খাস)—(১৪৮৯-১৫৬২) এবং সনাতন (সাকর মল্লিক) (১৪৮৮-১৫৫৮) ভেসে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু তাঁদিগকে বৃন্দাবনে থেকে ভক্তিধর্ম প্রচার করতে আদেশ দিয়েছিলেন। পরে তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীও তাঁদের অনুসরণ করেন। গোস্বামীরা বৃন্দাবনে থেকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। মহাপ্রভু তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনকালে বাঙলা দেশ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যকে বহুদূর অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু আটটি মাত্র শ্লোক রচনা করেন। এই আটটি শ্লোক এবং তাঁর জীবনই এক বিরাট মহাকাব্য। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক বৈষ্ণবধর্মের মর্মকথাই প্রচার করে।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ ৩ ॥ ২০ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিতামৃত।

—যাহা চিত্তের বিবিধ দুর্বাসনাসমূহকে বিনাশ করে, যাহা সংসার তাপসমূহ নির্বাণ করে, যাহা সর্বপ্রকার মঙ্গল প্রদান করে, যাহা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহা আনন্দসমুদ্রকে বর্ধিত করে, যাহা প্রতিপদেই সকল রসের আস্বাদন কারণ হয় ও যাহা মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি দান করে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছে ॥ ৩ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৪ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—ভগবান নিজ নামসমূহের অনেক প্রকার প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে নিজ শক্তি সকল অর্পণ করিয়াছেন, সেই নাম স্মরণে সময়ের নিয়ম করেন নাই। হে ভগবন্! এইরূপ তোমার কৃপা, কিন্তু আমার এইরূপ দুর্দৈব যে ঐ নামে অনুরাগ জন্মিল না ॥ ৪ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৫ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং পরের মান দিয়া হরিসঙ্কীর্তন করিবে ॥ ৫ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৬ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—হে ঈশ্বর, স্বর্ণরত্নাদি ধন, ভৃত্যাদি জন ও সুন্দরী স্ত্রী, কিংবা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কিছুই তোমার নিকট প্রার্থনা করি না; কিন্তু হে ঈশ্বর! তোমাতে আমার জন্মে জন্মে ফলানুসন্ধান রহিত ভক্তি হউক—এই প্রার্থনা করি ॥ ৬ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষয়ে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৭ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—হে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ, বিষম সংসার সমুদ্রে পতিত কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মপরাগতুল্য জ্ঞান, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের দাস কর ॥ ৭ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—(হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ) তোমার নাম করিলে কোন্ কালে আমার নয়ন দুইটি অশ্রুধারায় ব্যাপ্ত হইবে, মুখ গদ গদ স্বরে রুদ্ধ বাক্যে ব্যাপ্ত হইবে ও দেহ পুলকে ব্যাপ্ত হইবে ? ॥ ৮ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎসর্বম গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৯ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার (রাধার মত) এক মুহূর্ত যুগের মত হইয়াছে, চক্ষু বর্ষার মত হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে ॥ ৯ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।

যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥ ১০ ॥ ঐ। ঐ।

—সেই কৃষ্ণ চরণসেবানিরতা কিঙ্করী আমাকে (রাধার মত) আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, বা দর্শন না দিয়া আমাকে মনঃপীড়া দেন, অথবা কামুক তিনি যথেচ্ছা বিহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে ॥ ১০ ॥

মহাপ্রভুর এই শ্লোকগুলির মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের মূল স্বরটি নিহিত আছে। আর মহাপ্রভুর জীবনে বিশেষতঃ তিরোধানের পূর্বে নীলাচলে অবস্থিতিকালে তাঁর কর্মে ও মর্মে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছিল। রাধাভাবে ভাবিত ছিলেন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সময় থেকে। কিন্তু এই ভাবের ক্রমবিকাশ ও তার পূর্ণতা তাঁর জীবনে যেমন পরিদৃষ্ট হয়েছিল, পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে ঠিক সেই ভাবটিই প্রকটিত হয়। মহাপ্রভু ও পরমহংসদেবের জীবন তাই কবিত্বময়। আর এই কবিত্বময়তার মধ্যেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব সুপরিস্ফুট।

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন ও প্রেরণার ফলে একটি বিশাল চরিত-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বহু ভক্ত মনীষী চৈতন্যের জীবনচরিত অবলম্বন করে গ্রন্থ লিখেছেন। এই সব চরিতগ্রন্থ থেকে যে শুধু চৈতন্যদেবের জীবনী জানতে পারা যায়, তাই নয়। সমসাময়িক অনেক ঘটনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই কারণে চরিতগ্রন্থগুলি অমূল্য গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এদের মধ্যে (১) কতকগুলি অপূর্ব কাব্য সম্পদসম্পন্ন

অর্থাৎ সেগুলিতে কাব্যের দিকে বেশী মনোযোগ (emphasis) দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কল্পনার প্রাচুর্যে অনেক সময়ে ইতিহাস যে চাপা পড়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। (২) কতকগুলি জীবনচরিতে দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখা যায় অর্থাৎ ইতিহাস অপেক্ষা তত্ত্বালোচনার দিকেই লেখক বেশী মনোযোগ দিয়েছেন (৩) কয়েকখানি জীবনচরিত সঙ্গীত হিসাবে জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপে লিখিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থে পাঁচালি ও ধামালির দিক দিয়ে চরিতাখ্যান গ্রথিত হয়েছে।

সমস্ত চরিত গ্রন্থই চৈতন্যদেবের ভক্তগণ দ্বারা লিখিত। লেখক ঘটনা বৈচিত্র্যের দিকে বা তাদের সত্যতা নির্ধারণের প্রতি মনোযোগ দেন নি। শুধু ভক্তির যাদুস্পর্শে গ্রন্থগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। তাই বলে যে সেগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই, এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই।

জীবনচরিতগুলির পরস্পরের মধ্যে বহু অমিল আছে। তার কারণ—প্রায় সকল লেখকই নিজের স্মৃতিশক্তি বা অপরের নিকট শোনা কাহিনী অবলম্বন করে গ্রন্থ লিখেছেন। আবার অনেক লেখক ঘটনা পারম্পর্যের প্রাধান্য না দিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। এসব পার্থক্য ভক্তের নিকট তুচ্ছ হলেও অভক্তের নিকট তুচ্ছ নয়।

উল্লেখনীয় চরিতগ্রন্থ:—১। মুরারি গুপ্তের কড়চা, ২। নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ ও অন্যান্য সমসাময়িক পদকর্তার গান, ৩। কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৪। রূপ গোস্বামীর কড়চা (দুষ্প্রাপ্য) ৫। স্বরূপ দামোদরের কড়চা (দুষ্প্রাপ্য), ৬। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, ৭। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ৮। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, ১০। গোবিন্দদাসের কড়চা ১১। মাধব দাসের চৈতন্যচরিত (অসমীয়া ভাষায় লিখিত), ১২। ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবত (ওড়িয়া ভাষায় লিখিত), ১৩। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর।

এর মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা ও কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

চৈতন্যজীবনীর বৈশিষ্ট্য—১। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বে উল্লিখিত শ্লোকাষ্টক ছাড়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। সুতরাং তাঁর মত যিনি যেমন বুঝেছেন, তিনি তেমনই লিখেছেন। ২। হরিনাম প্রচারই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। একজন

লোকে তাঁকে হরিনামের মূর্তি বলতো। ৩। প্রেমই তাঁর মতে মুখ্য সাধন। ৪। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ একান্ত আত্মসমর্পণনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে ভজন করেছিলেন, ঈশ্বর উপাসনায় তাই ছিল তাঁর আদর্শ, ৫। নিজ জীবনে তিনি এই গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়—জয়দেবের প্রভাবেই তিনি এই রাধাভাব লাভ করেছিলেন। ৬। তাঁর দার্শনিক মত—"অচিন্ত্য ভেদাভেদ." চৈতন্যদেবের পরে শ্রীজীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ (গোবিন্দভাষ্য - বলদেব বিদ্যাভূষণ) এই মত প্রচার করেন। এই মতে জীব ঈশ্বর হতে ভিন্নও বটে আবার অভিন্নও বটে। জীব ঈশ্বরেরই শক্তি বিশেষ। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের এই সম্বন্ধটি অচিন্ত্য অর্থাৎ supernatural—প্রাকৃতিক ব্যাপারের অতীত। ইহাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব।

বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত। তবে প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দদাসের কড়চাও আলোচিত হবে।

চৈতন্যভাগবত—চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের জন্ম শক সম্বন্ধে নিশ্চয় করে বলা কঠিন। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন,—'১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের বৈশাখমাসে শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।' —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ২০৭। এ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সেই সুখ দরশনে ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি, ৮ম অধ্যায় ও মধ্য, ১ম অধ্যায়।

এইরূপ উক্তি দেখলে মনে হয় যে, বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর তিরোধানের (১৫৩৪ খৃঃ অব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী) পর জন্মেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা দর্শন করতে পারেন নি, সেজন্য খেদ করেছেন।

বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর মাতা নারায়ণী নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তমনস্কতাপ্রসূত বরে অথবা তাঁর চর্বিত তাম্বুল ভোজনে বৈধব্য অবস্থায় বৃন্দাবনদাসকে আঠার মাস গর্ভে ধারণের পর প্রসব করেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় নারায়ণীর

এজন্য কলঙ্ক হয় নি। (উদ্ধব দাসের গৌরপদ তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০৪ পৃঃ)।

আমার মনে হয়, এই প্রবাদটি সম্পূর্ণ অলীক। নিত্যানন্দপ্রভুর মাহাত্ম্য এবং বৃন্দাবনের জন্ম সম্বন্ধে অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এইরূপ প্রবাদ রচিত হয়েছিল। নারায়ণী অতি পবিত্র অতি ভক্তিমতী ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর গর্ভ অবস্থায় তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তার অনতিকাল পরেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ হন। এই নিয়ে নানা প্রবাদের সৃষ্টি হতে পারে।

নারায়ণীর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি চার বৎসর বয়সে মহাপ্রভুর আদেশে প্রেমাবিষ্টা হন। বৃন্দাবন স্বয়ং লিখেছেন,—

সর্বভূত—অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ।
আজ্ঞা কৈল 'নারায়ণী, কৃষ্ণ বলি কান্দ॥'
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥ ।(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২য় অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥ (চৈঃ চঃ, আদিলীলা, ৮ম পরি)

এই উচ্ছিষ্ট ভোজন সময়ে নারায়ণী চার বৎসরের বালিকামাত্র। এর ছয় বৎসর পর মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে কোন সময়ে নারায়ণীর বিবাহ হয়েছিল। বৈধব্য অবস্থায় নারায়ণী নবদ্বীপের নিকট মামগাছিতে বাসুদেব দত্ত প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। এই সেবা আজিও নারায়ণীর সেবা নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এই মামগাছি থেকে বৃন্দাবন দাস বিদ্যাভ্যাস করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যে বৃন্দাবন অতীব ভক্তির সঙ্গে মায়ের নাম স্মরণ করেছেন। তাঁর মা যে তাঁর অন্তর জুড়ে ছিলেন তাঁর গ্রন্থেই তার প্রমাণ। তাঁর মাতৃভক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতারই ঠিক উপযুক্ত। নারায়ণী যে কিরূপ ভক্তিমতী ছিলেন, মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনায় তার পরিচয় আছে। পূর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে।

মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে আরও বিস্তৃতভাবে মায়ের নাম স্মরণ করেছেন বৃন্দাবন। পুণ্যবতী জননীর প্রভাব ছিল বলেই পুত্র বৃন্দাবন এমন অমৃতময় গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুত' বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় 'নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি'।
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকাস্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥

অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে মাতৃভক্তপুত্র বৃন্দাবন দাস মায়ের সঙ্গে নিজ নাম সংযুক্ত করে ধন্য হয়েছেন।

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ-পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যান ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥

পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যে নিজের পরিচয় প্রায় গোপন করেই গেছেন। অতি সামান্য পরিচয় আছে তাঁর গ্রন্থের আদিখণ্ডের অষ্টম ও মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে—পূর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে। বড়গাছি গ্রামের প্রতি বৃন্দাবনের অপরিসীম ভক্তি ছিল'। কারণ এইখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অনেক সময় বাস করতেন। মামগাছি থেকে বড়গাছির দূরত্ব মাইল তিনেক। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর কৃপালাভ তাই সহজে

সম্ভব হয়েছিল বৃন্দাবনের পক্ষে। অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই স্মরণ করেছেন বৃন্দাবন বড়গাছি গ্রামকে।

বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥ (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৫ম অঃ)

বড়গাছিতে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটলেও বৃন্দাবন তাঁর জীবনের পরবর্তী অংশ দেনুড় গ্রামে কাটিয়ে ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করে বৃন্দাবন তাঁর আজ্ঞাতেই শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখেছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলরামের অবতাররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
"জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম"॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়)

শ্রীভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করে বৃন্দাবন নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনং রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং॥ ২০॥
(শ্রীভাগবত, ১০।৩৪।২০।২৩॥)

অনন্তর শিবরাত্রির পর একদা (হোলিকা পূর্ণিমায়) অলৌকিক প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বনমধ্যে রাত্রিকালে ব্রজরমণীগণের মধ্যবর্তী হইয়া বিহার করিতেছিলেন। (হোলিকা-রাত্রিতে এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে)॥

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতি বৃন্দাবনের যে অপরিসীম ভক্তি ছিল গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের শেষে তার প্রমাণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐশ্বর্যরসের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাধুর্যরসের সমাবেশ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্যই মাধুর্যের মূল। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্ণতা ঘটেছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিপূরক। এই জন্যই উভয় গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজের স্বীকৃত মূল ধর্মগ্রন্থ।

বৃন্দাবন অপরিসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থই তার প্রমাণ। নানা গ্রন্থ কত শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখেছিলেন, গ্রন্থ মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। অবশ্য শ্রীভাগবতই ছিল তাঁর আদর্শ। আর ঐ মহাগ্রন্থের অনুকরণেই তিনি তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখে-ছিলেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে অন্ততঃ একত্রিশটি শ্লোক শ্রীভাগবত থেকে উদ্ধৃত করে এবং সেই ভাব বজায় রেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব চরিত্র রূপায়িত করেছেন তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতে।

শ্রীভাগবত ছাড়াও গীতা থেকে ছয়টি, পদ্মপুরাণ থেকে চারটি, বিষ্ণুপুরাণ ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে তিনটি করে, মহাভারত, বরাহপুরাণ, নারদীয় সংহিতা থেকে দুইটি করে এবং জৈমিনি ভারত, মনুসংহিতা, স্কন্দপুরাণ, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে একটি করে শ্লোক উদ্ধৃত করে ঠিক সেই ভাবেই মহাপ্রভুর চরিত্রের রূপ দিয়েছেন।

বৃন্দাবনের কবিপ্রতিভা ছিল অসাধারণ। উক্ত সমস্ত দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এমন দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর চৈতন্যভাগবত লিখেছেন যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। এমন অসাধারণ প্রতিভা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রেখেছিলেন। অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পর্যন্ত যে ঐ নাম ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,—

'অরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৮ম অধ্যায়॥)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল যে ভাগবত সদৃশ আর তার কবি যে বেদব্যাস তুল্য কৃষ্ণদাস তাও উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়েছেন।

বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ১১শ অধ্যায়॥)

সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হওয়াতে ও বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রতি বৈষ্ণব সমাজের শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রীভাগবতের সাদৃশ্য হেতু বৃন্দাবনের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে ব্যাসের অবতার বলেছেন। তাঁর ও তাঁর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে সত্যই লিখেছেন,—

মনুষ্যে রচিত নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥ (চৈ. চ., আদি, ৮ম পরি:)

শ্রীভগবানের যে ঐশ্বর্যরূপ মহামুনি ব্যাস শ্রীভাগবতে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন স্বীয় মানসে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যরূপ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন। পরে স্বীয় গুরুর কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যেও শ্রীভগবানের সেই ঐশ্বর্যরূপ দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। বৃন্দাবন বড় সাধক আর তাঁর সাধনা আরও কঠোর। আর সেই জন্যই সাধক কবি বৃন্দাবন তাঁর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যরূপ চমৎকাররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই বৃন্দাবনের পূর্ণ মানসলীলার পরিচয়। আর তাঁর কবিমনের এই মানসলীলাই হোলো অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব।

বৃন্দাবন সাধনার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে যে ঐশ্বর্যরূপ দর্শন করেছিলেন, আপন কবিপ্রতিভার সাহায্যে তার সার্থকরূপ দান করেছেন। শ্রীভগবান

শ্রীচৈতন্যরূপে ধরায় অবতীর্ণ হবেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেবগণেরও তাঁর পরিকররূপে মর্ত্যে আবির্ভাব ঘটবে। ঘটেছেও তাই। মহাপ্রভুর লীলা চলেছে সারা ভারতে।

মহাপ্রভুর অবতারের কারণ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস সহজ সরলভাবে তাঁর মনের কথা তথা ভারতের মনের কথাই বলেছেন।

বিষ্ণু ভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম তিরোভাব হৈল প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ২য় অঃ।

কিন্তু ভক্ত উদ্ধারের উপায় কি? কলিযুগের নরের অন্নগত প্রাণ। কঠোর তপস্যা এদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝবার শক্তিও এদের অতি অল্প। এদের মন চঞ্চল। কুসংস্কারের নাগপাশে এরা আবদ্ধ। ধর্ম বল্‌তে,--

ধর্ম-কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥॥ চৈ. ভাঃ, আদি, ২য় অঃ।

এই তো দেশের অবস্থা। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষকে ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব বোঝাতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। সুতরাং একমাত্র পথ—প্রেম। প্রেমের ঋজুপথে সমগ্র মানবকে চালিত করে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারলেই মানব-মনকে জয় করা সম্ভব। মহাপ্রভু এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই প্রেমধর্ম প্রচারই হোলো তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মহাপ্রভু তাই জনগণমন-অধিনায়ক। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তিনি হরিনাম প্রচার আরম্ভ করলেন। নাম-সংকীর্তনই হোলো তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের পন্থা। আর এই পন্থায় তিনি একদিন সত্যই মানবমন জয় করলেন। প্রথম—শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। তার পর তাঁর প্রেমের বন্যা সমগ্র ভারতকে ভাসিয়ে দিল। ভারত মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় সেদিন ভেসেই গিয়েছিল।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

(চৈ, ভাঃ, আদি, ১০ম অঃ)

কিন্তু এতো গেল সাধারণ ভক্তের পথ। মহাপ্রভুর ভক্ত দুই স্তরের ছিল। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সাধারণ ভক্ত হলো বহিরঙ্গ ভক্ত।

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্তন॥

মহাপ্রভু তাঁর বহিরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে নগর সংকীর্তন করতেন। তাঁর সেই নগর সংকীর্তনের সময়ে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে নরনারী তাঁর পদতলে আশ্রয় ভিক্ষা চাইতো। ভাবে গদ গদ মহাপ্রভুর সেই চিত্র বর্ণনার অতীত। তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় গোবিন্দ দাসের একটি পদে।

নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমল তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ- সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর স্বতন্ত্র ভাব। তাঁদের সঙ্গে চলতো শুধু রস-আস্বাদন। এই রস আস্বাদনের মধ্যেই মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যভাবের পরিচয়। আর এর মধ্য দিয়েই অতীন্দ্রিয় ভাবের অবতারণা।

বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখেছিলেন সকলের জন্য। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও অলৌকিক কবি-প্রতিভাসম্পন্ন হয়েও তিনি অতি সহজ ও সরলভাবে সর্বজনবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যরূপ রূপদান করেছেন। মানসে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যরূপ নানাভাবে উপলব্ধি করছেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ রূপায়িত করেছেন তাঁর গ্রন্থে ঠিক ব্যাসের মত। সত্যই বৃন্দাবন দ্বিতীয় বেদব্যাস। মানসলীলাই অতীন্দ্রিয়বাদীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শ্রীভগবান জন্ম নিয়েছেন মানবরূপে। নররূপে মর্তালীলাই তাঁর এই অবতারের একমাত্র কারণ। তাঁর সেই লীলা দেখে পাপী-তাপী শান্তি পাবে। নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে হবে ঐ লীলার প্রকাশ। তাই জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই দেখা গেল শিশু বিশ্বম্ভর হরিনাম শুনলেই স্থির থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার।

তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)

ভগবান মর্তালীলার জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে নরের অলক্ষিতে উপস্থিত। দেবগণকে তো মানব চর্মচক্ষুতে দেখতে পায় না। দেবগণকে দেখতে হলে চাই মর্মচক্ষু। মর্মচক্ষু লাভ করতে হলে চাই কঠোর সাধনা। কঠোর সাধনায় মর্মচক্ষু লাভ হলে আসে দিব্যদৃষ্টি। সেই দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছু দেখা যায়। কিন্তু নবদ্বীপের লোকের তো সেই শক্তি ছিল না। তাই দেবদর্শন তাদের ঘটতে পারে না। তারা দেখেছে শুধু ছায়া। কেহ মনে ভাবছে—ঘরে বুঝি চোর ঢুকলো, কেহ মনে মনে অমঙ্গল আশঙ্কা করলো। তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছে এই ঘটনায়। আশ্চর্য কল্পনা বৃন্দাবনের। তাই তিনি লিখলেন—

সর্বলোক আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ॥

কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাম্ভায়।
ছায়া দেখি সভে বলে এই চোর যায়॥
'নরসিংহ নরসিংহ' কেহ করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)

বৃন্দাবন ছিলেন খাঁটী অতীন্দ্রিয়বাদী বৈরাগী। বৈরাগ্যই ছিল তাঁর চিরসহচর। তাঁর বৈরাগীমন মহাপ্রভুর মধ্যে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যরূপ দেখে চরিতার্থ হয়েছিল। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের যে ঐশ্বর্যরূপ রস এভাবে তিনি আস্বাদন করেছিলেন, তাতেই তাঁর জীবন চরিতার্থতায় ভরে গিয়েছিল। আর এর ফলশ্রুতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পেয়েছিল অমৃতময় শ্রীচৈতন্যভাগবত। অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এই মহাগ্রন্থ বৃন্দাবনের যৌবন বয়সের রচনা। যৌবন ধর্মের মধ্যে যে একটু বিশ্বাসের অহঙ্কার থাকে এই গ্রন্থের মধ্যে তার একটু পরিচয় মেলে। গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর তাঁর যে ভক্তি ছিল, সেই ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 'নিত্যানন্দ তত্ত্ব'। এই নিত্যানন্দ তত্ত্বের উপর যদি কেহ আস্থা স্থাপন করতে না পারেন, তবে—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

চন্দ্রের কলঙ্কের মত বৃন্দাবনের চরিত্রের ঐ বিশ্বাসের অহঙ্কারটুকু বাদ দিলে পর তাঁর মত অতীন্দ্রিয়বাদী বৈষ্ণবসমাজে বিরল। আবার ঐটুকু ত্রুটি না থাকলেও বৃন্দাবনের মনুষ্য-জীবন কল্পনাও করা যেত না। কারণ মানবজীবনে সামান্যতম ত্রুটি না থাকা বিশ্বাসের অতীত। আমার মনে হয় ঐ ত্রুটিটুকু থাকাতে বৃন্দাবনের চরিত্র উজ্জ্বলতর হয়েছে।

বৈকুণ্ঠেশ্বর মানব মূর্তিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রতিক্ষণের লীলা বৃন্দাবনের চোখে পড়েছে। কিছু তিনি সূত্রাকারে থেছেন। আর সব তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর পরবর্তী মহামুনি ব্যাসতুল্য কবিদের জন্য। নিজেই তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ

আদি খণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥
....
মধ্য খণ্ডে আর কত কত কোটী লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥
....
এই ত কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ১ম অঃ)

চারি মাসের শিশু শচীদুলাল বিশ্বম্ভরের লীলা ঠিক ভাগবতের কৃষ্ণলীলার তুল্য। শিশু কৃষ্ণ নন্দ যশোদার ঘরে যে সব লীলা করেছিলেন শচী-জগন্নাথের ঘরেও বিশ্বম্ভররূপী বৈকুণ্ঠেশ্বরও ঠিক তেমনি লীলা করেছেন। আর তা প্রত্যক্ষ করেছেন ভাবদৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয়বাদী বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস। তাই আমরা দেখি—

এই মতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময় যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥

সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)

শ্রীকৃষ্ণ যেমন কালিয়দমন করেছিলেন, শচীদুলালও একদিন তেমনই একটি সাপ ধরে তার কুণ্ডলীর উপর শয়ন করেছিলেন।

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥
আথে ব্যথে সভে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)।

অতীন্দ্রিয়বাদী বৃন্দাবন অতি সুন্দরভাবে বালক নিমাই-এর ঐশী শক্তি ও মায়া-লীলার বর্ণনাও দিয়েছেন। বালক নিমাইকে দুই চোর চুরি করে নিয়ে

যাচ্ছিল তাদের বাড়ী। কারণ বালকের গায়ে ছিল মূল্যবান অলঙ্কার। কিন্তু বালক নিমাই-এর মায়ার প্রভাবে তারা তাদের বাড়ী না যেয়ে এসে উঠ্‌লো জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে—যেখানে সকলে বালকের জন্য বিষাদখিন্ন মনে ভাবছিলেন।

বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥
চোর দেখে 'আইলাঙ নিজ মর্মস্থানে'।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বলে "নাম বাপ আইলাঙ ঘর"।
প্রভু বলে "হয় হয় নামা ও সত্বর"॥

নামিলেই মাত্র প্রভু গেল পিতৃ-কোলে।
মহানন্দ করি সভে "হরি হরি" বোলে॥
(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)

জগন্নাথ মিশ্রের অন্য নাম ছিল পুরন্দর। নিমাই-এর বাল্যলীলার মধ্যে বৃন্দাবন সে সংবাদটিও আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন। মিশ্রের পুত্র যে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণের অবতার অতীন্দ্রিয়বাদী বৃন্দাবন সুন্দর ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। অথচ তাঁর মায়ায় মাতাপিতা তা' জানতে পারেন নি। শ্রীভগবান মায়াতীত হয়েও মর্ত্যলীলায় মায়া-ই যে তাঁর লীলার প্রধান অবলম্বন বৃন্দাবন সেই শিক্ষাই দিয়েছেন আমাদিগকে। শ্রীভগবান মায়াতীত হয়েও যে মায়াময় একথা যেন আমরা না ভুলি। তিনি নিরাকার হয়েও সাকার, অনন্ত হয়েও সান্ত, অরূপ হয়েও রূপময়। ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যরূপ দেখিয়েছেন বৃন্দাবন মহাপ্রভুর মধ্যে।

একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥"
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাঞা যায়।
রুণু ঝুণু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥
মিশ্র বোলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)

তীর্থপর্যটন রত এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসেছেন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্রে তিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন। পরম ভাগবত এই অতিথি ব্রাহ্মণের পূজা করে ধন্য হতে চান মিশ্র। সেবার সব আয়োজন করে দিলেন তিনি। রন্ধন সমাপন করে সেই ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব পরম ভক্তিভরে যখন অন্ন নিবেদন করে দিলেন তাঁর উপাস্য দেবতা শ্রীভগবানকে, তখন শ্রীশচীনন্দন,—

> হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
> এক গ্রাস খাইলেন দেখি বিপ্রবরে॥
> "হায় হায়" করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
> অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥
>
> (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ) ।

মাতাপিতা আবার বিপ্রের রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিপ্র যখন তাঁর উপাস্য দেবতা বাল-গোপালকে দ্বিতীয়বার অন্ন নিবেদন করলেন, তখন—

> মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
> আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
> অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
> খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে॥
> 'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
> ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়। (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)।

এর পর ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে নিমায়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁর চরণ ধারণ করলেন। ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করে অন্ন নিবেদন করলেন তাঁর ইষ্ট দেবতাকে আর তখনই এলেন সেখানে শ্রীশচীনন্দন।

> প্রভু বলে "অরে বিপ্র তুমি ত উদার।
> তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
>
> সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
> শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম অষ্ট ভুজ-রূপ॥
> এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
> আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥

শ্রীবৎস-কৌস্তুভ, বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
....
এতেক আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় অঃ)।

অতীন্দ্রিয়বাদী শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুকে যেমন নারায়ণের অবতার রূপে গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনই লক্ষ্মীদেবীকে লক্ষ্মীর অবতার রূপে মর্ত্যলীলায় তাঁর সঙ্গিনী রূপে কল্পনা করেছেন। এমন ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের আবির্ভাব না হ'লে মর্ত্যলীলা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বৈকুণ্ঠে যেমন ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণ অবস্থিতি করেন, নবদ্বীপেও ঠিক তেমনই তাঁর লীলা চলে। এই লীলা দেখে বৃন্দাবন যেমন ধন্য হয়েছেন, তাঁর গ্রন্থপাঠেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঠিক তেমনই ধন্য হন। তাদের জীবনে আসে পরমা শান্তি। বৃন্দাবন লক্ষ্মী-নারায়ণের মর্ত্যলীলার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,—

কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদতলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুতে দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।
মহা জ্যোতির্ময় অগ্নি-পঞ্চ-শিখা জ্বলে॥
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পায় শচী আই।
ঘর দ্বার সর্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাই।
হেন মতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গুঢ়রূপে॥

(চৈতন্য ভাঃ, আদি, ১০ম অঃ)

অতীন্দ্রিয়বাদী হয়েও বৃন্দাবন তাঁর উপাস্য দেবতা মহাপ্রভুর মানবভাব বর্ণনা করতেও ভুলে যান নি। মানব দেহধারণ করলে ভগবানকেও যে পার্থিব মায়ার অধীন হ'তে হয় শিল্পী বৃন্দাবন তা ভুলে যান নি। অতীন্দ্রিয়বাদী হয়েও তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুতে মহাপ্রভু ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হয়েছিলেন। সেই অভিভূতভাব অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন শিল্পী শ্রীবৃন্দাবন দাস।

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি॥

প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ব-বেদ-সার॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ১০ম অঃ)

অতীন্দ্রিয়বাদী বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর বহু ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। আর নিপুণ তুলিকায় সেই ভাব অঙ্কিত করে ধন্য হ'য়েছেন। চৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সেই বহু ভাবের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীবৃন্দাবন। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু সব ভক্তকে প্রেম আলিঙ্গন দান করেন। ভক্ত ও ভগবান যে অভিন্ন নিজের আচরণ দ্বারা জীবকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। আলিঙ্গন দিচ্ছেন আবার পরক্ষণেই ভক্তকে চতুর্ভুজ, ষড়ভুজাদি রূপ দেখিয়ে ভক্তের জীবন ধন্য করে দিচ্ছেন। ভগবানের এই অপূর্ব লীলা শ্রবণ ও পঠনেও অভক্তের নেত্রেও প্রেমাশ্রুর সঞ্চার হয়। শক্তিমান ও মহাশক্তি যে এক এবং অভিন্ন মহাপ্রভুর গোপীভাবের দ্বারা বৃন্দাবন তাও প্রমাণ করেছেন।

কোন দিন গোপী ভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রি দিন, নাহিক স্মরণ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ৮ম অঃ)

আবার তাঁর কোন দিন উদ্ধব-অক্রুর ভাব, কোন দিন বলরামের ভাব, কখন বা চতুর্মুখ-ভাবে ভাবিত হন। শঙ্করের মূর্তিতে দেখিয়েছেন তিনি শিবের গায়েনকে।

শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥ (চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ৮ম অঃ)

কিন্তু সর্ব শেষে তিনিই যে স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ নিজ মুখে তাও শুনিয়েছেন তিনি তাঁর সব শিষ্যকে। বৃন্দাবন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ঐ মধ্য খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে—

কলি যুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান দৈবকী নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মুঞি নাথ
যত গাও সেই মুঞি তোরা মোর দাস (চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ৮ম অঃ)

পরম ভাগবত বৈরাগী বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মধ্যে প্রতিনিয়ত শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। সমস্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্তসাধক কবির মানসিক

গঠনই এইরূপ। মহামুনি ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ঐশ্বর্যভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মধ্যে তুল্য ঐশ্বর্যভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তার ফলশ্রুতিতেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস ব্যাসাবতার বলে আখ্যাত। অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক কবিদের মনের মধ্যে শ্রীভগবানের লীলা চলে সদা-সর্বদা। তাঁরা যুগপৎ ঐ লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হন আর সমৃদ্ধ কল্পনায় ঐ ভাবটি রূপায়িত করেন মহাকাব্যের মাধ্যমে। মহাকাব্য তখনই কালজয়ী সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থরূপে সমাজে আদৃত হয়। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাগ্রন্থ এমনিভাবেই কালজয়ী সাহিত্য এবং ধর্ম গ্রন্থরূপে পৃথিবীখ্যাত হয়েছে ও প্রসাদ গুণে সর্বস্তরের মানবের আদরণীয় হয়ে আছে। সমস্ত মহাগ্রন্থের লক্ষণই এই।

ভগবানের এই লীলা প্রত্যক্ষ করাই অতীন্দ্রিয়ভাব। ভক্তসাধক কবিরাই এই অতীন্দ্রিয়ভাবের অধিকারী। এই লীলা প্রত্যক্ষ করেই তাঁরা রসময় শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন। তাতেই তাঁদের রসানুভূতি ঘটে, আর সেই রসের অভিব্যক্তি ঘটে তাঁদের মহাগ্রন্থে। এই রসের অভাব ঘটলে গ্রন্থ কাল জয়ী হয় না।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস (লোচনানন্দ দাস) বর্ধমান জেলার গুস্‌করা স্টেশনের নিকট কোগ্রাম-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস ও মাতার নাম সদানন্দী। তাঁর মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত ও মাতামহীর নাম অভয়াদেবী। লোচনের পিতৃ-মাতৃ-কুল কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জাতিতে ছিলেন এঁরা বৈদ্য। দুর্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা সতী শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্ম দাতা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
মাতৃকুল-পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব তীর্থপূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥

মাতৃকুলে-পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিল করে মোরে।
দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে।
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আকর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥

লোচনের জন্ম হয় ১৪৪৫ শকে (১৪৪৫ + ৭৮) অর্থাৎ ১৫২৩, খৃষ্টাব্দে আর তাঁর তিরোধান ঘটে ১৫১১ শকে। নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে তাঁর চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়। গ্রন্থ মধ্যে তিনি লিখেছেন—

প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস,
তাঁর পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ॥

লোচন শৈশবেই নরহরি সরকার ঠাকুরের আশ্রয় পেলেও প্রৌঢ় বয়সের পূর্বে তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন, এমত মনে হয় না। লোচনের গ্রন্থে আছে,—

বৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥

এই দুই ছত্রকে প্রামাণিক বলে ধরে নিলে বলতে হয়, —

১। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত হয়েছে।

২। চৈতন্যমঙ্গল রচিত হ'বার পূর্বেই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ 'চৈতন্য-ভাগবত' নামেই পরিচিত হয়েছিল।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবত' নামে আখ্যাত হলেও সাধারণ ভাবে এই মহাগ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেও অভিহিত হত। কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ বৃন্দাবনের গ্রন্থকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম দিয়েছেন। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম ও একাদশ অধ্যায়ে তার পরিচয় আছে। সে কথা পূর্বেই বলেছি।

সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়—১৪৮০ (১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) শকে। অন্ততঃ তাই আমি মনে করি। আমার এরূপ মনে করবার কারণ আছে। আমার বিশ্বাস এবং স্থির বিশ্বাস যে, মহাপ্রভুর জীবিত কালে তাঁর কোন ভক্ত, তাঁর জীবনী-বিষয়ক কোন গ্রন্থই লিখতে সাহসী হন নি। মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে ১৪৫৬ (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) শকে। বৃন্দাবনের যৌবনে অর্থাৎ তাঁর চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে চৈতন্য ভাগবত রচিত হ'লে [illegible]

সময়ই ঠিক বলে মনে করি। আবার মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর বৃন্দাবনের জন্ম হয়েছিল এমন ইঙ্গিত আছে চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের অষ্টম ও মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে। পূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের পর লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হলেও উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নরহরি সরকার ঠাকুর গৌর প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নরোত্তম দাসের হাটপত্তন-এ পাওয়া যায়—

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় নরহরি লিখেছেন,—

গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুইত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মেনি সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হইলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন প্রভু॥

কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুঃখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শীলা॥

এই ভবিষ্যৎ-বাণী বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে খাটে না। কেন না, "জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু"—একথা তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে না। কবিরাজ গোস্বামীও তাঁর উদ্দিষ্ট হ'তে পারেন। তবে একথা ঠিক যে, নরহরি সরকার গৌরাঙ্গ লীলার আদি কবি। তাঁর পর গৌরাঙ্গলীলার প্রথম কাব্য লেখেন বৃন্দাবন দাস। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে সম্ভবতঃ সরকার ঠাকুরের আশা মেটেনি। তাই তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য লোচন দাসের দ্বারা চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়ে নন। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল মূলের খনি। আর [illegible] খনি লোচন দাসের

ধামালি পদগুলি। চৈতন্যমঙ্গলের প্রেরণা যিনি দিয়েছিলেন, সেই প্রেমের রমণী নরহরি সরকার ঠাকুরই ধামালী পদেরও আদর্শ জুগিয়েছিলেন।

দীনেশচন্দ্র লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে বলেছেন যে, চৈতন্য-মঙ্গল ইতিহাস হয় নি। "লোচন দাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গতি কবিত্বের পুষ্পপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদি রসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ পৃঃ ২১০।

এই উক্তি সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, ফুলপল্লবে কখনও গতি রুদ্ধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, লোচনের লক্ষ্য যে ইতিহাস ছিল—এ কথা নিশ্চিত বলা যায় কি? চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল এবং চৈতন্য চরিতামৃত ইহার কোন গ্রন্থই আধুনিক কালের অর্থে ইতিহাস নহে। ইতিহাসের মাল-মশলা জোগাবার উদ্দেশ্যে এগুলি লিখিতও হয় নি। এ জন্যই এদের মধ্যে বিরোধ আছে। অনেক ঘটনা একখানি চরিত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, আবার অন্য এক খানিতে হয় নি। লোচনের গ্রন্থে—কাজি দলন, দিগ্‌বিজয়ী পরাভব, হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী, হোসেন শাহের উল্লেখ, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ নেই। জগাই-মাধাই-এর উদ্ধার বর্ণনা চৈতন্য ভাগবতে এবং চৈতন্যমঙ্গলে ভিন্ন রূপ।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালী জাতীয় গ্রন্থ। উচ্চ দার্শনিক চিন্তার পরিচয় এর মধ্যে নেই। জনসাধারণের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনধর্ম প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয় না থাকাতে বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্যের আদর্শে লিখিত বলে বৈষ্ণবসমাজ লোচনের গ্রন্থকে স্বীকৃতি দান করেন নি। এর ফলে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেনি। গ্রন্থের মধ্যে নানা রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। গায়কগণ ঐ রাগরাগিনীর সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গান করতেন, যার ফলে সাধারণের মধ্যে এর প্রচার সীমিত ছিল।

লোচনের গ্রন্থখানা সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড—এই চার খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগে রক্ষিত গ্রন্থখানার সূত্র খণ্ডের শেষে—"ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে সূত্র খণ্ড (পূর্বাভাস) সমাপ্ত॥ ১॥ শ্লোকাঃ ২৩। লাচাবি।", আদি খণ্ডের শেষে—"ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদি খণ্ড

সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥ লাচাড়ী ॥ ২৪ ॥ শ্লোকৌ ২ ॥" মধ্য খণ্ডের শেষে—"ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলে মধ্য খণ্ড সম্পূর্ণ ॥ ৩ ॥ লাচাড়ী ৪১। শ্লোকাঃ ২৫ ॥" শেষ খণ্ডের শেষে—"ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শেষ খণ্ড সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥ লাচাড়ী ১৬ ॥ শ্লোকঃ ১ ॥"—এরূপ লেখা আছে। রাগরাগিনী ও লাচাড়ীর উল্লেখ দেখে অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে—গান গেয়ে মহাপ্রভুর জীবনালেখ্য প্রচারই এই গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্য। লাচাড়ী>পাঁচালী>পাঞ্চালী শব্দ থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং পাদ-চারণার সঙ্গে গীত হবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত। মঙ্গল কাব্যের প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়ে মঙ্গল কাব্যের অনুকরণে লোচন দাস প্রথমেই করেছেন গণেশের বন্দনা। বৈষ্ণব সমাজ বিষ্ণু বা তাঁর অবতার ছাড়া আর কোন দেবতার চিন্তা করেন না। বৈষ্ণবের মনে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা থাকে না। বৈষ্ণব রিপুজয়ী, প্রেমদানই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। বিষ্ণুভক্তিই বৈষ্ণবের জীবনের মূল মন্ত্র। লোচন নিজেও তা' ভালোভাবে জানতেন বলে গ্রন্থ মধ্যে দিয়েছেন,—

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ২৪ ॥ আদি খণ্ড।

এ সব জেনে সত্ত্বেও তিনি সূত্র খণ্ডের প্রথমেই লিখলেন,—

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

নমো নমো বন্দো, দেব গণেশ্বর, বিঘ্ন বিনাশন মহাশয়।
একদন্ত মহাকায়, সর্বকার্য্যে সহায়, জয় জয় পার্বতী তনয় ॥
হরগৌরী বন্দো মাথে, যুড়িয়া যুগল হাতে, চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা।
ত্রিজগতে এক কর্তা, বিষ্ণু ভক্তি বরদাতা, সবে এক ঐ দেবী দেবা ॥

বৈষ্ণবরীতি লঙ্ঘিত হবার ফলে লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজের স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হয়েছে। অবশ্য বৈষ্ণবের জীবনবেদ তিনি ঠিকই লিখেছেন। ঐ সূত্র খণ্ডেই তিনি বলেছেন,—

যে পুন বৈষ্ণবজন, তার কথা কহি শুন, অকারণে দয়া সর্বলোকে।
পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, পর উপকারে মানে সুখে ॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী, যাঁর পদ প্রতি আশে-আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরা গুণ গাইবারে, সে ভরসা এ লোচন দাস ॥

চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের প্রতি তাঁর অপরিমেয় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়,—"বৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে"।—গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত

তাঁর এই উক্তি থেকে। বৈষ্ণবের প্রতি, স্বীয় গুরু শ্রীনরহরি দাস ঠাকুরের উপর তাঁর কত যে ভক্তি ছিল, উপরি-উক্ত উক্তি থেকেই তা' সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ঠিক এমনই ভক্তি ছিল তাঁর নিত্যানন্দ প্রভুর উপর। নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে লোচন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,—

পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম॥
পিতামাতা নাম রাখিল কুবের পণ্ডিত।
বৈরাগ্য হৃদয়ে নিত্যানন্দ সুচরিত॥

(সূত্র খণ্ড)

গার্হস্থ্য আশ্রমে নিত্যানন্দের নাম ছিল কুবের। লোচন-ই এ সংবাদ জানিয়েছেন আমাদিগকে। বর্ধমানের কোগ্রাম নিবাসী লোচনের পক্ষে জানা সম্ভব এ সংবাদটি। কারণ নিত্যানন্দের বাড়ী ছিল একচাকা গ্রামে। এই গ্রামটি বীরভূম জেলার মল্লারপুর স্টেশন থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে। এ জন্যই লোচন এ সংবাদটি দিতে পেরেছেন।

এখানে নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ এসে গেল। আবার এই সঙ্গে অদ্বৈত মহাপ্রভুও বিজড়িত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নীলাচলে অবস্থিতিকালে অদ্বৈত আচার্য্যই মহাপ্রভুকে সর্ব প্রথম অবতাররূপে প্রচার করেন। মহাপ্রভু খুবই বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ভক্তজনের প্রবল ভক্তির বন্যায় ভেসে গিয়েছিল তাঁর সেই বিরক্তির ভাব। ভগবানকেও তখন চুপ থাকতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে,—

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরমানন্দে মত্ত হই অতি॥
শুন ভাই সব! এক কর সমবায়।
মুখভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায়॥
আজি আর কোনো অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব অবতারময়—চৈতন্য গোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব জগত উদ্ধার।
আমা সভা লাগি যে প্রভুর অবতার॥

সর্বত্র আমরা যার প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্তন হেন ধন যে করে বিদিত॥
নাহি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই বোল পাছে মনে ভয় পাও॥
প্রভু সে আপনাও লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সভার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দিগে গায় সভে চৈতন্য মঙ্গল॥
নব অবতারে শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি॥
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর।"
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখে এই পদ।
ইহার কীর্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ॥ (অন্ত্য খণ্ড, ১০ম অঃ)।

কিন্তু নানাদিক দিয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহভাজন ছিলেন। নিত্যানন্দ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। ঘরপালানো ছেলে অবধূতবেশে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হন নবদ্বীপে। তাঁর আকৃতি প্রায় বিশ্বম্ভরের মত ছিল। শচীদেবী তাই তাঁকে জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তাই তাঁর অন্তরঙ্গতা বেশী ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র সঙ্গে। নীলাচল থেকে মহাপ্রভু বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুকে হরিভক্তি প্রচারের জন্য। নিত্যানন্দ নবদ্বীপ ও গঙ্গার তীরস্থ নানা স্থানে হরি নাম বিতরণ করতে থাকলেন। অদ্বৈত ছিলেন শান্তিপুরের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি শান্তিপুরেই মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি প্রচার আরম্ভ করলেন। এ সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে,—

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড় দেশে।
অনর্গল কৃষ্ণভক্তি করিহ প্রকাশে॥

(মধ্যলীলা, ১৫শ পরিঃ)।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রধানতঃ দুইটি ধারায় বিভক্ত হ'য়ে যায়। এই দুই গুরুধারার একটি হোলো নিত্যানন্দের, অপরটি অদ্বৈতাচার্য্যের। অবশ্য নিত্যানন্দের তিরোধানপূর্ব পর্য্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রধান নেতা। এমন কি মহাপ্রভুর তিরোভাবের আগেই বাঙালা দেশে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। কারণ উভয়ে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হন। অদ্বৈতাচার্য্যও এ মত মেনেছিলেন। অম্বিকা কালনার গৌরীদাস সারখেলের বাড়ীতে প্রথম গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের পূজা আরম্ভ হয়। সারখেল মহাশয়ের ভ্রাতা সূর্য্যদাসের দুই কন্যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। অবশ্য কনিষ্ঠা স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর প্রভাব ছিল বৈষ্ণব সমাজে অত্যধিক। গৌরীদাস সচেষ্ট হয়ে জামাতাকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই ঐরূপ পূজার প্রবর্তন করেন।

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর অদ্বৈতাচার্য্য বাংলার বৈষ্ণবসমাজে প্রধান নেতার স্থান লাভ করেন। এই সময় হ'তেই বৈষ্ণবসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয়। নিত্যানন্দের শিষ্যবর্গ জাহ্নবী দেবীকেই নেত্রী বলে মেনে নিলেন। জাহ্নবী দেবী বীরভদ্রকে দীক্ষা দেন এবং বীরভদ্রও তাঁর দলের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বিবাহের পরে নিত্যানন্দ খড়দহে শ্যামসুন্দরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখান থেকেই প্রেমধর্ম প্রচার করেন জীবনের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিত্যানন্দের শ্রীপাট এই খড়দহেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানের পর তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যবর্গের নেত্রী হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্রগণ নেতার স্থান লাভ করেন। আবার এই সময় শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এর মূলে ছিল শ্রীখণ্ডের (কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী) মুকুন্দ দাস, তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা নরহরি দাস সরকার ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র রঘুনন্দন দাস। এঁরা ছিলেন মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত। এঁরা জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। মুকুন্দ দাস জাতীয় ব্যবসায়ে (চিকিৎসা) নিযুক্ত ছিলেন। নরহরি দাস সম্ভবতঃ কোন সরকারে চাকুরী করতেন। বৈদ্য হ'লেও তাঁর এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রে

রঘুনন্দনের অনেক শিষ্য ছিল। বহু ব্রাহ্মণও তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁরাই নরহরি দাসকে সম্ভবতঃ ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন, যার ফলে তিনি পরবর্তীকালে সরকার ঠাকুর নামে অভিহিত হন। গৌরাঙ্গ-গদাধরের পূজার প্রবর্তন এই সরকার ঠাকুরের অতুল কীর্তি। গদাধর পণ্ডিত বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং তিনিই নীলাচলে অবস্থিতি কালে মহাপ্রভুকে ভাগবত পড়ে শোনাতেন। এই নরহরি দাস ঠাকুরই লোচনের গুরু ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে লোচন তাঁর গ্রন্থে বিশেষ ভক্তির সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছেন।

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর বাল্য সঙ্গী ছিলেন। তাঁর সতীর্থও বটে। এ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

প্রভু বোলে, "বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দৃঢ়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥

(চৈতন্য ভাগবত, [illegible])

টোলের মধ্যে বসে মহাপ্রভু তাঁর সতীর্থ মুরারি গুপ্তকে যতই বিদ্রূপ করুন না কেন, মুরারীর কিন্তু তার জন্য ক্রোধ নেই। উত্তরে তিনি বলেছেন,—

বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল, "কি জানিস্ তুই।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি॥" (চৈ. ভাঃ, আদি, ৭ম অঃ)

অতঃপর উভয়ের মধ্যে উত্তরপ্রত্যুত্তর আরম্ভ হোলো। মহাপ্রভু সেই তরুণ বয়সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মুরারিও পণ্ডিত ছিলেন। বৃন্দাবন লিখেছেন,—

গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৭ম অঃ)

এই মুরারি গুপ্তও মহাপ্রভুর বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর সমস্ত লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি তাঁর অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্য চরিত" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য। কবি কর্ণপুরও ঐ

গ্রন্থ অনুসরণ করে "চৈতন্য চরিতামৃত"—নামক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। লোচন দাস মুরারি গুপ্তের চৈতন্য চরিত থেকেই তাঁর গ্রন্থের বিষয় বস্তু গ্রহণ করেছেন।

লোচনও বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর গ্রন্থ মধ্যেই আছে। সূত্র খণ্ডে ভাগবত ও গীতার প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। আদি খণ্ডের এক স্থানে কালিদাসের রঘুবংশের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। নবজাত পুত্রের মুখ দেখে জগন্নাথ মিশ্র বিভোর হয়ে পড়েন। লোচন লিখেছেন,—

জগন্নাথ বিভোর দেখিয়া পুত্র মুখ।
ব্রহ্মাণ্ডেও না ধরে তার অন্তর কৌতুক॥
কত চান্দ উদয় দেখিয়া মুখখানি।
প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি॥ (আদি খণ্ড)

মহাকবি কালিদাস রঘু বংশে ঠিক এমনই ভাব প্রকাশ করেছেন। মহারাণী সুদক্ষিণা পুত্র (রঘু) প্রসব করলে পর মহারাজ দিলীপ পুত্রমুখ দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েন। কালিদাস মহারাজের সেই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

নিবাতপদ্ম স্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননং
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরু প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥৩।১৭॥

মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে লোচন তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের শেষ খণ্ডে এক তথ্য দিয়েছেন। নীলাচলে অবস্থিতি কালে একদা মহাপ্রভু,—

নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভক্ত সঙ্গে নাহি দেখ কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচ্চাট॥

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্কীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ-রায়।
বাহু ভিডি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥
ভক্তআর্তি দেখি পডিছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥

মহাপ্রভুর তিরোভাবের এই তথ্য ছাডাও লোচন তাঁর গ্রন্থে নাগরীভাবের উপাসনা প্রচার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই লোকায়ত সাধনার ধারাটি প্রকাশ তাঁর গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত না হ'লেও এবং আমাদের আলোচনার ইচ্ছার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা নানাদিক বিচার করে আমাদের অনিচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য হয়েছি।

লোচনও অতীন্দ্রিয়বাদী কবি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের নানা স্থানে তাঁর অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় মেলে। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়েছেন। তিনি রাধা আর কৃষ্ণ তাঁর প্রাণপতি। কিন্তু তাঁর প্রাণপতিকে কুব্জা ছিনিয়ে নিতে চায়। আর সেইজন্ত অক্রুর এসেছে বৃন্দাবনে। তাই রাধারূপী মহাপ্রভু বিরহে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছেন। কবি লোচন দাস তার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। মহাপ্রভু—

একদিন নিজ গৃহে আছেন শুইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কাঁদে বিহ্বল হইয়া॥

রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে।
মাথুর-বিরহে হাত মারে নিজ বুকে॥
আরেরে অক্রূর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকলি॥
কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ নিল মোর।
হঠরতি লম্পট যুবতি মন চোর॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার।
পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমৎকার॥
বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ দুঃখ তোর কিসে॥
মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোর॥
তবে সেই শচী দেবী মনে মনে গণে।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ প্রেম জানিল সক্ষণে॥

(মধ্য খণ্ড)

লোচন মহাপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করেছেন। শ্রীবাসের ঘরে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্তন করছেন। কীর্তনানন্দে তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আনন্দবিষাদে তাঁর অন্তর চঞ্চল। কৃষ্ণের সঙ্গে যখন তাঁর পূর্ণ মিলন হয়, তাঁর তখন পূর্ণানন্দ আবার বিচ্ছেদে বিষাদ। একেবারে পরিপূর্ণ রাধাভাব। এমন সময় হোলো দৈববাণী। "তিনিই পরম ঈশ্বর। পৃথিবীতে প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে, ধর্মসংস্থাপনে, কলির লোক উদ্ধারে—তিনি মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রেমের মন্ত্রবলে তিনি জগতের শোক তাপ দূর করে দেবেন।" এই দৈববাণী আকাশসম্ভবা নয়, লোচনের হৃদয়উত্থিত। চৈতন্যপ্রেমিক লোচন তাই ভক্তিস্নাত চিত্তে গেয়েছেন,—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর রামনারায়ণ।
মুকুন্দ সহিত গেলা শ্রীবাসভবন॥
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্তমাঝে গৌরহরি।
মদে মাতোয়াল যেন কিশোরা-কিশোরী॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লুটায়।
হরি হরি বলিয়া কান্দে উচ্চরায়॥

রাত্রি দিনে প্রেমানন্দ পুলকিত তনু।
আন পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিনু॥

হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে।
"আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার।
নিজ করুণায প্রেমা কবিবে প্রচার॥
ধর্মসংস্থাপন ক্ষিতি কাবরে কীতন।
খেদ না করিহ কায কর আরোপণ॥
তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক।
নিজ প্রেমা দিয়া সব ঘুচাইব শোক॥
সংশয় নাহিক ইথে সুনহ বচন।
খেদ দুব কবি কর নিজ সংকীর্তন॥" (মধ্য খণ্ড)

লোচনের অন্যতম কীর্তি গৌরাঙ্গ-গদাধরের লীলা বর্ণনা। মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ এবং গদাধরকে রাধা সাজিযে তাঁহাদেব লীলা তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন। লোচনের মানসলোকের এই লীলা তাঁর অতীন্দ্রিয়বোধের পূর্ণ পরিচয়। ভক্তকবি লোচন বাধাকৃষ্ণের লীলা দেখে ধন্য হয়েছেন আর আমাদিগকে সেই বস আস্বাদনের সুযোগ দিতে রেখে গেছেন তাঁব অমূল্য গ্রন্থ। এই লীলার সার্থক বর্ণনায় পাই—

ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর কবি সঙ্গে
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাস রস রঙ্গে॥
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ।
হরি হরি জয় জয় বলে ঘনে ঘন॥
দিন অবসান সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন উপর॥
ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘনাদে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সভেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর চিত॥
মেঘগণ প্রেমপরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি প্রেমে গর্জিতে লাগিলা॥ (মধ্য খণ্ড)

হরি হর অভেদ। এই অভেদ-কল্পনাও করেছেন লোচন। বস্তুতঃ সেই অভেদ-কল্পনার মূলে—একম্ অদ্বিতীয়ম্। এক ব্রহ্ম, এক ঈশ্বর যে ভিন্ন ভাবে জগতে প্রকাশিত গীতার এই তত্ত্বটি লোচন অন্তর দিয়ে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করেছেন। গীতায় আছে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৪।১১

—হে পার্থ! যে যেভাবেই আমাকে ভজনা করুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ নানা প্রকারে ভজনা করিলেও তাহারা আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

যিনি হরি তিনিই হর। বস্তুতঃ পূর্ণব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশই বিভিন্ন দেবতা। এই অভিন্নতা প্রকাশের সূত্র নিয়ে লোচন পূর্ণব্রহ্মের অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে শিবের আবেশ এনেছেন। শিবভাবে ভাবিত হ'য়ে মহাপ্রভু নৃত্য করেছেন। এমন কি তিনি শিবভক্তের স্কন্ধে আরোহণ করেছেন। আর ঐ শিবের গায়ন তাঁকে শিবজ্ঞানে স্কন্ধে নিয়ে উল্লাসে নৃত্য করেছে। শ্রীবাস পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত শিবস্তব পড়ে মহাপ্রভুর স্থিরতা সম্পাদন করেন। মহাপ্রভুর মধ্যে এই ভাবের প্রকাশ দেখিয়ে লোচন আপন অতীন্দ্রিয়-ভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। অতীন্দ্রিয়বাদী না হ'লে লোচন কখনও এমন অতীন্দ্রিয়ভাবের বর্ণনা দিতে সমর্থ হ'তেন না। এই ভাবের বর্ণনায় লোচন লিখেছেন,—

আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়নে॥
নমস্কার করি গৌর হরির চরণে।
মহেশের গুণ গায় আনন্দিত মনে॥
শিব শিব বলি ডাকে পরম উল্লাস।
শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশ॥
শুনি আনন্দিত মন ভৈ গেল ঠাকুর।
শিব গুণ শুনি সুখ বাড়িল প্রচুর॥
শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন।
আপনা পাশরে সুখে শিবের গায়ন॥
তার সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন।
আপনে ঠাকুর কৈল [illegible]। [illegible]॥

স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হৈল প্রভুর রক্তলোচন॥
শিবের আবেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু মুখ শিঙ্গার গর্জন॥
রামকৃষ্ণ বলিয়া যে ডাকে কাঁদে হাসে।
ক্ষণেকে কাঁদয়ে গোরা শিবের আবেশে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সেই সব তত্ত্ব জানে।
শিবস্তব পড়ে সেই সাবধান মনে॥
পড়য়ে মহিম্ন স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সব তত্ত্ব॥
গায়নের কান্ধে হৈতে নামিলা ঠাকুর।
হরিপরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর॥ (মধ্য খণ্ড)

অতীন্দ্রিয়বাদী লোচন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে মহাপ্রভুর গোপীভাব দেখেছেন। আর তার সার্থক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের এই মধ্যখণ্ডেই। আর একটি নূতন সংবাদ দিয়েছেন আমাদিগকে লোচন দাস। শ্রীবাসকে তিনি নারদের অবতার বলে জানিয়েছেন এখানেই। এ সবই তাঁর অতীন্দ্রিয় মনের পূর্ণ পরিচয়। ত্রিপদী ছন্দে লোচন সার্থক বর্ণনা দিয়েছেন মহাপ্রভুর ঐ গোপীভাবের আর শ্রীবাসের উক্ত নারদ অবতারের।

কথা-পরসঙ্গ কথা, গোপিকার গুণ গাথা,
কহিতে সে গদ গদ ভাব।
অরুণ বয়ান ভেল, দু নয়নে ঝর ঝর,
রসাবেশে রসের প্রকাশ॥
কমলা যাহার পদ, সেবা করে অবিরত,
হেন প্রভু গোপিকার তরে।
পরসঙ্গ হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা,
কথা মাত্র সে আবেশ ধরে॥
তবে বিশ্বম্ভর হরি, গোপিকার বেশ ধরি,
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য ঘরে।
নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা,
নারদ-আবেশ ভেল তারে॥ (মধ্য খণ্ড)

অতীন্দ্রিয়বাদী লোচনের গ্রন্থে তাঁর অতীন্দ্রিয়ভাবের পরিচয় মেলে, আবার কিছু কিছু তথ্যও তাঁর গ্রন্থে পাওয়া গেল। এ সব দিক দিয়ে বিচার করলে তবে তাঁর গ্রন্থের সত্য মূল্য নির্ধারিত হবে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—মান্দারণের নিকট বর্ধমানের আমাইপুরা বা অম্বিকাপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জয়ানন্দের জন্ম হয়। পাঁচালী গানের মত করে জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখেছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল বহুকাল অজ্ঞাত থাকার পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় ১৩০৪ সালে। তিনি এবং কালিদাস নাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন ১৩১২ সালে। বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থখানি এতদিন সুপরিজ্ঞাত ছিল না। বলে ইহাকে অনেকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন না। জয়ানন্দকে তাঁর গ্রন্থ লিখতে নির্ভর করতে হয়েছে অপরের অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি ও স্বীয় কল্পনার উপর। তাঁর বর্ণিত প্রায় কোন ঘটনাই স্বকীয় জ্ঞান-লব্ধ নহে। অথচ জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হতে বাঙলা দেশে ফিরবার সময়ে ১৪৩৭ শকে জয়ানন্দের পিতৃভবন আমাইপুরা গ্রামে আগমন করেন। তখন জয়ানন্দের বয়স ৩৪ বৎসর। তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র মহাপ্রভুর একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় জয়ানন্দের বয়স ছিল প্রায় কুড়ি বাইশের মত।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বর্ধমান জেলার আমাইপুরা বা অম্বিকাপুর নীলাচল হতে ফিরবার পথে পড়ে কি? শ্রীচৈতন্য যদি বাঙলা দেশ হতে ফিরবার সময়ে জল-পথে যেয়ে থাকেন, তবে হয়ত আমাইপুরা হয়ে যেতে পারেন। অবশ্য অন্যান্য চরিত গ্রন্থে যে পথ পরিক্রমা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাইপুরার মিল দেখা যায় না। আবার জয়ানন্দের গ্রন্থে পথের ক্রমও ভ্রমাত্মক। তিনি শ্রীচৈতন্যের গমন পথের বিবরণে লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব দাঁতন হয়ে জলেশ্বরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরী হতে বাঙলা দেশে আসার পথে আগে জলেশ্বর পড়ে পরে দাঁতন। জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভু কাটোয়া হতে শান্তিপুর আসার সময়ে সমুদ্রগড় হয়ে গিয়েছিলেন। সমুদ্রগড় নবদ্বীপ হতে মাত্র পাঁচ মাইল। চৈতন্যদেব সমুদ্রগড়ে এলে শচীমাতা এবং নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তাঁর সন্ধান পান নি এমন হওয়া খুব সম্ভব নয়।

জয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন বলে মনে হয়। জয়ানন্দ লিখেছেন,—

"বন্দিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
চৈতন্যমঙ্গল গান গায় জয়ানন্দ॥"

কিন্তু ৺দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে জয়ানন্দ অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। "তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ২০৪।,

অবশ্য এ সম্বন্ধে জয়ানন্দ নিজেই বলেছেন,—

বীরভদ্র গোঁসাঞিঃর প্রসাদমালা পাইঞা।
শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর কেবল বর পাইঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচারি॥—(আদি খণ্ড)।

যাহোক, জয়ানন্দ মহাপ্রভুর সমসাময়িক হলেও তাঁর চৈতন্যমঙ্গল যে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের পরে লেখা সে কথা জয়ানন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ বর্ণিত মুখ্য ঘটনাগুলি জয়ানন্দ দেন নি। গয়ায় মহাপ্রভুর আকস্মিক পরিবর্তন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে নেই। কাজিদলন প্রসঙ্গও নেই। কেবল সূত্রাকারে গ্রন্থ শেষে এর উল্লেখ করেছেন মাত্র। চৈতন্যমঙ্গলের উত্তর খণ্ডে জয়ানন্দ বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন। এতে বোধ হয় যে, গ্রন্থ আরম্ভ করবার সময় জয়ানন্দ চৈতন্য ভাগবত দেখবার সময় পান নি। জয়ানন্দ অনেক স্থলে ভুলও করেছেন। যেমন—রামকেলীকে কৃষ্ণকেলী করেছেন। শচীদেবীকে গদাধরের শিষ্যা বানিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যেও অদ্ভুত কথা অনেক আছে। যেমন—জালিন্দ্রের কথা। এমন একটি অশ্লীল উপাখ্যান তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। চৈতন্যপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু সংবাদে মহাপ্রভু নাকি নৃত্য করেছিলেন।

লক্ষ্মীর বিয়োগকথা লোকমুখে শুনি।
প্রেমানন্দে কীর্তনে নাচেন দ্বিজমণি॥—নদীয়া খণ্ড।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে, মহাপ্রভু বিষয়ীর সংস্পর্শ বর্জন করতেন এবং অনেক সাধ্য সাধনায় প্রতাপরুদ্র নরপতিকে কৃপা করতে সম্মত হন নি। পরে অবশ্য প্রতাপরুদ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে প্রেমদান করেছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ লিখেছেন যে, প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করবার জন্য মহাপ্রভু কটক পর্যন্ত ধাবিত হয়েছিলেন। সেখানে রাজার শতেক স্ত্রী (চন্দ্রকলা প্রভৃতি) চৈতন্যের গলায় মালা দিলেন।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে, পীরলিয়া গ্রামে যে সকল হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা যবন রাজাকে জানিয়েছিল—নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে, শাস্ত্রে এই কথা আছে। তখন সেই মুসলমান রাজা আদেশ দিয়েছিলেন যে, নবদ্বীপের সকল ব্যক্তিকে মুসলমান করে দিতে হ'বে। এই সময় কালী স্বপ্নে করালমূর্তি দেখিয়ে যবন রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

জয়ানন্দ বলেন যে, চৈতন্যদেব আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য চরিতকারদের মতে চব্বিশ বৎসর।

জয়ানন্দ তিলোত্তমা উদ্ধার নামে এক গল্প তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেছেন। অন্য কোথাও এর উল্লেখ নেই। রামচন্দ্র যেমন অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন, গৌরচন্দ্রও তেমনই অষ্টভুজা পাষাণ মূর্তি তিলোত্তমাকে চরণস্পর্শে মুক্ত করেছিলেন। তিলোত্তমার আখ্যায়িকায় লোচন দাসের লক্ষী জন্মকথার ছায়া পড়েছে। লোচন দাসের প্রভাবের আর একটি প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যার পদগুলি জয়ানন্দ নিজের নামে চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নয়নানন্দের নামে প্রচলিত একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে নিজ নামে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

গৌরাঙ্গ লাবণ্যরূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাচলি।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে কতকগুলি নূতন সংবাদও দিয়েছেন, যাহা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(১) চৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অনতিদূরে বাস করতেন। শ্রীহট্ট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ঢাকা দক্ষিণগ্রাম নামক স্থান চৈতন্যের পূর্ব-পুরুষগণের বাসভূমি ছিল বলে অদ্যাপি চিহ্নিত আছে। সেখানে একটি সরোবর এবং তার সন্নিকটে একটি টিলার উপর মন্দির এবং তন্মধ্যে চৈতন্যবিগ্রহ আছে। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা শ্রীহট্টের অন্তর্গত "জয়পুরে" বাস করতেন। এই জয়পুরের পরিচয়ে জয়ানন্দ বলেন :

পূর্বে সরস্বতী উত্তর দিকেতে গোমতী।
পশ্চিমে ঢোলসমুদ্র দক্ষিণে করাতি ॥—(নদীয়া খণ্ড)।

অনেক অনুসন্ধান করেও এই বর্ণনানুযায়ী স্থানের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। সরস্বতী, গোমতী, ঢোলসমুদ্র, করাতি, জয়পুর—এ সবই

অদৃশ্য হ'য়ে গেল ? প্রচলিত মতানুসারে—জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে শচী দেবীর বিবাহ নবদ্বীপে হয়েছিল। জয়ানন্দ কিন্তু বলেন যে, এই বিবাহ শ্রীহট্টে হয়েছিল এবং জয়পুরে মড়ক হওয়াতে জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীকে নিয়ে শ্রীহট্ট হ'তে নবদ্বীপে চলে আসেন। (২) আরও নূতন সংবাদ এই যে, শ্রীহট্টে আসবার পূর্বে চৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। জাজপুর হ'তে রাজা ভ্রমরের ভয়ে তাঁরা শ্রীহট্টে পালিয়ে আসেন। এই ভ্রমর কে ? কটকে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের উপাধি ছিল "ভ্রমর"—(১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)। অতএব ভ্রমর একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইতিহাস হ'তে ইহাও জানা যায় যে, এই ভ্রমর বা কপিলেন্দ্র দেব মুসলমানদের গর্ব খর্ব করেন। যদি তাই হয়, তবে একটি ওড়িয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার এই হিন্দু রাজার ভয়ে দেশত্যাগ করিল কেন বুঝা যায় না। (৩) হরিদাসের জন্ম বুড়ন গ্রামে—ইহাই আমরা জানি। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন "ভাট কলাগাছি" গ্রামে (বা কলাগাছি গ্রামে ভাট বংশে তাঁর জন্ম)। (৪) জয়ানন্দের সর্বাপেক্ষা নূতন তথ্য মহাপ্রভুর তিরোধান। মহাপ্রভুর আকস্মিক তিরোধান সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ বলেন—রথ যাত্রার সময়ে রথাগ্রে নৃত্যকালে চৈতন্য-এর পায়ে ইষ্টকের আঘাত লেগে জ্বর ও বেদনা হয় এবং তাতেই তাঁর লীলাবসান ঘটে। আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রভু গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে স্বর্গে গমন করেন। সে সময়—

"অনেক সেবক সর্পদংশ হইঞা মৈলা।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈলা॥"—(উত্তর খণ্ড)।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এমন একটি গুরুতর ঘটনা অন্য কেহ লেখেন নাই। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে এই মাত্র আছে যে, চৈতন্য "গুণ্ডিচা বাড়ীতে" গিয়া অদৃশ্য হয়েছিলেন।

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে॥

.. ..

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

(লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল—শেষ খণ্ড)।

অতএব মহাপ্রভুর তিরোধান তিথি সম্বন্ধে জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে মিল আছে। কিন্তু মৃত্যুর প্রকার দুজন দুরকম দিয়েছেন। এই সব মিলিয়ে দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন, "চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে একদা কীর্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদে ইষ্টক বিদ্ধ হয়, দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান সংক্রান্ত নানারূপ গল্পে সত্য কাহিনী কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়াছিল, জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্তর্হিত হইবে।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃঃ ২০৪। (৫) জয়ানন্দের মতে গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ব্যক্তি চৈতন্যের সঙ্গী হয়ে কাটোয়ায় যান। চৈতন্যের এই সঙ্গীটি কর্মকার ছিলেন, না কায়স্থ ছিলেন, এইরূপ একটি প্রবল বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যে পুথি আছে, তাতে কর্মকারই আছে। অবশ্য এই গোবিন্দ যে কড়চার রচয়িতা অথবা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিলেন—এইরূপ কোন কথা জয়ানন্দের গ্রন্থে নেই।

জয়ানন্দের পূর্বে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত লিখেছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর যে ঐশ্বর্য ও প্রেমময় মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, অতীব আশ্চর্যের বিষয় সেই যুগে জন্মগ্রহণ করে জয়ানন্দের ভাব-কল্পনায় মহাপ্রভুর সেই মূর্তি রূপ লাভ করেনি। যিনি প্রেমের সমুদ্রে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত আন্দোলিত করেছিলেন, তাঁর সেই মহামূর্তি জয়ানন্দের মানসে কেন যে আসেনি তাহা আমাদের সুদূর কল্পনাতেও আসে না, পরন্তু সত্যমিথ্যার এক জগাখিচুড়ি তিনি পরিবেশন করেছেন তাঁর গ্রন্থে। ঐতিহাসিক ঘটনা থাকলেও মহাপ্রভুর ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয় নি বলেই বোধ হয়, এই গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে আস্থা লাভ করতে পারে নি।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নয় খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে আবার কতক-গুলি করে উপাখ্যান আছে।

১। আদি খণ্ড :—যুগধর্ম ও অবতার প্রসঙ্গ।

২। নদীয়া খণ্ড :—নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপাগমন, নবদ্বীপে যবনোপদ্রব, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম, শ্রীগৌরাঙ্গের বা[illegible]লা, বর্ণমালা অভ্যাস, ছেলে ধরা উদ্ধার, কুকুর উদ্ধার, শ্রীধরে কৃপা ও জলক্রীড়া, হরিদাস মিলন,

গদাধর মিলন, শুক্লাম্বরকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, পুরন্দরের গঙ্গালাভ, মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা, চৈতন্যপাদস্পর্শে তিলোত্তমার উদ্ধার, চৈতন্যের নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা, গৌরাঙ্গের প্রেমপ্রকাশ, মহাপ্রভুর বিবাহ সম্বন্ধ, চৈতন্যের বরযাত্রা, গৌরাঙ্গের বিবাহ, লক্ষ্মীর রন্ধন ও গৌরাঙ্গের বঙ্গযাত্রা, লক্ষ্মীর দেহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের বিবাহ, গৌরাঙ্গের ষড়ভুজ প্রদর্শন, জগাই মাধাই উদ্ধার।

৩। বৈরাগ্য খণ্ড :—মায়ানিদ্রা, ধ্রুব আখ্যান, ধ্রুব চরিত্র, শচী রোদন, জড়ভরতোপাখ্যান, কৃষ্ণ ভজনার মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিবেদন, বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস।

৪। সন্ন্যাস খণ্ড :—মহাপ্রভুর কাটোয়া যাত্রা, কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা, শচী বিলাপ, মহাপ্রভুর শান্তিপুর যাত্রা।

৫। উৎকল খণ্ড :—উৎকল যাত্রা, মহাপ্রভুর উৎকল যাত্রা, মহাপ্রভুর ক্ষেত্রবাস, সাক্ষিগোপালের কথা, প্রতাপরুদ্র মিলন ও গৌরাঙ্গের দক্ষিণ যাত্রা, জগন্নাথ বর্ণনা, জগন্নাথে জন্মাষ্টমী।

৬। প্রকাশ খণ্ড :—জগন্নাথের প্রকাশবর্ণন।

৭। তীর্থ খণ্ড :—ইন্দ্রদ্যুম্ন চরিত, ভোগমাহাত্ম্য, প্রতাপ রুদ্র সংবাদ।

৮। বিজয় খণ্ড :—বিষ্ণুদূত-যমদূত সংবাদ।

৯। উত্তর খণ্ড :—বিষ্ণুমাহাত্ম্য, 'জালিন্দ্র বধ, অজামিল উপাখ্যান, মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা, মহাপ্রসাদ নির্ণয়, মহাপ্রভু কর্তৃক কলির আচার বর্ণন, মহাপ্রভুর নদীয়ায় আগমন, নিত্যানন্দের স্থান নির্ণয়, গৌরাঙ্গের উৎকলাগমন, সংক্ষেপে মহাপ্রভুর পূর্বলীলা বর্ণন, নিত্যানন্দের পরিচয়।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁরা স্মার্ত রঘুনন্দনের বংশধর। বন্দ্যঘটীয় কুল ছিল তাঁদের। জন্ম হয়েছিল তাঁর মাতামহের বাড়ীতে। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী ছিল তাঁর জন্মতিথি। তাঁর মাতা রোদনী ও পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র। তাঁর জ্যেঠার নাম ছিল—বৈষ্ণব মিশ্র ও খুড়া ছিলেন—রামানন্দ মিশ্র। জয়ানন্দের এক আত্মীয় ছিলেন—বাণীনাথ মিশ্র। বাণীনাথের পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ, তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র। জয়ানন্দের পূর্বপুরুষ রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর পিতা চৈতন্যের শিষ্য ও মাতা নিত্যানন্দের ভক্ত হলেও খুড়া-জ্যেঠারা চৈতন্যকে ভক্তি করতেন না। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। জয়ানন্দ ছিলেন মৃত বৎসা জননীর সন্তান। তাঁর

মাতা তাই তাঁর নাম রেখেছিলেন—গুইয়া। গৌরাঙ্গদেব নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় গৌরাঙ্গদেব গুইয়া নামের বদলে তাঁর নাম দেন জয়ানন্দ।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি হলেও তাঁর গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল লিখতে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে অপরের অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি ও স্বীয় কল্পনার উপর। অথচ তিনি চৈতন্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। কবির লেখাতেই তার প্রমাণ আছে।

নদীয়ার লোক যত তার তুমি আখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখী॥ (নদীয়া খণ্ড)

কবির বর্ণনার মধ্যে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দ পুরি, বৃন্দাবন দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত, গোপাল বসু প্রভৃতি কবির নাম আছে। ১৪৮০ শকের পর এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রচারিত হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সময় তাঁর বয়স ৫৩।৫৮ বৎসর হতে পারে। সুতরাং তিনি পরিণত বয়সেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ না করে অনুসরণ করেছেন মঙ্গলকাব্যের রীতি। বৈষ্ণবের ধ্যানধারণা, জ্ঞানসাধনা সব হোলো রাধাকৃষ্ণ আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। দীক্ষাগুরুর পাদবন্দনা আর উপাস্য দেবতার চিন্তা এই তার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এর বেশী বৈষ্ণবের কাছে আর কিছু নেই। শয়নে-স্বপনে বৈষ্ণবের ধ্যানজ্ঞান শুধু স্মরণ, বন্দন, আত্ম-নিবেদন আর সেবা। এই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন জয়ানন্দ। ভুলে-ভরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে খানিকটা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন যদিও তিনি, কিন্তু বৈষ্ণবসমাজ তাতে আদৌ সন্তুষ্ট হন নি। তারই ফলে বহুদিন তাঁর গ্রন্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদৃত ছিল।

জয়ানন্দ বিঘ্নবিনাশন গণেশের বন্দনা করেছেন প্রথমে। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম-গ্রন্থের রীতি নয়, এটা মঙ্গলকাব্যেরই রীতি।

প্রথমে বন্দিব দেব শিবের নন্দনে।
যাঁহার স্মরণে বিঘ্ন না রহে ভুবনে॥—আদি খণ্ড।

বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীচৈতন্যচরিত শ্রবণ করলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় জীবন সার্থক হয়। কিন্তু জয়ানন্দের মতে

চৈতন্যমঙ্গল শুনলে তীর্থযাত্রা, অশ্বদান, কন্যাদান, তুলাপুরুষাদির ফল লাভ হয়। তাঁর গ্রন্থে মহাপ্রভু আবার যোগসাধনার উপদেশও দিয়েছেন।

আটি হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার॥
একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন।
গঙ্গা-যমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ॥
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্নার মূলে॥—(বৈরাগ্য খণ্ড)।

মঙ্গল কাব্যের আদর্শে তৈজসপত্র, জামাকাপড় ও খাদ্য দ্রব্যের বিরাট তালিকা দিয়েছেন জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে। আবার রোমান্টিক কাহিনীও ঢুকিয়ে দিতে কসুর করেন নি। পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যে যেমন নানা গল্পের সমাবেশ থাকে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও ঠিক তেমনই নানা গল্প সমাবিষ্ট হয়েছে। এরই ফলে তাঁর গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলা-মাধুর্যের একান্ত অভাব ঘটেছে। তাছাড়া বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা নারায়ণের চরিত্র যেভাবে জয়ানন্দ অঙ্কিত করেছেন, তাও বৈষ্ণবের পক্ষে অশ্রদ্ধেয়। জালিন্দ্রের গল্প এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের মত অভক্তের কাছে কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়ানন্দের অতীন্দ্রিয় ভাব ধরা পড়েছে। এগুলিও এখানে উল্লেখনীয়।

এক বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছেন। এর ফলে সেই বৈষ্ণবের শাপে ঐ ব্রাহ্মণ কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। মহাপ্রভুর কৃপায় সে উদ্ধার লাভ করে।

গৌরচন্দ্র ভোজন করিয়া অবশেষ।
কর্মবন্ধ কুকুরের পাপ হৈল শেষ॥
উচ্ছিষ্ট খাইঞা কুকুর গঙ্গাদাস।
পূর্ব অপরাধ তার সব হৈল নাশ॥—নদীয়া খণ্ড।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, মহাপ্রভুও ঠিক তেমনই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মন্দিরে নৃত্যকালে মহাপ্রভু কীর্তনে আবিষ্ট হন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সেদিন মন্দিরে শ্রীমূর্তির ভোগে পিষ্টক পায়স দেন। মহাপ্রভু তখন তাঁকে বলেন,—

পিষ্টক পায়স ভোগ উৎকৃষ্ট যত।
উদর ভিতরে মোর দেখ আসি কত॥

শুক্লাম্বর হাতে ধরি মন্দির ভিতরে।
পিষ্টক-পায়স ভোগ দেখান উদরে ॥
দেখি মূর্চ্ছা গেলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
বড় দিয়া গেলা যথা কীর্তনের স্থলী ॥
কীর্তনে আবিষ্ট হঞাছেন বিশ্বম্ভর।
মহাবায়ু জন্মিল সংক্ষেপ শুক্লাম্বর ॥
সমস্ত রজনী বঞ্চি তাঁহার মন্দিরে।
করিল অদ্ভুত নৃত্য সভার গোচরে ॥
সে সব রহস্য বুঝিবার কার আছে শক্তি।
পিষ্টক-পায়স ছলে দেখি বিশ্বমূর্তি ॥
মহা পাষণ্ডী ছিল দ্বিজ শুক্লাম্বর।
মহা ভাগবত তাঁরে করিল ঈশ্বর ॥—নদীয়া খণ্ড।

শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যেমন অহল্যা উদ্ধার লাভ করেছিল, ঠিক তেমনই চৈতন্যদেবের পাদস্পর্শে তিলোত্তমার উদ্ধার লাভ ঘটেছিল। সেবা ও প্রেম এই হল বৈষ্ণবের জীবনে কাম্য। আর মহাপ্রভুর জীবনে সেই প্রেমই ছিল সর্বস্ব। এমত অবস্থায় তাঁর জীবনীতে ঐ ভাবের প্রকাশ ঘটানোর জন্য জয়ানন্দের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হন নি বৈষ্ণব সমাজ।

শচী ও ইন্দ্রের সম্মুখে নারদ নন্দন বনে বীণা বাজাচ্ছিলেন। এমন সময় তিলোত্তমা বীণা হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। নারদের সামনে বীণা হাতে উপস্থিত হওয়ায় নারদ অভিশাপ দেন তিলোত্তমাকে। তিলোত্তমা সুমেরু শিখরে পাষণ হয়ে থাকে। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তার মুক্তি হয়।

চরণ পরশে মুক্ত হৈল তিলোত্তমা।
মধ্যেতে ফাটিল সেই পাষাণ প্রতিমা ॥
পাষাণ হৈতে মুক্ত হইল স্বর্গ বিদ্যাধরি।
গৌরচন্দ্রে স্তুতি করি গেল ইন্দ্রপুরী ॥—নদীয়া খণ্ড।

নন্দন আচার্যের ঘরে নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীগৌরচন্দ্র ষড়ভুজ দেখিয়ে ধন্য করেছিলেন—

পুলকে উজোর দেহ অপূর্ব বদন।
অবশেষে গৌরাঙ্গ ষড়ভুজ দরশন ॥
তবে গৌরচন্দ্রপ্রভু ষড়ভুজ হইল।
দেখি নিত্যানন্দ গোসাঞি চিত্রার্পিত হৈল ॥—নদীয়া খণ্ড

চৈতন্যমঙ্গলের বিভিন্ন খণ্ডে জয়ানন্দ নানা উপাখ্যান সংযুক্ত করেছেন। মহাপ্রভুর জীবনীর মধ্যে ঐগুলির সমাবেশও বৈষ্ণব সমাজ প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। বিশেষতঃ উত্তর খণ্ডে জালিন্দ্র বধ উপাখ্যানটি যে কোন বৈষ্ণবের মনকে পীড়িত করে। বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা নারায়ণের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, জয়ানন্দের হাতে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। ভক্ত বৈষ্ণবের কথা বলছি না, আমাদের মত অভক্তের মনও জয়ানন্দের এই কল্পনাকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতে পারে না। নারায়ণের চরিত্র কি ভাবে যে জয়ানন্দের কল্পনায় এমন রূপ পেয়েছিল, তা' আমরা কল্পনাও করতে পারি না। উপাখ্যানটি পূর্ণ রোমান্টিক ভাবের।

জালিন্দ্র নামে এক মহাবীর ইন্দ্রত্ব লাভের আশায় ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাঁর স্ত্রী বৃন্দা পরম সতী ছিলেন। এই সাধ্বী নারীর প্রভাবে ইন্দ্র জালিন্দ্রকে পরাজিত করতে পারেন নি। এমন কি জালিন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের পক্ষ নিলেন দেবতারা। কিন্তু হ'লে কি হ'বে! জালিন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে মহেশের শূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, যমের দণ্ড ব্যর্থ হয়ে গেল। নিরুপায় দেবতারা নারায়ণের স্তব আরম্ভ করলেন। তাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ—

দেবগণ আশ্বাসিঞা গেলা জনার্দ্দন।
জালিন্দ্রের বেশ কৃষ্ণ ধরিলা তখন॥
....
এথা কৃষ্ণ জালিন্দ্রের বেশ ধরি রথে।
বৃন্দাস্থানে উত্তরিলা পূর্ণ মনোরথে॥
বৃন্দা বৃন্দা ডাক ছাড়ে গাত্র অঙ্গ রাখি।
সর্বাঙ্গে সংগ্রাম ধুলা শ্রম জলে দেখি॥
বজ্র রক্ত লাগিয়াছে কিরীট কুল মাঝে।
পৃষ্ঠে শর তুণ কোদণ্ড খড়্গ হাথে॥
জালিন্দ্র দেখিয়া বৃন্দা মনে মনে হাসে।
সংগ্রামের জয়বার্ত্তা স্বামিকে জিজ্ঞাসে॥
যুদ্ধ জয় করিল প্রসাদ দেহ বৃন্দা।
সন্তোষে আলিঙ্গন রতিক্রীড়া সন্ধা॥
মায়া জালিন্দ্রেরে বৃন্দা আলিঙ্গন দিল।
রতি রসে বৃন্দা মহা সন্তোষ জন্মিল॥

অতঃপর বৃন্দার সতীত্ব নাশ হ'লে যুদ্ধে ইন্দ্র জালিন্দ্রকে নিহত করলেন। বৃন্দা দেবমায়া বুঝতে পেরে সতীত্ব নাশের জন্য মর্মাহত হয়ে অভিশাপ দিল।

মোরে জে জালিন্দ্ররূপে ছলিল আসিঞা।
পাষাণ শরীর হউক সে দেহ ছাড়িঞা॥
বৃন্দার সম্পাত শুনি কৃষ্ণ আইল তথা।
কৃষ্ণ বলেন বৃন্দা দেহ ছাড়িব সর্বথা॥

নারায়ণ বৃন্দাকে পরিণতি জানালেন,—

আমি দেহ ছাড়ি হ'ব শালগ্রাম শিলা।
তুমি তুলসী বৃন্দা পূর্বে লক্ষ্মী আছিলা॥
মথুরা যে বৃন্দা তোমার বনস্থলী।
সেই বৃন্দাবনে যে করিব রসকেলী॥
জে দ্রব্য তুলসী দিঞা নিবেদিব মোরে।
সে দ্রব্য সন্তোষে আমি লইব সত্বরে॥
সে মহাপ্রসাদ জেবা ভক্তিভরে লভে।
আপনি বৈষ্ণবী পাপী পাপে মুক্ত হ'বে॥
বৈষ্ণব জন জে অধরামৃত খাএ।
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি দূরেতে পালাএ॥
লক্ষ্মী বৃন্দা তুলসী আমার তিন সঙ্গে।
সর্ব যজ্ঞফল তার এ তিন প্রসঙ্গে॥
এই কথা বৃন্দাকে কহিঞা জনার্দন।
বৃন্দা সঁপিলা দেহ ছাড়িলা তখন॥

এর পর জয়ানন্দ উভয়ের পরিণাম জানালেন--

শালগ্রাম শিলা হৈলা গণ্ডকী নিবাসী।
দেহ ছাড়িঞা বৃন্দা হইলা তুলসী।--উত্তর খণ্ড।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত না লিখে জয়ানন্দ যদি মনসামঙ্গল জাতীয় কোন কাব্য গ্রন্থ লিখতেন, তবে ভালই হোত, অথবা আধুনিক যুগে যদি তাঁর জন্ম হোত, তবে তাঁকে আমরা পেতাম ঔপন্যাসিকরূপে আর তাঁর উপন্যাস কা নিত রোমান্টিক উপন্যাসের।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত— বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে ঝামোটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস এক বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার

নাম ভগীরথ কবিরাজ এবং মাতার নাম সুনন্দা দেবী। ইহার জন্ম সন সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। ভক্ত দিগ্‌দর্শনী তালিকা অনুসারে তাঁর জন্ম ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। দীনেশ চন্দ্রের মতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কেহ কেহ বলেন আরও পরে তাঁর জন্ম হয়। এইরূপ মতভেদের কারণ—চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হ'লে কৃষ্ণদাসের জন্ম সাল পিছিয়ে বা এগিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়। চরিতামৃতের রচনা কাল যদি ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়, তবে কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৫২৭ বা তারও পরে হ'লে ভাল হয়। চৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল—

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জৈষ্ঠ্যে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেহসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১৪ ॥

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু (৭), অগ্নি (৩) বাণ (৫), ইন্দু (১) = ১৫৩৭ শক।
১৫৩৭ শক + ৭৮ = ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১৫৩৭ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন সনাতন এবং রূপ গোস্বামী জীবিত ছিলেন এবং কৃষ্ণদাস সে সময়ে একবারে যুবক ছিলেন না। অবশ্য তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত যে পরিণত বয়সের লেখা, সে কথা তিনি নিজেই উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত গোপাল চম্পুর উল্লেখ আছে। গোপাল চম্পুর উত্তর ভাগের রচনা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। কাজেই ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচিত হওয়া অসম্ভব। আবার গ্রন্থ সমাপ্তির যে সন তারিখ পূর্বে উক্ত হয়েছে, সমস্ত চরিতকারই তা' মেনে নিয়েছেন। সুতরাং ঐ তারিখ অগ্রাহ্য করা যায় না। সম্ভবতঃ চরিতামৃতের কোন প্রাচীনতম অনুলিপিতে এই সন তারিখ দেওয়া আছে এবং তারই উল্লেখ সমস্ত পুথিতে দেখা যায়। বার্দ্ধক্য-জনিত অক্ষমতা যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতরূপ মহাগ্রন্থ লিখবার পথে অন্তরায়, সে প্রসঙ্গে ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান ॥

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ চৈঃ চঃ, অন্ত্য,
২০শ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণদাস সংস্কৃতে আগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা, ভাগবত শাস্ত্র গূঢ় রহস্য, অদ্বৈত সূত্রের কড়চা, স্বরূপ বর্ণন, বৃন্দাবন ধ্যান, ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক, চৌষট্টি দণ্ড নির্ণয়, প্রেম রত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার, রাগময় করণ, পাষণ্ড দলন, বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাগ-রত্নাবলী, শ্যামানন্দ প্রকাশ, সার সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করবার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কথিত আছে যে, কৃষ্ণদাস প্রথমে সম্মত হন নি। পরে মদন মোহনের প্রসাদী মালা পেয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণদাস যখন বৃন্দাবনে গেলেন, তখন ষড় গোস্বামীর মধ্যে অনেকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও হৃদ্যতা হয়। ষড় গোস্বামী—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইঁহা সবার পদ-আগে করি নমস্কার ॥ চৈঃ চঃ, আদি, ১ম পরিঃ

এইভাবে বৈষ্ণবেরা প্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামীকে স্মরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট বিশেষতঃ স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট শুনে কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন।

১। স্বরূপ দামোদর পুরুষোত্তম লাহিড়ী। ইনি ছিলেন সুপণ্ডিত, ত্যাগী, সন্ন্যাসী ও মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। ইঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর।

২। রঘুনাথ দাস ছিলেন হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের অধিবাসী।

৩। লোকনাথের বাড়ী ছিল যশোহরে।

নরোত্তম দাসের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের হৃদ্যতা জন্মে। তাঁর নিকট কৃষ্ণদাস দীক্ষা নিয়েছিলেন। অনেক সেবা করার পর লোকনাথ এই নরোত্তমের নিকট দীক্ষা নিতে পেরেছিলেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এবং কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক দেখবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনেক স্থলে তিনি কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত কাব্য চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণদাসের সুবৃহৎ সংস্কৃত কাব্য গোবিন্দলীলামৃত বিদ্বদ্‌সমাজে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। এই গ্রন্থের জন্য কৃষ্ণদাস "কবিরাজ" উপাধি লাভ করেছিলেন। রঘুনাথ দাসের মুক্তাচরিতে "কবিভূপতি" অর্থাৎ কবিরাজ-এর উল্লেখ আছে। তা' হলে মুক্তাচরিতের পূর্বে গোবিন্দ লীলামৃত রচিত হয়। আবার উজ্জ্বল নীলমণিতে মুক্তাচরিতের শ্লোক আছে। সুতরাং উজ্জ্বল নীলমণির আরও পূর্বে গোবিন্দ লীলামৃত রচিত।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব বিভাগে সাধনভক্তি লহর্যাং
চতুরধিক শততমঃ শ্লোকঃ)

—ভগবানের প্রতি যদি স্বাভাবিক (নির্মল স্বভাবজাত) অদম্য লালসা বা লোভ জন্মে তবে এই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে।

এই লোভময়ী ভক্তি বা লালসাময় অনুরাগকে চৈতন্য চরিতামৃতকার "গাঢ়তৃষ্ণা" বলেছেন। এই গাঢ়তৃষ্ণা বা লোভ শাস্ত্রজ্ঞান হ'তেও হয় না বা যুক্তি দ্বারাও লাভ করা যায় না। ভগবানের মাধুর্যাদি গুণ শ্রবণে স্বতঃই যে আকর্ষণ মনে জন্মে, তাহাই লোভ উৎপত্তির কারণ।

তত্তদ্‌ভাবাদি মাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোৎপত্তিলক্ষণম্॥
(ঐ ১১৮ শ্লোকঃ)

—ব্রজবাসিগণের শান্ত দাস্য রসাশ্রিত ভাবাদির মাধুর্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তি এই রাগানুগা ভক্তি বিষয়ে বিধিবাক্য ও কোনরূপ যুক্তিকে যে অপেক্ষা, করে না, সেইটি তাহাতে লোভোৎপত্তির অর্থাৎ রাগোদয়ের লক্ষণ।

গীতায়ও ভক্তির প্রাধান্য বর্ণিত হয়েছে। একান্তভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন,—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা, ১৮ শ অধ্যায়ঃ ॥

—তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

—সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

এক্ষণে ধর্মের অর্থ কি? ভগবৎ প্রাপ্তি, মোক্ষলাভ বা স্বর্গাদি পারলৌকিক মঙ্গল লাভের জন্য যে সব কর্ম শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট আছে, ব্যাপক অর্থে তাকেই ধর্ম বলে, যেমন গার্হস্থ্য-ধর্ম, সন্ন্যাস-ধর্ম, রাজ-ধর্ম, পাতিব্রত্য-ধর্ম, দান-ধর্ম, অহিংসা-ধর্ম ইত্যাদি। এ সব ধর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিয়ে যথাকর্তব্য করলে পর তিনিই ভক্তকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করেন। ভক্তি মার্গের এটিই হোলো সার কথা। এরই নাম ভগবৎ-শরণাগতি, যার অন্য নাম আত্মসমর্পণ। এই শরণাগতিরও ছটি লক্ষণ আছে।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

হরিভক্তি বিলাস, ১১ ॥ ৪১৭ ॥

—ভগবানের প্রীতিজনক কার্যে প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্তিপ্রকাশ—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সর্বধর্মত্যাগী ভগবদ্‌ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রাজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥

॥ ১১ । ১১ । ৩২ ॥

আমা কর্তৃক বিহিত বেদোক্ত ধর্ম সকলের আচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণ ও অনাচরণে দোষ ইহা জানিয়াও যিনি সর্বধর্মপরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন, তিনিই সাধু শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এরূপ ভাবে ভক্তির ঐকান্তিকতা উল্লেখিত হ'লেও গীতায় রাগ বা রাগাত্মিকার উল্লেখ নেই। সুতরাং এই রাগাত্মিকা ভক্তি বাঙলার প্রেম-ধর্মের একটি অভিনব অভিব্যক্তি। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মে উপাসনা প্রণালীও এই রাগাত্মিকা ভক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম অনুসারে ব্রজবাসিনী গোপীগণ যেরূপ স্নেহ-বাৎসল্য ও প্রেমের সহিত কৃষ্ণকে সেবা করতেন, সেইরূপ ভাবে ভগবানকে ভালবাসার নাম উপাসনা।

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥ চৈঃ চঃ, মধ্য, ২২ অঃ ॥

ব্রজবাসীরা মুখ্যতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিন ভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতেন। সেই জন্য রস বল্‌তে প্রধানতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বুঝায়। এই তিনটি রসের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, মানুষের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করলে এই তিন ভাবেরই আবেগময়ী অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আবার সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিন রসের মধ্যেই 'দাস্য' ভাব অন্তর্নিবিষ্ট আছে। রাখালেরা বিশুদ্ধ সখ্য ভাবে, নন্দ যশোদা বাৎসল্য ভাবে এবং ব্রজগোপীরা বিশুদ্ধ মধুর ভাবে কৃষ্ণের সেবা করতেন। অবশ্য 'দাস্য' ভাবও প্রধান রসের মধ্যে গণ্য হয়েছে। দাস্য রস—শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য অক্রূর, উদ্ধব ও মহাভারতের বিদুর প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে দেখা যায়। সেইজন্য দাস্য রসকে সখ্য, বাৎসল্যাদির সমপর্যায়ে ফেলা হয়। শান্ত রস তেমন আবেগময় না হলেও শুদ্ধ ভক্তগণের আস্বাদ্য বটে। যোগী, ঋষি ও সেই সব ভক্ত যাঁরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী নন, তাঁদের ভজনে অনাবিল শান্তরসের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে এই পাঁচ প্রকার রসের কথা উল্লেখ আছে।

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥ —চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৩শ পরিঃ

চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই গোলোকপতি নারায়ণ —পূর্ণ ব্রহ্ম। ইনিই অক্ষর, অব্যয়, নিত্য, সত্য ও সুন্দর। ভক্তের জন্য যিনি অরূপ, তিনিই রূপ নিয়ে মর্ত্যে আবির্ভূত হন। এই অরূপকে রূপের

মধ্যে দেখে অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্তসাধক চরিতার্থ হন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে তাঁর সাধনা করেন। অতীন্দ্রিয় সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবী সাধনার মধ্যে, যার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি আমরা রাধাতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের মধ্যে। পূর্বেই আমরা এর বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ দুই দেহেও যে এক, তাই বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দিতে শ্রীভগবানই যে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হয়েছেন—চৈতন্যদেবের জীবনে তা' বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শিক্ষাগুরুদের কাছে এবং নানা গ্রন্থ পড়ে ইহাই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধ সত্য নানারূপে নানাভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, বৈষ্ণবী সাধনার পথ, সাধ্যসাধন তত্ত্ব, সম্বন্ধতত্ত্ব বিচার, অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব, দিব্যোন্মাদের স্বরূপ বা মহাপ্রভুর অতীন্দ্রিয় ভাব এবং চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমদ্‌ভাগবত, লঘু ভাগবতামৃত, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, কাব্যপ্রকাশালংকার, ভাবার্থদীপিকা, বিদগ্ধ মাধব, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত, স্তবমালা, ভাগবতসন্দর্ভ, উপপুরাণ, যামুনাচার্য-স্তোত্র, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, বিষ্ণু পুরাণ, উজ্জ্বল নীলমণি, বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র, গোবিন্দ লীলামৃত, দানকেলী কৌমুদী, ললিত মাধব, গোপীপ্রেমামৃত, পদ্মপুরাণ, শ্রীগীতগোবিন্দ, ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ, রূপ গোস্বামীর কড়চা, বৃহৎ নারদীয় বচনম্, হরিভক্তি সুধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব যেভাবে এসেছে, এগুলি বাদ দিলে পর আর যা' কিছু থাকে সেগুলি বুঝবার পক্ষে সাধারণ পাঠকের অসুবিধা নাও হতে পারে। মহাপ্রভুর জীবনের অসাধারণ ঘটনাগুলি ছেড়ে দিলে পর তাঁর সাধারণ জীবন বুঝতে পারবেন সাধারণ পাঠক।

কৃষ্ণদাস অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই পাণ্ডিত্য ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর গভীর জলে গলে গিয়েছিল—ঠিক যেমন লবণ গলে জলে। আবার তিনি বিশেষভাবে কবিপ্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রকে পয়ার ও ত্রিপদীর বাঁধনে যেভাবে বেঁধেছেন তিনি, তা' ভাবলেও বিস্ময় জাগে মনে। তাঁর মত কবিপ্রতিভাসম্পন্ন কবি আর জন্মেছে

কিনা সন্দেহ। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে নানা স্থানে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ মতের সমর্থনের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত নানা গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণদাস মোট ১০২২টি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে নিজের ১১০টি, অন্য গ্রন্থের ৬৭৪টি এবং একই শ্লোকের পুনরুক্তি করেছেন ২৩৮বার। এই ২৩৮টি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যেও নিজের শ্লোক আছে। কত গভীর পাণ্ডিত্য থাকলে পরে নিজের গ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ মতের সমর্থনের জন্য এমনভাবে এত অধিক অন্য গ্রন্থের শ্লোক সন্নিবেশ করা যায়। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার সতেরটি পরিচ্ছেদে তাঁর নিজের ৪৭টি ও অন্য গ্রন্থের ১৬৫টি, মধ্য লীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে তাঁর নিজের ৩১টি ও অন্য গ্রন্থের ৪০১টি, অন্ত্যলীলার কুড়িটি পরিচ্ছেদে তাঁর নিজের ৩২টি ও অন্য গ্রন্থের ১০৮টি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অবশ্য এর বাইরে আছে পুনরুক্ত শ্লোক ঐ ২৩৮টি। মোট ১০২২টি শ্লোকের মধ্যে বহু শ্লোক আছে, যার এক একটির মধ্যে একাধিক শ্লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, তাঁর শ্রীমুখের উক্তি, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, কোন কোন ঋষির উক্তি।

শ্রীচৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের ভাবমূর্তি, তাঁর মধ্যে যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি সদা বিদ্যমান—কৃষ্ণদাস সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে তা' উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই উপলব্ধ সত্য তিনি তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন,—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখান স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥
প্রভু তারে হস্ত স্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আস্বাদন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর অঙ্গ নহে, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য রস করি আস্বাদন॥ (চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ,
রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য সাধনতত্ত্ব কথন।)

রায় রামানন্দ জানতেন যে, রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে নিজ রস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি গ্রহণ করে পৃথিবীতে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের দেহে রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্তি দেখে ধন্য হ'বার বাসনা জানালে ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত রামানন্দের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য রামানন্দকে তাঁর বাঞ্ছিত যুগলমূর্তি দেখালেন। সেই যুগলমূর্তি দেখে রামানন্দ আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। মহাপ্রভু তাঁর দেহে হাত দিলে তিনি চেতনা লাভ করলেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনার সমাবেশের নামই অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রকাশ। বৈষ্ণব ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। তাঁর এই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শন যোগপ্রসঙ্গ।

সাধ্য-সাধন তত্ত্বের মধ্যেও অতীন্দ্রিয়বাদী কৃষ্ণদাস অতি সুন্দর-ভাবে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়—সাধ্য সাধন তত্ত্বটাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। বৈষ্ণব দর্শনের, ভক্তিশাস্ত্রের, রসতত্ত্বের মূল সত্যটি নিহিত আছে এই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের মধ্যে। আর অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের চরম পরিচয় ঘটেছে এই সাধ্য-সাধনতত্ত্বের মধ্যে।

মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট পরম ভাগবত রায় রামানন্দের নাম শুনে তাঁর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় একদা মহাপ্রভু যখন গোদাবরী তীরে উপস্থিত হন, তখন রায় রামানন্দ স্নান করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। এই স্থানে উভয়ের মিলন ঘটে। রামানন্দ রায় শূদ্র, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, পরম ভাগবত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। প্রতিদিন স্নান সমাপন করে তিনি তর্পণ করেন। তাই অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁর সাথে থাকেন ঐ সময়। অবশ্য এই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা রায় রামানন্দের কৃষ্ণভক্তির বা ভক্তি-শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের সংবাদ রাখতেন না। তাঁরা শুধু মন্ত্র পড়াতেই জানতেন। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এখানে এক বৈষ্ণব বৈদিক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলে পর মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে। এই সময়

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে "সাধ্যের নির্ণয় কি ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যা সাধন করা যায়—তাই সাধ্য। সাধ্যের নির্ণয় অর্থে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—জীবের সাধনার বস্তু কি এবং কি উপায়ে সেই সাধ্যকে আয়ত্ত করতে হয়। অতএব সাধনার প্রকার ভেদ এবং সাধ্যের স্বরূপ কি—এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হয়েছিল। এর উত্তরে রামানন্দ রায় প্রথমে বলেছিলেন যে,—স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী অনুষ্ঠান পালন করলেই বিষ্ণুভক্তিরূপ সাধ্য লাভ হয়।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পরিঃ।

এই উত্তর শুনে মহাপ্রভু বলেছিলেন যে, এটা বাহ্য সাধনার অঙ্গীভূত। এর পর কি আছে তা' তিনি জানতে চান রামানন্দের কাছে।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। ঐ, ঐ, ঐ,

প্রকৃতপক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু আরাধনার হেতু বলে তাতে ভক্তির আরোপ হয়। এজন্য মহাপ্রভু "এহো বাহ্য" অর্থাৎ বাইরের কথা বলে উপেক্ষা করলেন ও এর উপরের ভক্তির কথা জানতে চাইলেন।

রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার॥—ঐ
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।—ঐ

এখানকার এই কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ কেবল ভক্তিতে অবসিত হয়নি বলে মহাপ্রভু এটাও বাহ্য সাধনা বলে উল্লেখ করেন ও তারপর কি আছে তা জানতে চান রায় রামানন্দের কাছে।

রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥—ঐ
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।—ঐ

এখানে স্বধর্ম ত্যাগ শব্দের অর্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীভগবানের শরণাগতি লাভ। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

—ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন। তুমি সকল ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক এক আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি কোনো প্রকার শোক করিও না।

কিন্তু এখানেও সমস্যা থেকে যায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীভগবানের শরণাগতি লাভ হলেও দুঃখ বিনাশ রূপ কামনা থেকে যায় বলে ওটাও সকাম ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। তাই মহাপ্রভু ওটাকেও বাহ্য গণ্য করলেন এবং এরও উপরিতন ভক্তির কথা শুনতে চাইলেন।

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥—ঐ
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।—ঐ

এ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

—ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন! ব্রহ্মেতে অবস্থিত অতএব প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, আর কোনো লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না; সর্ব প্রাণীতে সমদৃষ্টি হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।

কিন্তু এখানেও সমস্যা নিরসন হয়নি। কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তমা ভক্তি নহে। তাই মহাপ্রভু এটাকেও বাহ্য বলেছিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অর্থ নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুভবরূপ জ্ঞান। কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব অনুভূতি ব্যতীত ভক্তিই হতে পারে না। তিনি এর পরবর্তী ভক্তির কথা জানতে চাইলেন রায় রামানন্দের কাছে।

রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥—ঐ

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থে শুদ্ধা ভক্তি। অর্থাৎ ভগবানে ব্রহ্ম জ্ঞানের নিমিত্ত কোনোরূপ প্রয়াস না করে কায়মনোবাক্যে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়াকেই শুদ্ধা ভক্তি বলে। ইহার সারবত্তা স্বীকার করে—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।—ঐ

উত্তরে রামানন্দ রায় প্রেমভক্তির উল্লেখ করলেন। ইহার অর্থ এই যে সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রেম ভক্তির দ্বারা লাভ হয়। মহাপ্রভু ইহাও স্বীকার করে উহার পরে কি আছে তা জানতে চাইলেন।

রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার॥—ঐ

প্রেমভক্তির অর্থ শান্ত ভক্তদিগের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম। এই প্রেমে কৃষ্ণপর মং থাকলেও সেবা নেই। তাই মহাপ্রভু "এহো হয়" বলে এ প্রেমকে

অনুমোদন করলেন মাত্র, কিন্তু এর পর আর কি আছে তাও জানতে চাইলেন।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।—ঐ

রামানন্দ রায় ক্রমে ক্রমে দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তা-প্রেমের উল্লেখ করেন। কিন্তু দাস্যপ্রেমে ভাবময়তা থাকলেও সেবা সুখের কিছু পরিমাণ সংকোচের ভাব থাকে বলে মহাপ্রভু "এহো হয়" বলে প্রেমকে অনুমোদন করলেন মাত্র, পূর্ণ স্বীকৃতি জানালেন না। সখ্যপ্রেম দাস্যপ্রেম অপেক্ষা উন্নত, তাই মহাপ্রভু "এহোত্তম" বলে এই প্রেমের প্রশংসা করলেন। কিন্তু এর পর বাৎসল্যপ্রেম সখ্যপ্রেম থেকেও উন্নত—এই মত প্রকাশ করে "এহোত্তম" বলে এ প্রেমেরও প্রশংসা করলেন। আবার কান্তাপ্রেমকে "সাধ্যাবধি" বা সাধ্যের সীমা বলে অভিহিত করেও মহাপ্রভু বললেন,—

প্রভু কহে এই 'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥—ঐ

দাস্যপ্রেমে ভগবানকে শুধু মাত্র সেবার অধিকার জন্মে। ইহাতে সর্বদাই নিজেকে ভগবান অপেক্ষা হীন বিবেচনা করতে হয়। সখাদের কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে মমত্ব বোধ রয়েছে। তারাই শুধু বলতে পারে, 'তুমি কোন বড়লোক, তুমি আমি সম।' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করেছে। অতএব দাস অপেক্ষা তারা কৃষ্ণকে বেশী আপনার করে ভাবতে পেরেছিল। এইজন্য দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেমের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। বাৎসল্যে কৃষ্ণের প্রতি বন্ধুর ন্যায় এবং দাস্যের মত সেবা করাও চলে; কিন্তু সখারা সমবয়স্ক হেতু কৃষ্ণকে তাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে কৃষ্ণের প্রতি মমতাযুক্ত হতে পারেনি। এজন্য দাস্য ও সখ্য ভাবের অতিরিক্ত মমতাবোধ আছে বলে বাৎসল্যপ্রেমকে দাস্য ও সখ্য অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তথাপি বাৎসল্যে সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় না বলে কান্তাপ্রেমকে বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এভাবে প্রেমের তারতম্য করা হলেও বৈষ্ণবগণের মতে যে যেভাব নিয়ে সাধনা করে, তাই তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তাতেই ভগবানকে লাভ করা যেতে পারে। তথাপি তটস্থ হয়ে অর্থাৎ সেইভাবে একেবারে মগ্ন না হয়ে বিচার করলে এদের মধ্যে তারতম্য অনুভূত হবে। মধুরে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের ভাব মিশ্রিত আছে বলে একে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মধুর ভাবের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গোপীও কৃষ্ণকে কান্তাভাবে ভজনা

করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাদের প্রেম অপেক্ষা রাধার প্রেমই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করেছিলেন। কারণ রাধা যখন মান করে রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তখন কৃষ্ণ সকল গোপীকে পরিত্যাগ করে রাধার অনুসন্ধানে ধাবিত হয়েছিলেন। অতএব রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।

কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার শুনেও মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে আর কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে,—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥—ঐ

ইহার পর মহাপ্রভু কৃষ্ণ ও রাধার স্বরূপতত্ত্ব জানতে চাইলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ সর্ব প্রথম কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥—ঐ

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিহীন ও সকলের আদি। তিনিই সর্ব কারণ অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তি স্থল। তিনিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ। তিনিই যশোদানন্দন। তিনিই পরমেশ্বর। তিনি পীতাম্বর বনমালী। তিনিই মদনমোহন মূর্তিতে রাস লীলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনন্ত লীলাময় এই শ্রীকৃষ্ণ।

অতঃপর রায় রামানন্দ রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। অনন্ত লীলাময় এই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তিন প্রধান অংশে বিভক্ত। চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা, জীবশক্তি বা তটস্থা। এই অন্তরঙ্গার অপর নাম স্বরূপ-

শক্তি। এই স্বরূপশক্তি আবার তিন অংশে বিভক্ত। সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দ অংশে হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনীর সার অংশের নাম প্রেম। প্রেমের পরম সার মহাভাব। শ্রীরাধা এই মহাভাবরূপা।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥—ঐ

প্রেমভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীবের পঞ্চম বা চরম পুরুষার্থরূপে অঙ্গীকৃত হয়েছে। সেই প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের অন্যতম স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরই সর্বোৎকৃষ্ট পরিণতি। ভগবান যে শক্তি দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও অপর বস্তু সকলকে ধারণ করেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। ভগবান স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হয়েও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের আশ্রয় হয়েন এবং জীবসমূহকেও জ্ঞানের আশ্রয় করে রাখেন, সেই শক্তিরই নাম সম্বিৎ। ভগবান স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও সম্বিৎ শক্তির উৎকর্ষের সারস্বরূপ যে শক্তিদ্বারা সেই স্বরূপভূত আনন্দ স্বয়ং অনুভব করেন এবং অপর জীব সকলকে অনুভব করান, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী।

রতি বা ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম, এটাই ভক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবানই আনন্দ এবং সেই আনন্দরূপ নিজ আত্মাকে আস্বাদন

করবার এবং জীবমাত্রকে আস্বাদন করাবার শক্তিই হলাদিনী। যেহেতু তাঁহাতে তাঁরই স্বরূপভূত হয়ে তিনিই সর্বদা অবস্থিত। সেই কারণে ভগবদ্‌বিষয়ক রতি বা অনুরাগ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। এ সংসারে প্রাণীমাত্রেই সুখ চায় এবং সেই সুখ চাইবার হেতু যে আসক্তি, তার নামই রতি। আমরা চলিত কথায় তাকে প্রেম বা ভালবাসা বলে থাকি।

মানবহৃদয়ে থাকে সুখভোগের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এটা প্রাণীমাত্রেরই আজন্মসিদ্ধ ও আমরণস্থায়ী স্বভাব। এই স্বভাবই আমাদিগকে জানিয়ে দেয় যে, আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে হলাদিনী শ্রীভগবানের আনন্দঘন শ্রীমূর্তিকে দেখিয়ে আমাদিগকে সেই আনন্দ ভোগ করাবার জন্য কাজ করে চলেছে। মায়া শক্তির প্রভাবে পড়ে জীব আত্মস্বরূপ ভুলে যায়, তার অন্তর্মুখী দৃষ্টি বহির্মুখীতে পরিণত হয়। অন্তরের নিত্য সিদ্ধ আনন্দকে সে প্রাকৃত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কবিশেষের কার্য বলে মেনে নিয়েছে। এই মায়ার রাজ্য থেকে তাকে বাইরে আনতে হ'লে যা কিছু করা আবশ্যক, তা' এই হলাদিনীই করে চলেছে।

ভগবানের হলাদিনী শক্তির বিকাশে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের স্থায়ী ভাবকে মহাভাব বলে। এই মহাভাবই চিন্তাসমূহের সার চিন্তা বা চিন্তামণি বলে অভিহিত। ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপবিগ্রহ।

> প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
> কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
> সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
> কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥—ঐ

সুতরাং চিন্তামণি যার বস্তু, চিন্তামণি তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ঠিক তেমনই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বস্তু, তাই তিনি কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। এরপর মহাপ্রভু স্বীকার করলেন যে, এই রাধা প্রেমই "সাধ্য-শিরোমণি"। তারপর মহাপ্রভু এই সাধ্যবস্তু কিরূপ সাধনে লাভ করা যায়, তা' জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে রায় রামানন্দ বললেন যে, দাস্যবাৎসল্যাদি-ভাবে এই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না। একমাত্র মধুর রস আস্বাদন করে সাধনা করলে এই সাধ্যবস্তু লাভ হ'তে পারে। তন্মধ্যে সখীগণের ভাব অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। কারণ—এই সখীগণের আত্ম-ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নেই। রাধা-কৃষ্ণের মিলন রূপ অপ্রাকৃত লীলা ঘটিয়ে এরা আত্মসুখ অনুভব করে। এজন্য

এরূপ নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ অবলম্বন করে সাধনা করলেই সাধ্যবস্তু লাভ হ'তে পারে। এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি আর।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥—ঐ

অতীন্দ্রিয়বাদী কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থের নানা স্থানে অতীন্দ্রিয়ভাবের সমাবেশ করেছেন। আদি লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বর্ণনায় অতীন্দ্রিয়ভাবের সুন্দর বর্ণনা আছে। এটি হোলো শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার ক্ষণের ঘটনা। যে শুভ মুহূর্তে মহাপ্রভু শচীগর্ভে প্রবেশ করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করে কৃষ্ণদাস ক্ষেত্র তৈরী করে রাখছেন। এইভাবে অলৌকিক ঘটনার বিন্যাসই অতীন্দ্রিয়বাদী কবির কৃতিত্বের পরিচয়। মহাপ্রভু যে কৃষ্ণের অবতার, তিনিই তো পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ। তার মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য হোলো প্রেমধর্ম প্রচার। তাই তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ হ'বেই। এই বর্ণনায় অতীন্দ্রিয়বাদী কৃষ্ণদাস লিখেছেন,—

চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব লোক করেন সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান ॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি যেন স্তুতি করে ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে মুঞি স্বপ্ন দেখিল।
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥

আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হৈঞা।
শালগ্রাম সেবা করেন বিশেষ করিয়া॥
হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হ'বে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যা কালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সব সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌর চন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে" ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক বলে "হরি হরি"।
সেই ক্ষণে "গৌর কৃষ্ণ" ভূমি অবতারি॥

(চৈঃ চঃ, আদি, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

আদি লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণদাস অতীন্দ্রিয়ভাবের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। শিশু প্রভু শুধু উত্তানশয়নে থাকেন। অথচ গৃহ মধ্যে লঘু পদ চিহ্নে ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্ধ্বরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্ধচন্দ্র, অম্বর, মীন, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ, আতপত্র—এই উনিশ প্রকার চিহ্ন বর্ত্তমান। ঠিক এই সময় শচী-দেবী নিমাইকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাবার সময় তাঁর পায়ে উক্ত চিহ্নগুলি দেখে মিশ্র জগন্নাথকে ঐ তথ্য জানালেন। জগন্নাথ মিশ্রও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে সব সংবাদ বললেন। চক্রবর্ত্তী শিশু নিমাইকে মহাপুরুষ বলে অভিহিত করলেন। জানু-চংক্রমণ কালে ক্রন্দনের ছলে হরিনাম করা, পাদ-চংক্রমণ কালে মৃত্তিকা ভক্ষণ, অতিথিবিপ্রের অন্নগ্রহণ, চোরকে ভুলিয়ে নিজের ঘরে আনা, কুমারীগণকে বরদান, লক্ষ্মীদেবীর প্রতি সাহজিক প্রীতি ও

অদৃশ্যভাবে থেকে দেবগণ কর্তৃক শিশু নিমাই-এর স্তুতি প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যেও অতীন্দ্রিয়ভাবের পূর্ণ পরিচয় আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদেও কৃষ্ণদাস অতীন্দ্রিয়ভাবের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মহাপ্রভুর যৌবন কাল। অঢেল যৌবন শ্রীর অধিকারী তিনি। কিন্তু সে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর তাঁর সেই যৌবনশ্রী। এই সময় গয়াতে তর্পণের পর ভক্ত ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে হোলো তাঁর মিলন। যে বিদ্যা-ঔদ্ধত্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, এই মিলনের ফলে তা দূর হয়ে গেল। মহাপ্রভুর মধ্যে প্রেমের প্রকাশ দেখা গেল। দীক্ষা নিলেন তিনি ভক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর কাছে। এর পর দেশে এসে মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে বিশ্বরূপ দেখালেন, শ্রীবাসের গৃহে ষড়্‌ভুজ ধারণ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার, সপ্তপ্রহর ভাবাবেশে অবস্থিতি, মুরারি-ভবনে বরাহ-আবেশ, আম্র-মহোৎসব, জ্যোতিষকে মহাজ্যোতির্ময়রূপ দেখানো, কাজী দলন ও শ্রীবাস আলয়ে সংকীর্তন প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যেও অতীন্দ্রিয়ভাব বর্তমান।

মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদেও কৃষ্ণদাস অতীন্দ্রিয়ভাবের অভিনব পরিচয় দিয়েছেন। মহাপ্রভুর জীবনে অতীন্দ্রিয়ভাবের সঙ্গে সত্য ও অহিংসার সমাবেশ ঘটিয়ে নূতন চিন্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন তিনি বিশ্ববাসীকে। অহিংসা পরম ধর্ম—প্রাচীন আর্যঋষিদের এই বাণী মহাপ্রভুর জীবনের মধ্য দিয়ে নূতন ভাবে প্রচার করলেন কৃষ্ণদাস। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আজকার দিনে মহাপ্রভুর জীবন-সত্যটি গ্রহণ করলে মানবজাতির কল্যাণ হবে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে পৃথিবী।

নীলাচল থেকে যাত্রা করেছেন মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে। সাথে তাঁর একমাত্র সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য। প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে তিনি চললেন উপপথ ধরে। কটক ডাইনে রেখে নির্জন বনমধ্য দিয়ে তিনি চলেছেন। মুখে তাঁর অবিরাম কৃষ্ণনাম। বাঘ, হাতী, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি বন্য পশুরা পথ ছেড়ে দিল মহাপ্রভুকে। প্রেমময় প্রভুর অন্তর যে প্রেমে পূর্ণ। প্রেমদান তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রাণীমাত্রেই তাঁর প্রাণতুল্য। তিনি যে অজাতশত্রু। বনের হিংস্র পশুরাও তাই তাঁর প্রাণতুল্য। তাই তারাও সেই প্রেমময় মহাপ্রভুর প্রেমে আবিষ্ট হয়েছিল। তারা হিংসা ভুলে তাঁর সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করেছিল। এমন হয়। মন থেকে হিংসা

দূরীভূত হলে, সম্পূর্ণ অহিংস হলে পৃথিবীতে কেহ শত্রু থাকে না তার। এ বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে আছে আমাদের। সূর্যালোকের মত সত্য এ তত্ত্ব।

ধ্রুব উপাখ্যানের মধ্যেও এই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। মায়ের কাছ থেকে ধ্রুব জেনেছিল যে, হরিকে আনতে পারলে তার মায়ের দুঃখ ঘুচে যাবে। ধ্রুব আরও জেনেছিল যে, হরি সর্বত্র আছেন। পালিয়ে গেল সে হরির খোঁজে। "কোথায় হরি, কোথায় হরি"—এই শুধু তার মুখে। বাঘের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি কি হরি?" সিংহের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বলে,— "তুমি কি আমার হরি?" এমনই করে বনের সব পশুকে ঐ এক প্রশ্ন করে ধ্রুব। লজ্জায় মাথা নিচু করে পালিয়ে যায় সবাই। তারা তো তার হরি নয়। অহিংসার প্রভাব এমনই। অহিংসকে দেখলে লজ্জায় পালিয়ে যাবে হিংসা। ইহাই সত্য।

অহিংস হয়ে অহিংসার বাণী সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করা যায়। আর সে প্রচার সফল হয়। বহুবার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে জগতের বুকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—সমগ্র অন্তর দিয়ে অহিংস হ'তে হবে।

মহাপ্রভু উপপথে চলেছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে।

নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখিয়া ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়।
একদিন পথে ব্যাঘ্রে করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায় প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিন মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জল পান॥
প্রভু জলকৃত্য করে আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥

সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়॥ চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

বনপথে চলতে মহাপ্রভুর বড় আনন্দ হয়েছিল। বলভদ্রকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন,—

শুন ভট্টাচার্য আমি গেলেম বহু দেশ।
বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল॥—ঐ

কৃষ্ণদাসের এই বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে Shakespeare-এর বর্ণনা। As you like it-এ নির্বাসিত Duke Senior যখন Forest of Arden-এ ছিলেন, তখন তিনিও বনবাসের আনন্দময় দিকটি দেখেছেন। মনে হয়, এটা Duke-এর উক্তি নয়, এটা Shakespeare-এর নিজেরই উক্তি।

Duke S. Now, my co-mates and brothers in exile,
Hath not old custom made this life more sweet
Than that of pointed pomp? Are not these woods
More free from peril than the envious court?
Here feel we but the penalty of Adam,—
The seasons' difference : as the icy fang
And churlish chiding of the winter's wind,
Which when it bites and blows upon my body,
Even till I shrink with cold, I smile and say,
This is no flattery : these are counsellors
That feelingly persuade me what I am.
Sweet are the uses of adversity;
Which, like the toad, ugly and venomous,
Wears yet a precious jewel in his head;
And this our life, exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones, and good in everything,

—Act II, Sc. I.

বনের সৌন্দর্য রঘুকুলবধূ সীতাকেও ভুলিয়েছিল। দণ্ডকে অবস্থিতিকালে তিনি এতই আনন্দে ছিলেন যে, অযোধ্যার আনন্দও ম্লান হয়েছিল। অতি

সুন্দরভাবে তিনি দণ্ডক অরণ্যের আনন্দের কথা বলেছেন প্রিয়সখী সরমার কাছে—

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুল বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? (৪র্থ সর্গ, মেঘনাদ বধ কাব্য)

মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তির পরিচয় কৃষ্ণদাস তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নানা স্থানে দিয়েছেন। অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের এক চমৎকার নিদর্শন মেলে। বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরেছেন। এই সংবাদ গৌড়ে এলে পর গৌড়ের ভক্তগণ তাঁকে দেখবার জন্য নীলাচলে গেলেন। কুলীনগ্রামী ও খণ্ডবাসী ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের সঙ্গে চললেন নীলাচলে। তাঁদের সাথী হোলো একটি কুকুর। কিন্তু পথিমধ্যে সেই কুকুর শিবানন্দকে ছেড়ে তাঁর আগেই আশ্রয় নিয়েছে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। দুঃখিত শিবানন্দ প্রভুর কাছে এসে দেখলেন, সেই কুকুর মহাপ্রভুর পাশে অল্প দূরে বসে আছে। মহাপ্রভু সেই কুকুরকে নারকেল-শাঁস প্রসাদ দিচ্ছেন, আর তাকে কৃষ্ণ, রাম, হরি বলতে বলছেন। কুকুরও মহানন্দে প্রসাদ খেয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলছে। কৃষ্ণ নাম বলে বলে কুকুর সিদ্ধ-দেহ লাভ করে বৈকুণ্ঠ পেয়ে গেল। এই অলৌকিক তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের অতি মানবীয় শক্তির সঙ্গে মহাপ্রভুর এই অলৌকিক শক্তির সামঞ্জস্য আছে।

আসিয়া দেখিল তবে সেই ত কুক্কুরে।
প্রভুর পাশে বসি আছে কিছু অল্প দূরে॥
প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া।
"কৃষ্ণ, রাম, হরি" কহ, বলেন হাসিয়া॥

শস্ত খায় কুক্কুর, কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ হৈলা॥
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন। (চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ১ম পরি)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ," চতুর্দশ পরিচ্ছেদে "দিব্যোন্মাদ প্রারম্ভ", পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে "মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উদ্যান-বিলাস" ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে "দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন এবং জালিকের জালে উদ্ধার"-প্রসঙ্গ কৃষ্ণদাসের অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ। অতীন্দ্রিয়বাদী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের সমাবেশ ঘটিয়ে যে অদ্ভুত কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা হয় না। অলৌকিক কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কৃষ্ণদাস। তাই অতি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে।

গোবিন্দদাসের কড়চা—গোবিন্দদাস কর্মকার বর্ধমানের কাঞ্চন নগরের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সঙ্গী হয়ে তিনি ভ্রমণের নোট বা ডায়েরী লিখে রাখতেন। ইহাই তাঁর কড়চা। কিন্তু অনেকে এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এখানে বিস্তৃতভাবে অন্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

॥ ৭ ॥

অতীন্দ্রিয়বাদের রূপান্তর—দ্বিতীয় পর্যায়। শাক্ত পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

বাঙলার প্রকৃতি বাঙালীকে শক্তি পূজায় প্রেরণা দান করেছিল। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙলার প্রকৃতির বিভিন্ন মূর্তি দেখা যায়। প্রকৃতি কোন্ ঋতুতে হাস্যময়ী মূর্তি ধারণ করেন, কোন ঋতুতে আবার ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আবির্ভূত হন। বাঙলার প্রকৃতি কখন তার সন্তানের বুকে ভীতির সঞ্চার করে, আবার অন্য ঋতুতে তার সন্তানকে বরাভয় দান করে। বাঙলার প্রকৃতির এই বিশিষ্ট ভাবটিকে বাঙালী আদ্যাশক্তির লীলারূপে নিয়েছে। আর এই লীলার পরিকল্পনা থেকেই বাঙালী শক্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই আদ্যাশক্তিকে বাঙালী শিবের গৃহিণী উমা, গৌরী, পার্বতী প্রভৃতি নামে অভিহিত করে পৌরাণিক উমা-মহেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন করে ফেলেছে। এর ফলে বাঙলা দেশ শক্তিসাধনার কেন্দ্র হয়েছে। প্রাচীন কালে বাঙালী তান্ত্রিক সাধকেরা যেভাবে শক্তি সাধনা করেছিলেন, অষ্টাদশ শতকে শাক্ত কবিরা শক্তি-দেবতাকে সেভাবে না নিয়ে শক্তি দেবতার ভিন্ন ভাবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রসস্রোত এই সময় মন্দীভূত হয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তে শাক্ত-কবিদের আবির্ভাব হোলো। তাঁরা পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণে এক নূতন গীতি-সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন। বর্তমানে ইহাই শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পর্যায় ভেদে শাক্ত-সাহিত্য দুই প্রকার। আখ্যান জাতীয় কাব্য ও গীতি-কবিতা। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি আছে, শাক্ত পদাবলীর মধ্যে সেই সৌন্দর্য সুষমা না থাকলেও গ্রাম-বাঙলার সমাজ জীবনের সুন্দর ছবি অনেকটা অভাব পূরণ করেছে। শাক্ত কবিরা শক্তি দেবতাকে কখনও মাতৃভাবে আবার কখনও কন্যাভাবে নিয়েছেন। তাই শাক্ত পদাবলীর মধ্যে এক দিকে শক্তি দেবতার জগজ্জননী, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হারিণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা প্রভৃতি রূপের কল্পনা আছে, অন্যদিকে বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া বর্ণনাও আছে। উপাস্যা দেবীকে উদাত্ত কণ্ঠে বাঙালী সাধক যেমন করে 'মা' বলে ডেকেছে, পৃথিবীর আর কোন জাতি তেমন করে ডাকতে পারেনি। আবার সেই উপাস্যা দেবীকে কন্যারূপে সাজিয়ে ভক্ত সাধক যে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি

করেছেন, আর কোন জাতি তা' পারেনি। বাঙালীর বিশিষ্টতা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে চির অম্লান থাকবে।

শাক্ত কবিরাও বৈষ্ণব কবিদের মত অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের পথই তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। ভাবের দিক দিয়ে আছে নিকট সম্বন্ধ। তফাৎ আছে সামান্যই। বৈষ্ণব কবিরা ভগবানকে নিয়েছেন প্রভু, পুত্র, সখা ও প্রাণপতিরূপে আর শাক্ত কবিরা উপাস্য দেবতাকে নিয়েছেন মাতৃভাবে আর কন্যাভাবে। উভয় সম্প্রদায়ই ভগবানকে স্বর্গে নির্বাসিত না করে, ব্যবধান সৃষ্টি না করে, নিয়েছে অতি আপনার করে। ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। ভগবানের কাছে ভক্ত বলেছে অকপটে তার প্রাণের কথা, নিবেদন করেছে মনের ব্যথা। এই সাধনাই অতীন্দ্রিয় সাধনা। এ সাধনা তুলনাহীন। পৃথিবীর আর কোথায়ও এ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন ভাবে ভগবানকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে শুধু বাঙালী অতীন্দ্রিয়বাদী কবিরাই। তাই বিশ্বসাহিত্যে এই কবিতাগুলি অমূল্য সম্পদ।

শক্তিপূজায় বাঙালী নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু শক্তিপূজা অতি প্রাচীন কালের। শক্তিপূজার প্রথম পরিকল্পনা পাওয়া যায় মিশরে। অবশ্য প্রাচীন মিশরের সেই শক্তিপূজার পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের শক্তি পূজার প্রভেদ বিস্তর। মিশরের ঐ পরিকল্পনাকে বলা যায় নারী-ঈশ্বর বা নারীমূর্তিতে ঈশ্বর। এর পর ব্যবিলনেও ঐ পরিকল্পনার প্রসার লাভ ঘটে। পাশ্চাত্যের ক্যাথলিকরা ভার্জিন মেরীর উপাসনা করে। আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে এখানে অনার্যদের বাস ছিল। অনার্যদের শবর জাতি বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী দেবীর পূজা করত। দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃপূজার বহুল প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত মূর্তিতে মাতৃদেবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"The objects found at Mahenjo-Daro also teach us something about the religious faith and beliefs of the people. The cult of the Divine mother seems to have been widely prevalent and many figurines of the Mother-Goddess have come to light."

"This cult may not be exactly the same as the Sakti worship of later days, but the fundamental ideas appear to be the same, Viz., the belief of a female energy as the source of all creation." (Ancient India, Part-1 Page 20, Dr. R. C. Majumder & Others.)

অবশ্য আর্যরা পুরুষ দেবতার পূজাই করতেন। ঋগ্‌বেদে নারী দেবতার পরিচয় পুরুষ দেবতার স্ত্রীরূপে এবং কন্যাসম্বন্ধে। ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী—স্ত্রীরূপে আর্যদের কাঁছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। আবার রাত্রি, উষা দৌস্পিতার কন্যারূপে সম্মান লাভ করেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে প্রকৃতির এক একটি রূপকে পুরুষভাবে নিয়ে পৃথক পৃথক নাম দিয়ে আর্যগণ তাঁদের স্তোত্র গান করতেন। ঋগ্‌বেদে এইগুলিই সূক্ত নামে অভিহিত।

ভাবলেও আশ্চর্য্য লাগে যে—বেদের অনেক সূক্তই নারীরচিত। তবু নারী-দেবতার স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটেনি। সম্ভবতঃ এর মূলে ছিল সামাজিক প্রভাব। অনার্যদের সঙ্গে বুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আর্যসমাজে মায়ের প্রাধান্য ছিল এবং সমাজও ছিল মাতৃপ্রধান। এর পর সমাজের গতি হোলো পরিবর্তিত। সেই পরিবর্তনের মূলে ছিল আর্য-অনার্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে জাগ্রত হোলো আর্যদের পৌরুষ। এরই ফলশ্রুতিতে আর্যসমাজের গতি হয়েছিল পরিবর্তিত। তাই মাতৃপ্রধান সমাজ পরিণত হোলো পিতৃপ্রধান সমাজে। অবশ্য ঘরেতে মাতৃপ্রধান্যই থেকে গেল। আর সে প্রাধান্য আজও আছে।

কিন্তু প্রাধান্য ও পূজা এক নয়। যে মা সন্তানকে পালন করেন, যাঁর সমগ্র চিন্তা গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, পল্লবিত হয়, যাঁর প্রাণ থেকে সন্তান প্রাণ লাভ করে, যাঁর বাকশক্তিতে সন্তান হয় শক্তিমান, যাঁর হাসি কেড়ে লয় সন্তান, সেই মা সন্তান কর্তৃক পূজিতা না হয়ে থাকতে পারেন না। আর্যগণ অল্প দিনেই মায়ের মহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বললেন,—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাই পরম তপস্যা, পিতা সন্তুষ্ট হলে সর্ব দেবতা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তার পরেই উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ। আবার বললেন,—যত গুরু আছেন, তাঁদের মধ্যে মাতাই পরম গুরু, পৃথিবীতে পিতার উপরেও মাতা গুরুতরা।

এর পর আরম্ভ হোলো মাতৃপূজা। শুক্ল যজুর্বেদে বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা এবং হৈমবতীর নাম আছে। নারায়ণ উপনিষদের দুর্গা-গায়ত্রীতে আছে দুর্গা নাম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ৫৭ অধ্যায়ে শক্তির দুর্গা, নারায়ণী,

ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী; সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী প্রভৃতি নাম পাওয়া যাচ্ছে। পুরাণোক্ত চণ্ডী নামের সঙ্গে অনার্যদের মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডীর নামের সামঞ্জস্য আছে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে এসে নিশ্চয়ই এই চণ্ডীর পূজা করতে শিখেছে। Mr. S. C. Roy-এর Oraon Religion and Customs—Ranchi, 1928 থেকে পাওয়া যাচ্ছে,—"Some of the Spirits, however, such as Chandi, the Goddess of hunting and war, are remarkable for shape-shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of the Oraon Pantheon."

চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর গোধিকা, মৃগী ও ষোড়শী যুবতী মূর্তি ধারণ ও ওরাওঁ জাতির মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডীর রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, চণ্ডীই উক্ত অনার্য জাতির মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা চাণ্ডীর রূপ গ্রহণ করেছে।

বেদ, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত অথবা প্রাচীন পুরাণে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায় না। মধ্য যুগের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রগুলি, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীর পরিচয় আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণোক্ত শক্তি দেবতার বিভিন্ন নাম সম্পর্কে R. G. Bhanderkar লিখেছেন,—

"The critical eye will see that they are not merely names but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus." —Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems (1913)-Page 143—144.

পৃথিবীর বহু সমস্যায় যেমন সমাধান হয় নি, লৌকিক চণ্ডী—ওলাই চণ্ডী, মেলাই চণ্ডী, মাকড় চণ্ডী প্রভৃতি—বা অর্ব্বাচীন পুরাণোক্ত চণ্ডীর বাঙলার তথা ভারতীয় জনসমাজে স্থায়ীভাবে পূজা গ্রহণ সমস্যারও সমাধান হয়নি। পণ্ডিত ও সমালোচকগণের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠ করলে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে ও মস্তকের পীড়াই বৃদ্ধি করে। যে দেশে মতের ও পথের সীমাসংখ্যা নেই, সে দেশে

কিভাবে কোন্ উপদেবতা বা কল্পিত দেবতা জনসমাজে পূজাবেদীতে স্থান পেয়েছেন, তা' বলা শক্ত। তবে স্থান যে পেয়েছেন, এটা সর্বাপেক্ষা বড় সত্য। এ অপেক্ষাও বড় সত্য হোলো যে, এই লৌকিক চণ্ডীই মূর্তিভেদে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে শিবের ঘরণী রূপে আদৃত হয়েছেন। আমরা 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'—বলে তাঁরই উপাসনা করছি।

মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সত্তার অভেদ কল্পনা করে আনন্দ ও শক্তি লাভ করে। এই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত অণুপরমাণুকেও মানুষ আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই মানব জগতের হিতে ও জগতের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার আকুলতা প্রকাশ করেছে। নিজের যা কিছু আছে সমস্তই, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত বিশ্বের হিতের জন্য সমর্পণ করতে উন্মুখ হয়েছে। নিজেকে বিশ্বের হিতের জন্য উৎসর্গ করাই ছিল আর্য-ঋষিদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে উপলক্ষ করে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রাচীন আর্যঋষিরা প্রকৃতির মধ্যেই অভীষ্ট দেবতার কল্পনা করেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁরা নিরাকার প্রকৃতিকেই বিভিন্ন ভাবে পূজা করেছিলেন। পরে নিরাকারকে আকারে গ্রহণ করে, অসীমকে সসীম, অনন্তকে সান্তের মধ্যে কল্পনা করে, নিজের মধ্যে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে, পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার আবার জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই থেকে মানুষ নিজের মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করে অভীষ্ট দেবতার জন্য অভিসার করেছিল। প্রকৃতির শক্তিকেই মানুষ অভীষ্ট দেবতারূপে নিয়ে ধন্য হলো।

বাঙলার প্রকৃতিই বাঙালীকে শ্যাম ও শ্যামারূপে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলার প্রকৃতি বাঙলার বৈষ্ণব কবিকে শ্যামরূপ পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়েছিল, আর শাক্ত কবিকে দিয়েছিল শ্যামামায়ের পরিকল্পনার প্রেরণা। অবশ্য তান্ত্রিক সাধকেরা শক্তি দেবতাকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবিরা শক্তি দেবতাকে সেভাবে গ্রহণ না করে তাঁকে গ্রহণ করলেন পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধক কবিদের অনুকরণে। তবে তা অন্ধ অনুকরণ নয়।

রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র রায় (১৭১২-৬০)—সন্ধিযুগের কবি ভারতচন্দ্রের সময় পর্যন্ত বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে মঙ্গল কাব্য ও প্রাচীন ধারার পৌরাণিক শক্তি দেবতার প্রভাব ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত হলেও এর ভাবধারা মঙ্গল কাব্যের ভাবধারা থেকে পৃথক। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে অন্নদার মহাত্ম্য বর্ণিত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডের কালিকামঙ্গল বা বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী ও তৃতীয় খণ্ডের মানসিংহের যশোর অভিযানের কাহিনী মানবিক রসে পূর্ণ ছিল। এখানেই কাব্যে মানবের জয়ধ্বনি প্রথম শোনা গেল। কাব্য-সাহিত্যের এই মৌল রূপান্তর সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন আলোক সম্পাত করলো। অবশ্য ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে যেভাবে কালীর স্তব পরিবেশিত হয়েছে, তা একান্তই প্রাচীন ধারার পৌরাণিক শক্তি দেবতার স্তব। ভারত চন্দ্রেই এই ধারার সমাপ্তি।

রামপ্রসাদ—প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পুষ্ট রামপ্রসাদ সেন ১৬৪৪ শক অর্থাৎ (১৬৪৪ + ৭৮) ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক কালে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলীর দেওয়ান (ইংরাজ ফ্যাক্টরীর ?) রাজকিশোর রায় তাঁর কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার। মহাকালীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিনি। তবে তাঁর উপাস্যা দেবী মহাকালী বৎসলা জননী, মঙ্গলময়ী, বরাভয় দাত্রী, সুহাসিনী, সুমধুর ভাষিণী। এই মায়ের সঙ্গে মাতৃভক্ত সন্তান রামপ্রসাদের সম্পর্ক অবোধ ছেলের মত। বৈষ্ণব কবিদের মত রামপ্রসাদও অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। উপাস্যা দেবীকে মাতৃভাবে উপাসনা করা, আকুলভাবে 'মা মা' বলে ডাকা, মায়ের উপর অভিমান করা, মায়ের সম্ভ্রম রেখে গালি দেওয়া, আবার মাকে কন্যা সাজিয়ে স্বামিগৃহে পাঠিয়ে বিচ্ছেদ ব্যথায় আকুলতা প্রকাশ করা অতীন্দ্রিয়ভাবের পরিপূর্ণ পরিচয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আর গৌড়ীয় শাক্ত কবিরা পদাবলী সাহিত্যে বিশ্ববরেণ্য। এর তুলনা হয় না।

শাক্ত পদাবলী ছাড়াও রামপ্রসাদ 'কালী-কীর্তন,' 'কৃষ্ণ কীর্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর' নামে কাব্য লিখেছিলেন। তবে তিনি বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন পেতেছেন 'প্রসাদী সঙ্গীতের' জন্য। 'প্রসাদী সুরে' প্রসাদী সঙ্গীতে মুগ্ধ হন না এমন লোক নেই। ভাগিনী নিবেদিতা রামপ্রসাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেছেন,—"**It is to reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of European art, a great Indian Singer and Saint**

should have been deep in observation of the little ones, studying them, and sparing every feeling, almost without knowing himself". Two Saints of Kali.—page 52.

শক্তি সাধনার রূপান্তর—শক্তিকে নারী দেবতা রূপে গ্রহণ করে, অসীমকে সসীমে এনে, অরূপকে রূপে এনে বাঙালী শাক্তসাধক তিন পর্যায়ে সাধনা করেছিলেন। এই তিন ধারা—পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার নামে অভিহিত হয়। বাঙালী সাধকের মানস লোকে শক্তিসাধনার চিন্তা এলে পর তাঁরা ক্রমে ক্রমে ঐ তিন পথে সাধনায় অগ্রসর হন। সাধনার ক্রমবিকাশে পশ্বাচার সাধনা থেকে সাধক অগ্রসর হন বীরাচার সাধনায়। আবার বীরাচার সাধনার পরে আরও উন্নত স্তরে অগ্রসর হয়ে তাঁরা দিব্যাচার সাধনার পথে পরিক্রমা আরম্ভ করেন। অবশ্য বৈদিক সাধনার মত শক্তি সাধনার শেষে মুক্তির কথা। বেদান্তে ভগবান জ্ঞানস্বরূপ, বৈষ্ণব দর্শনে ভগবান প্রেমস্বরূপ আর শক্তি সাধকের কাছে ভগবান শক্তিস্বরূপ অর্থাৎ **force incarnate.**

পশু অর্থে শাক্ত সাধকেরা গ্রহণ করেছিলেন সাধারণ মানবকে। শাক্ত সাধনার এই প্রথম স্তরে অর্থাৎ পশ্বাচার সাধনায় তাঁরা কঠোর সংযমী হয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজা ও ধ্যানে সমাহিত থাকতেন। দ্বিতীয় স্তরে বীরাচার সাধনা। শক্তিকে শাক্ত সাধকেরা এখন নাম দিলেন কুলকুণ্ডলিনী। কোটি বিদ্যুতের প্রভার মত তাঁর দেহকান্তি। এখানে লক্ষণীয় গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত মহাত্মা বিশ্বরূপের দেহপ্রভা। মহাত্মা বিশ্বরূপের দেহপ্রভার বর্ণনায় আছে—যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তা হলে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হতে পারে।

কুলকুণ্ডলিনীর দেহপ্রভা কোটি বিদ্যুতের প্রভার তুল্য হলেও বিসতন্তুর মত তিনি সূক্ষ্ম এবং সার্ধ ত্রিবলয়ে অর্থাৎ সাড়ে তিন পাকে অবস্থিত নিদ্রিত ভুজঙ্গের মত। শাক্ত সাধকের সাধনা হোলো—এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। আর তার পর এই শক্তিকে শিবের সঙ্গে মিলিত করে শিব এবং শক্তির মিলন দেখে, মঙ্গলময়ের সঙ্গে মঙ্গলময়ীকে প্রত্যক্ষ করে, আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দময়ীকে অনুভব করে শাক্ত সাধক আনন্দলোকে বিচরণ করেন। এইখানেই তাঁর সাধনায় সিদ্ধি। এই-ই শাক্ত সাধকের মুক্তি।

তা'হলে বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, জীব ও ব্রহ্ম আর সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ এবং শাক্ত সাধকের শক্তি ও শিব—এর মধ্যে প্রভেদ

কোথায়? পথের শেষে গন্তব্য স্থান সকলের এক। তবে প্রভেদ একটু আছে, একেবারে যে নেই তা' নয়। বৈষ্ণব সাধক যেখানে রসময়কে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে রস অস্বাদন করে সন্তুষ্ট হন, শাক্ত সাধকেরা সেখানে মুক্তিকামী।

এখন প্রশ্ন হোলো—শিব কোথায় থাকেন? শিব থাকেন সহস্রার-এ সহস্রদল পদ্মে। শাক্ত সাধক সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলেন। নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী নিম্নাভিমুখী থাকেন। জাগ্রত হ'লে তিনি অন্তর্মুখী হ'ন, তাঁর ঐ সাড়ে তিন পাক আস্তে আস্তে খুলে যায়, তিনি ঊর্ধ্বমুখী হন এবং ক্রমে ক্রমে ষট্‌চক্রভেদ করে সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত হন।

ষট্‌চক্রের অবস্থান সম্বন্ধে শাক্ত সাধকেরা বলেছেন যে, মেরুদণ্ডের বাম দিকে ইড়া, দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা আর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী আছে। দেহ মধ্যে যেভাবে নাড়ীগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার আবর্তকে নাড়ীচক্র বলে। দেহ মধ্যে ছয়টি নাড়ীচক্র আছে। এরা হোলো—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র। মূলাধারে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। সাধক সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুললে পর এই শক্তি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মূলাধারের উপর অবস্থিত স্বাধিষ্ঠানে উঠে যায়। এখান থেকে ঐ জাগ্রতা শক্তি উত্থিত হয়ে নাভিদেশের বিপরীত দিকে অবস্থিত মণিপুরে যায়। তারপরে যায় হৃদ্‌পিণ্ডের বিপরীত দিকে অবস্থিত অনাহত চক্রে। সেখান থেকে কণ্ঠের বিপরীত দিকে অবস্থিত বিশুদ্ধচক্রে যায়। তারপর যায় ভ্রূদ্বয় মধ্যে অবস্থিত মেরুদণ্ডের শেষ সীমায় আজ্ঞাচক্রে। সর্বশেষে উত্থিত হয় আজ্ঞাচক্রের উপরিস্থ সহস্রার-এ বা সহস্রদল পদ্মে। (দ্রষ্টব্য—দার্শনিক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'তন্ত্রের আলো' পৃঃ ১৭১-১৮২)।

ষটচক্র ভেদ করে কুলকুণ্ডলিনী সহস্রদল পদ্মে এলে পর শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। ঠিক যেন সংসারের শত সহস্র বাধা অতিক্রম করে জটিলা-কুটিলার চোখে ধুলি দিয়ে যমুনার তীরে কদম্বের তলে রাধা এসে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। চিন্তা করে দেখলে সবই এক। ভেদ-বিভেদ নেই।

এর পরের স্তরে অর্থাৎ দিব্যাচার সাধনায় শাক্ত সাধকের দ্বৈতাদ্বৈত বোধ। দুই এক। শক্তি সেখানে শিবের সঙ্গে অভিন্ন। শক্তি শিব থেকে ভিন্ন হয়ে আবার মিশে গেলেন। শিব মহাশক্তিমান। শক্তি মহাশক্তিমানের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন, পরে আবার তাঁদের মিলন হোলো। এও ঠিক রাধা কৃষ্ণের মিলনের মত। রাধা কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি-হলাদিনী নাম যাঁহার॥
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হলাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হলাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শাক্ত সাধকগণের সাধনার উক্ত তিন পর্য্যায়ের শেষ স্তরে তাঁরা শক্তি ও শিবের মিলন দেখে চরিতার্থ হন। এই চরিতার্থতার মধ্যে তাঁদের পরম আনন্দ লাভ। এই আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। শাক্ত সাধকেরা এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। এই আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে রামপ্রসাদে। তাই রামপ্রসাদ তাঁর গানে এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ সামান্যমাত্র প্রকাশ করে বাঙালীর প্রাণে নূতন রসের সঞ্চার করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের একদিক আলোকিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় আনন্দ প্রকাশের অতীত, অনুভূতি গ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। রামপ্রসাদ যে পরিপূর্ণ অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করেছিলেন সাধনাবলে, তার এক সামান্য অংশমাত্র তাঁর গানে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর সুরের মোহিনী-শক্তি শাক্ত ভক্তকে এমন কি সাধারণ শ্রোতাকেও মুহূর্তের মধ্যে মাটির পৃথিবী থেকে উত্তরণ করে দেয় এক অসাধারণ লোকে—যেখানে নিরানন্দের ঠাঁই নেই, আছে পূর্ণানন্দ। আর এই পূর্ণানন্দই অতীন্দ্রিয়ানন্দ। এ আনন্দ লাভ হ'লে পর জীবের সব-পাওয়ার শেষ হয়ে যায়।

ইন্দ্রিয় জয় করে তবে অতীন্দ্রিয় লোকে প্রবেশ করতে হয়। সেখানেই গেলে শুধু ঐ অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়। অতীন্দ্রিয় আনন্দই প্রেম। প্রেম নিষ্কাম। প্রেম লাভ হলে পর ভক্তের হৃদয়ে জগৎ এসে ঠাঁই করে নেয়। সবই তার আপন হয়। এই আনন্দই অমৃত, যে অমৃতের কথা বলে গিয়েছেন প্রাচীন আর্যঋষিরা। এই প্রেম সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীত বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ৪র্থ পরিঃ)

এই ইন্দ্রিয়জয়ের কথাই আছে শাক্ত সাধকের বীরাচার সাধনার মধ্যে। এই সাধনার মাধ্যমে শাক্ত সাধক ভোগের দ্বারা পঞ্চ-ম-কারকে জয় করেন, পরন্তু এর মধ্যে বদ্ধ হন না; কারণ বদ্ধ হলেই আসক্তি আর তাতেই পতন। শাক্ত সাধক বীরাচার সাধনায় ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রদল পদ্মে উপস্থিত হন। এই সহস্রদল পদ্মের অন্য নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। এখান থেকে প্রতিনিয়ত অমৃত নিঃসরিত হয়। আর্যঋষিরা ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে এই অমৃত পান করে দীর্ঘজীবী হতেন, অসীম শক্তি লাভ করে অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতেন, তাঁদের বাণী শাশ্বত বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভীষ্ম এই শক্তিবলে ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হয়েছিলেন। আবার এই অমৃতের সদ্‌ব্যবহার করতে না পারলে, এই অমৃত পান করতে অক্ষম হ'লে—এ বেরিয়ে যাবে নবদ্বার পথে। এই নবদ্বার হোলো—দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ গহ্বর, গুহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বার। সাধারণ লোক এই অমৃত ধারণ করতে পারে না। আর পারে না বলেই দুর্বল, ক্ষীণজীবী ও অল্পায়ু। স্মৃতি, ধৃতি, মেধা তাদের অতীব ক্ষীণ।

এই অমৃতই মদ্য। আর এই অমৃত পান ঘটে মদ্য সাধনায়। ইন্দ্রিয় বিজিত হলে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়। আর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠে ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রদল পদ্মে উঠে শিবের সঙ্গে মিলিত হয়। সাধক যুগপৎ সেই মিলন দেখে অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব ও ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নিঃসরিত ঐ অমৃত পান করেন। গীতায় একেই বলা হ'য়েছে—অভ্যাসযোগ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮॥১২ অঃ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। ৯॥১২ অঃ॥

—আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই স্থিতি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৮॥

—হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর॥ ৯॥

মদ্য সাধনায় সাধকের ভাগ্যে যখন শক্তি ও শিবের মিলন দর্শন ঘটে, সেই মুহূর্তেই আরম্ভ হয় তাঁর দিব্যাচার সাধনা। এখন তিনি এক অলৌকিক জগতে উপস্থিত। সেখানে তাঁর শুধু অমৃত পান আর ঐ অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব। এই সময় তাঁর আর সব কিছুরই বিলোপ ঘটে। এ অবস্থা বর্ণানাতীত। এ শুধু উপলব্ধির বিষয়। এ সময় ঐ অতীন্দ্রিয় আনন্দে তিনি ডুবে থাকেন বলে কথা বলার উপায় থাকে না তাঁর। ইহাই তাঁর মাংস সাধনা। আর ঐ নির্বাক অবস্থার নাম মাংস ভক্ষণ। অতীন্দ্রিয় আনন্দের সাগরে ডুবে গেলে কথা বলা যায় না।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে রজঃ ও তমোরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রাণায়ামের বলে রোধ করাই মৎস্য সাধনা। এই মৎস্য সাধনাই মৎস্য ভক্ষণ। সহস্রদল পদ্মে বিরাজমান শিবকে জানাই মুদ্রাসাধনা। এই শিবই পরমাত্মা। এঁকে জানলে, এঁকে চিনলে জানার বা চেনার আর কিছু থাকে না।

সহস্রদল পদ্মে শিবের সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর মিলন দর্শনের নামই মৈথুন সাধনা। রাধাকৃষ্ণের মিলন দর্শন করে বৈষ্ণব ভক্ত যেমন ধন্য হন, শক্তি ও শিবের মিলন দর্শন করে শাক্ত সাধকও তেমনই ধন্য হন। বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে প্রভেদ নেই। হৃদিবৃন্দাবন হোলো ঐ সহস্রদল পদ্ম। বৈষ্ণব ভক্তের হৃদিবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধাকৃষ্ণের মিলন দর্শন করে বৈষ্ণব ভক্ত অতীন্দ্রিয় আনন্দসাগরে ডুবে যান। আর শক্তি ও শিবের মিলন দেখে অতীন্দ্রিয় আনন্দ উপভোগ করেন শাক্ত সাধক।

শক্তি সাধনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ। বাঙালী বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা তন্ত্রসাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন চর্যাপদাবলীর মধ্যে। এই পদগুলিও গীত হ'ত। এর প্রমাণ আছে ঐ পদগুলির প্রথমেই যে রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে তার মধ্যে। তন্ত্রসাধনার সমস্ত পদ্ধতির

উল্লেখ আছে ঐ পদগুলিতে হেঁয়ালির মাধ্যমে। অবশ্য সর্বত্রই পদ কর্তারা সদ্‌গুরুর উপদেশের উপর নির্ভর করতে বলেছেন। আর গুরু পথ না দেখালে যে শিক্ষাদীক্ষা, সাধনভজন কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না, এ সত্য তো আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। তাই জীবনের আরম্ভ থেকেই আমরা গুরুর চরণে শরণ নিয়ে থাকি।

চর্যাপদের পর বহুদিন আমাদিগকে অপেক্ষা করতে হয়েছে—শাক্ত পদাবলীর জন্য। এর মূলে আছে রাজনৈতিক বিপর্যয়। দিল্লীর সুলতানী ও বাদশাহী আমল বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতির পথে তেমন অনুকূল ছিল না। তুর্ক-আফগান বংশীয় আক্রমণে বাঙালী বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা বাঙলার সমতল ভূমি থেকে পালিয়ে জান-মান রক্ষার জন্য হিমালয়ের উপরিস্থ নেপাল, ভোটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হন। তাঁদের পুথিপত্র তাঁরা সঙ্গে করেই নিয়ে যান। এর ফলে বহু পুথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে সামান্য কিছু কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তা রক্ষিত ছিল নেপাল রাজলাইব্রেরীতে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেগুলি উদ্ধার করে চর্যাপদ নাম দিয়ে সাহিত্য পরিষদ্-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে বাঙালীর ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। এই সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই একটা পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

রামপ্রসাদের সাধনপ্রণালী তান্ত্রিক সাধকদের পন্থা থেকে পৃথক। আর বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় যে তন্ত্রসাধনার কথা আছে, ঐ সাধনা তন্ত্রসাধনার নামে ব্যভিচার মাত্র। তন্ত্রসাধনার পতন সময়ে তান্ত্রিক সাধু নামে খ্যাত কাপালিক সাধকগণ যে বীভৎস ব্যভিচার সাধনক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তা' ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে—ধর্ম, সংস্কৃতির চলার স্রোতের পথে ময়লা জমে যায়। সেই ময়লা পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হয়। তাই যুগে যুগে সাধুমহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। আবার ভগবানও ধরাতলে অবতীর্ণ হন। গীতায় তাই ভগবান বলেছেন,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥৪ অঃ

—হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই ॥৭॥৪ অঃ ॥

রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটেছিল শক্তি সাধনার গতিকে নতুন পথে মোড় ফিরিয়ে আনতে। তিনিও উদাত্ত কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র প্রচার করে গানে গানে

মানবমনে ভক্তির ধারা বহায়ে দিয়ে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছিলেন। বৈষ্ণব সাধক ভক্তগণ তাঁর অবচেতন মনে দিয়েছিলেন প্রেরণা। সেই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রামপ্রসাদ করলেন তাঁর অভীষ্ট দেবতাকে মাতৃভাবে গ্রহণ।

রামপ্রসাদ ছিলেন সমন্বয় বাদী কবি। শ্যাম ও শ্যামাকে তিনি অভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এর মূলে ছিল বৈষ্ণব সাধক কবিদের প্রভাব। তবে তাঁদের প্রভাবে শুধু রামপ্রসাদ কেন—কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র, সাধক কবি কমলাকান্ত প্রভৃতিও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামপ্রসাদের চোখে শ্যামা শ্যাম হয়ে গিয়েছেন। ভক্ত সাধক মানসনয়নে প্রাণ ভরে মায়ের মূর্তি দেখেছেন। দেখতে দেখতে তিনি বিভোর হয়ে পড়েছেন। বাস্তব জগতের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় লোকে চলে গিয়েছেন তিনি। সে লোকে সব এক। সেখানে ভেদ নেই, বিভেদ নেই, দ্বন্দ্ব নেই—আছে শুধু এক। তাই মাকে সম্বোধন করে কবি গেয়ে উঠলেন,—

কালী, হলি মা রাসবিহারী—
নটবরবেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু-হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল, বুঝিতে নারি।

অতীন্দ্রিয় আনন্দের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এখানে তন্ত্র নেই, মন্ত্র নেই, পঞ্চ-ম-কার সাধনাও নেই। এখানে আছে পূর্ণানন্দ। যদি একে কোন সাধনার পর্যায়ে ফেল্‌তেই হয়, তবে বল্‌তে হ'বে অতীন্দ্রিয় সাধনা। এ সাধনায় কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। বহু জন্মের সাধনার পরে যখন সব সাধনার সমাপ্তি ঘটে, যখন কর্ম-জ্ঞানের অহঙ্কার লোপ পায়, যখন শুদ্ধা ভক্তি চিত্তকে পূর্ণ করে দেয়—তখনই, শুধু তখনই এ ভাব আসে চিত্তশতদলে।

আর ভক্ত সাধক আনন্দের সাগরে ডুবে যায়। রবীন্দ্র নাথের ভাষায় আবার বলি—

বচন মনের অতীতে,
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতি—
বল দাও, মোরে বল দাও
প্রাণে দাও মোর শকতি।

এই একই ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে সাধক কবি কমলাকান্তও উদাত্ত কণ্ঠে মাকে সম্বোধন করে গেয়ে উঠেছিলেন,—

জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন-পালন-লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয়।
যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদিসরোবরে, কমল-মাঝারে করে উদয়॥

এই একই ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন রামলাল দাস দত্ত। তিনিও সাধক-কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মত অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। তিনিও সমন্বয়পন্থী সাধক। শ্যাম ও শ্যামার অভেদ কল্পনা তিনিও করেছেন। তাই তিনি গেয়েছেন,—

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজ মুণ্ডমালী॥
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী॥
কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্তি, কভু কাল, কভু যে কালী,
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
হলে উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি॥

শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥

মহাকালীর মধ্যে, মহাশক্তির মধ্যে, শ্যামা-মায়ের মধ্যে এই যে একম্ অদ্বিতীয়ম্-ভাব দর্শন—ইহাই অতীন্দ্রিয়বাদের চরম ভাব। এই ভাবের মধ্যে চিত্তে আসে পরম আনন্দ। সেই আনন্দই আনন্দময় পরম ব্রহ্মের বা আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীরই অভিব্যক্তি। সাধক ভক্তের চিত্তে এ ভাবের আবির্ভাব ঘটলে, তার হৃদয় থেকে জাগতিক ভাব দূরে যায়। আর তার স্থানে আসে এক অলৌকিক ভাব। এ অবস্থায় সাধক দেখেন ব্রহ্ম জগৎময়, স্তম্ব থেকে ব্রহ্ম অবধি সবই এক। ইহাই অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

এ অবস্থায় আসে আত্মসমর্পণ। সাধনমার্গের উচ্চতম শিখরে উঠ্‌লেই এ ভাব আসবেই সাধকের অন্তরে। সব ধর্মের, সব মতের, সব পথের শেষে যেতে পারলে—সেখানে সব এক। তখন আর স্বদেশ-বিদেশের জ্ঞান থাকে না, মত ও পথের ভেদ থাকে না। তখন একাকার। বিশ্বের সকলের মধ্যে তখন প্রাণের ঠাকুরের দর্শন মেলে। গীতায় ভগবান তাই বলেছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥ ৪র্থ অঃ ॥
(ব্যাখ্যা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

ভগবান ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। ভক্তকে তুষ্ট করে তিনি নিজেও তুষ্ট হন। শুধু ডাকবার অপেক্ষায় তিনি থাকেন। যে নামেই হোক—কৃষ্ণ, কালী, খৃষ্ট, বুদ্ধ, আল্লা, খোদা—এক নাম হ'লেই হোলো। তাঁর কাছে তো ভেদ নেই। তিনি যে পরম পিতা, পরম মাতা। শুধু সব ভুলে প্রাণ ভরে তাঁকে ডাকা চাই।

ভগবান রামকৃষ্ণ তাই আমাদিগকে বলেছিলেন—যত মত তত পথ। আর তাঁর জীবনে তিনি তা' প্রমাণও করেছিলেন।

পরম ভাবের উদয় হ'লে চিত্তে আসে সর্ব ধর্ম ত্যাগ। তখন কর্ম ও জ্ঞানের লোপ পায়। ভগবানের কৃপা না হ'লে সর্ব ধর্ম তাগ করতে পারা যায় না। গীতায় ভগবান তাই বলেছেন,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥ ১৮ অঃ ॥

—সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥ ১৮ ॥

এখানে ধর্ম অর্থে গার্হস্থ্য ধর্ম, দান ধর্ম, অহিংসা ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম প্রভৃতি বুঝায়। স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের জন্য যে সব কর্মানুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে আছে—উহাই ধর্ম। এই ধর্ম পালনে তাঁকে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইচ্ছা করলেই এই সব ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিও পাওয়া যায় না। কর্মের দ্বারা কর্ম বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। ঠিক যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। এই ধর্ম পালনের পর যদি কর্ম ক্ষয় হয়, কর্ম ও জ্ঞানের অহংকার লোপ পায়, যদি শুদ্ধা ভক্তি আসে চিত্তে—তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

শুদ্ধা ভক্তি এলে চিত্তে সাধকভক্ত তাঁর জন্য কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন অভিমান করে, কখন গালি দেয়। কখন আসে মিলন, আবার কখন বিরহ। মিলন-বিরহের দোলদোলনায় ভক্ত হৃদয় আন্দোলিত হয়। এ ঠিক—বৈষ্ণব-সাধক-ভক্তের রাগানুগা ভক্তির মত। রামপ্রসাদ ও তাঁর সমসাময়িক শাক্ত সাধক কবিরা ঠিক এই ভাবেই ভাবিত হয়েছিলেন। তাই বৈষ্ণব কবিদের মত শাক্ত কবিরাও অতীন্দ্রিয় আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

অতীন্দ্রিয়বাদী শক্তি সাধক কবি মায়ের মূর্তি গঠন করে পূজা করতে চান না। কারণ অসীমকে সসীমে আনলে, অনন্তকে সান্তের মধ্যে দেখতে চাইলে, অরূপকে রূপের মধ্যে উপলব্ধি করলে তাঁর অনন্তত্বের বিলুপ্তি ঘটে। অনন্তের অনন্তত্বের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ভক্ত-সাধক পূর্ণানন্দ পেতে পারেন না। তাঁরা তাই মায়ের মূর্তি গড়িয়ে প্রকৃত রূপের হানি ঘটাতে চান না। তা ছাড়া পূর্ণানন্দ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপলব্ধি হয় অনন্তের মধ্যে। অনন্তের মধ্যে ডুবে অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়। মায়ের যে কালোবরণ ভুবন আলো করে, চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি যে ত্রিনয়নী মায়ের ত্রিনয়ন, তাঁর সন্ধান কি মাটির মূর্তির মধ্যে মেলে? অনন্তের রূপের সাগরে ডুবে যিনি অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভে উৎসুক, তিনি মূর্তি পূজার মধ্যে আনন্দ পান না। তাই উদাত্ত কণ্ঠে রামপ্রসাদ গেয়েছেন,—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারি নিবাইয়ে?

শুনেছি মা'র বরণ কালো সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি ?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥

মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মায়ের এই রূপেরই সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনিও সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে অনন্তরূপিণী মায়ের রাঙা চরণ দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তি লাভের আর অন্য পথ নেই। সংসার দাবে দগ্ধ জীব যদি শান্তিলাভ করতে চায়, তবে তাকে আসতে হ'বে অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত সাধকের এই পথে। যতীন্দ্র মোহন গাইলেন,—

তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা-জননী ॥
রূপে সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি'
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥
সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসার পাশ,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু'খানি ॥

রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তভৈরব নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও মায়ের এই ভুবন-আলোকরা-রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনিও অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক-কবি। মায়ের ভুবন-আলোকরা-রূপ দেখে তিনি গেয়ে উঠ্লেন,—

হের, হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে !
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে ॥
বিমল হাসি ঘরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;
ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

রবীন্দ্র নাথ মায়ের রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখেছিলেন। যে রুদ্রাণী মূর্তিতে তিনি জগতের অশিব ধ্বংস করেন, পৃথিবীর পাপ হরণ করেন, দুষ্টের দমন

করেন, শিষ্টের পালন করেন, অমঙ্গল বিনাশ করে সন্তানের মঙ্গল সাধন করতে তিনি যে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই মূর্তিই চিত্রিত করেছেন।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক আঁধার করে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু-ভঙ্গে।

বহু অতীন্দ্রিয়বাদী শাক্ত কবি জগজ্জননীর এই অনন্তরূপ দর্শন করে ধন্য হয়েছেন, আর আনন্দরস পান করেছেন প্রাণভরে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য—বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ রায়, মহারাজ নন্দ কুমার রায়, আন্দুলের (হাওড়া) প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল ফিকির চাঁদ), ঈশ্বর গুপ্ত।

শাক্ত কবিদের প্রার্থনার পদগুলিও বড় সুন্দর। সংসার দাবদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি লাভের আশায় মানব সর্বশেষে মায়ের শরণাপন্ন হয়। অশান্ত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে পৃথিবীতে মায়ের মত আর কেউ নেই। সকলে যখন ত্যাগ করে, জননী তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর অভয় হস্তের পরশে সন্তানের দুঃখ-তাপ দূর করেন। মায়ের অভয় হস্তের পরশে সন্তানের হৃদয়-ক্ষতে-পড়ে প্রলেপ, চিত্তে আসে শান্তি, লাভ করে নব প্রেরণা।

তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গের সুষমা। পৃথিবী তখনই স্বর্গে পরিণত হয়। এই ভাবেই এসেছে স্বর্গের পরিকল্পনা। এই মাটির পৃথিবীই তো স্বর্গ। মাটির মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয় আর তার পৃথিবীকে তৈরী করে স্বর্গ।

ভক্তের আকুতি শীর্ষক পদগুলিতে জগজ্জনীর প্রতি ভক্ত-হৃদয়ের মান-অভিমানের সাথে এই জ্বালাময় পৃথিবীর দুঃখ-তাপ নিরসনের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। মা একাধারে 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'। সন্তান

বিপথগামী হ'লে শ্যামা-মা বজ্রের মত কঠোর হস্তে তাকে শাসন করেন, আবার দুঃখের অভিঘাতে জর্জ্জরিত সন্তানকে তাঁর কুসুম-কোমল ক্রোড়ে গ্রহণ করে তাকে শান্তি দেন। শাক্ত-সাধকেরা এই জন্যই মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সংসার তাপে জর্জ্জরিত রামপ্রসাদ তাই মায়ের অভয়-পদাশ্রয় চেয়েছেন।

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,—
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

মহাশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীব এই জগতে আসে। জীব মহাশক্তিরই একটি খণ্ডাংশ মাত্র। জগতে আসে কর্ম করতে, কিন্তু কর্মের বন্ধনে কখনই সে আবদ্ধ হ'বে না। কারণ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেই তার পতন। সুতরাং জীব প্রতিনিয়ত কর্মের দ্বারা কর্মবন্ধন ছিন্ন করে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে মহাশক্তিতে সে হ'বে বিলীন। কিন্তু সংসারে এসে জীব হয় পথভ্রষ্ট। সে হয় রিপু ও ইন্দ্রিয়ের অধীন। সে শুধু ভূতের বেগার খাটে। তার দিনগুলি ঘেঁটে যায়। রামপ্রসাদ এই সব দেখে ব্রহ্মময়ীর শরণ নিয়েছেন। গাইলেন,—

মলেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেঁটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা-দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্‌নি মত ধরতে চাই মা, কর্মদোষে যায় গো ছুটে॥

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কর্ম ডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ। দেহধারী মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টা রিপু ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—এই পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ে। ভগবানে আত্মসমর্পিত ভক্ত ছাড়া রিপু ও ইন্দ্রিয়কে জয় করতে কেহ পারে না। রিপু ও ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়লে ভগবানের কাছ থেকে জীবকে বহু দূরে ছিটকে পড়তে হয়। হয়তো বা জীব তাতে আপাতসুখের অধিকারী হয়। কিন্তু তার পরিণাম বড় ভয়াবহ। রামপ্রসাদ এ তত্ত্ব জানতেন। তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, যেন তিনি রিপু ও ইন্দ্রিয়ের অধীন না হন। তাঁর কর্মবন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায়। আর মায়ের ধ্যানে যখন তিনি তন্ময় থাকবেন, ঠিক সেই সময় যেন তাঁর দেহান্তর ঘটে।

শাক্ত কবি তাঁর ভক্তহৃদয়ের আকূতির মধ্যে আবার অভিমানও করেছেন। মা মা বলে ডাকছেন। শ্মশানে-মশানে পীঠস্থানে সর্বত্র তাঁকে খুঁজছেন। খুঁজে খুঁজে তিনি হয়রাণ। মায়ের দেখা পাচ্ছেন না তবু। তাই মায়ের উপর তাঁর অভিমান। মাকে খুঁজে না পেলে সন্তানের যে অভিমান, এ ঠিক সেই রকম। অভিমানভরে মাকে তিনি গালি দিচ্ছেন 'সর্বনাশী' বলে। আবার তিনি বলছেন—'সর্বনাশী বোধ হয় বেঁচে নেই'। অতঃপর তিনি ঐ সর্বনাশী মৃত মায়ের শেষকৃত্য করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। তাঁর কুশপুত্তল দাহন করে গঙ্গার তীরে পিণ্ড দিতে চেয়েছেন। আর সর্বশেষে কালাশৌচ পালন করবার জন্য কাশী যেতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবার জন্য ভয় নেই। কারণ তাঁর মা মরলেও মায়ের নাম তাঁর পারের পাথেয় আছে। অতীন্দ্রিয় আনন্দের এর চেয়ে বড় উদাহরণ বিরল। শাক্ত কবি তাই নির্ভয়ে গেয়েছেন,—

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই!
গিয়া বিমাতার তীরে, কুশ-পুত্তল দাহন ক'রে,
অশৌচান্তে পিণ্ডি দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।

দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, মন, মায়ের জন্য ভাব কেন ?
মা গেছে, নাম-ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই ॥

অতীন্দ্রিয়বাদী শাক্ত কবিদের আর একটি বিশেষ ভাবের পরিচয় মেলে তাঁদের 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পদগুলির মধ্যে। উপাস্যা দেবীকে কন্যা সাজিয়ে তাঁরা যে আর্তি প্রকাশ করেছেন এই পদগুলিতে, বিশ্বসাহিত্যে তা' অতুলনীয়। অপর পক্ষে গ্রাম-বাংলার এক মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই পদগুলির মাধ্যমে। বৈষ্ণব কবিরাও উপাস্য দেবকে প্রভু, সখা, পুত্র, স্বামীভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানকে নিয়ে বৈষ্ণব ভক্তেরাও নানাভাবে আরাধনা করে ভগবানকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের সেই আরাধনার মধ্যে নানাভাবে বৈচিত্র্য এনে অতীন্দ্রিয়তার সার্থকতা দেখিয়েছেন। সেই পন্থা অনুসরণ করে শাক্ত কবিরাও বৈচিত্র্য এনেছেন তাঁদের এই আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে। এই আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে উপাস্যা দেবী আর দেবী নন। তিনি হয়েছেন একেবারে বাঙালী ঘরের নবম বর্ষীয়া কন্যা। এই নবম বর্ষীয়া কন্যাকে ভক্ত শাক্ত কবিরা মা-সেজে তাঁকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়েছেন। কন্যার বিরহে কাতর হয়েছেন। কন্যার জন্য দুর্ভাবনায় পড়ে চোখে অন্ধকার দেখেছেন। কল্পনা-শ্রবণে কন্যার কান্না শুনেছেন। বৎসরান্তে স্বামিগৃহ থেকে কন্যাকে নিজ বাড়ীতে আনবার জন্য স্বামীকে কত আবেদন-নিবেদন জানিয়েছেন। বাঙালী মায়ের মন নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত শাক্ত কবি যে আর্তি প্রকাশ করেছেন আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে, তা' সত্যই অনবদ্য।

এই পদগুলিতে একদিকে যেমন গ্রাম-বাঙলার ধূলির গন্ধ পাওয়া যায়, অন্য দিকে ঠিক তেমনই বাঙালীর জীবন-ভাষ্য লক্ষ্য করা যায়। কুলীনের ঘরে কন্যাদানের আকুলতা, দরিদ্র বৃদ্ধ পাত্রেও কন্যা দিতে আগ্রহ শুধু কুলীন বলে, এইভাবে কন্যা-সম্প্রদানের জন্য মায়ের অনির্বাণ মর্মবহ্নির জ্বালা অনুভূতিই এই পদগুলির বৈশিষ্ট্য। এক কথায় এই পদগুলি বাঙালীর পুঞ্জীভূত অনন্ত বেদনার বহিঃপ্রকাশ।

কন্যার আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন মা-মেনকা। বৎসরান্তে এবার কন্যাকে বাড়ীতে এনে আর স্বামিগৃহে পাঠাবেন না। আরও ঝগড়া বাধাবেন জামাই-এর সঙ্গে। জামাই বলে বিন্দুমাত্র সমীহ করবেন না। না-পাঠানোর কারণ-স্বরূপ মা-মেনকা বলেছেন যে, শিব শুধু শ্মশানে-মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না। অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত কবি রামপ্রসাদ এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবো না।
বলে বোলবে লোকে মন্দ. কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয় —
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে-মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

কন্যার জন্য মায়ের যেরূপ বেদনা, বাপের বেদনা সেরূপ নয়। মা মনে করেন, তাঁর মেয়ের বাবা পাষাণ। তাই বৃদ্ধ দরিদ্র পাত্রের হাতে কন্যাকে দিয়ে তিনি নির্বিকার হয়ে থাকেন। অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক-কবি কমলাকান্ত এ ভাবটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

কবে যাবে বলো গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছো ঘরে :
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই সে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহে না করো মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখররাণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে ॥

মা-মেনকা তাঁর কন্যা উমার জন্য সতত চিন্তিত। বাঙালিনী মা যেমন স্বামিগৃহবাসিনী কন্যার জন্য চিন্তা করেন, মা-মেনকার চিন্তা ঠিক তেমনই। বাঙালী বাবা কিন্তু অত চিন্তিত নন। তিনি তাঁর মেয়ে-জামাই-এর অনেক খবর রাখেন না। তিনি জানেন—তাঁর কন্যা স্বামী-সোহাগিনী হয়ে দিব্য সুখে আছে। তাই কন্যার জন্য পিতার অতশত চিন্তা থাকে না। মেয়ের মায়ের অভিযোগের উত্তর যেমনভাবে তিনি দিয়ে থাকেন, ঠিক সেই ভাবের উত্তর মিলবে অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত শাক্ত সাধক কমলাকান্তের নিম্নলিখিত পদে।

বারে বারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে।
জানো তো জামাতার রীতি অশেষ প্রকারে ॥

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-পরে।
সে কেনো পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর কায়া,
সে অবধি শিব জায়া বিচ্ছেদ না করে।
অবলা অল্পমতি, না জানো কার্যের গতি,
যাবো, কিছু না কহিবো দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তা'রে মোর সঙ্গে দেহ,
তা'র মা বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে॥

মন অতীন্দ্রিয়ভাবে পূর্ণ না হ'লে কখন এমন চিত্র অঙ্কন করা যায় না। উপাস্যা দেবীকে কন্যা সাজিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদী কবি সার্থক হয়েছেন।

মেয়ে বাপের ঘরে এলে পর মেয়েকে কোলে পেয়ে মায়ের যে আনন্দ হয়, তার সীমা-পরিসীমা নেই। জননীহৃদয়ের এই আনন্দ কোন কবির লেখনীতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদী কবি কমলাকান্ত তবুও তার একটি বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়। উমা গিরিরাজগৃহে এসেছেন। কন্যাকে কোলে পেয়ে গিরিরাণী আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন। কন্যাকে কোলে নিয়ে সেই আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করছেন। এ আনন্দ প্রকাশের অতীত। ভক্ত-কবিই যেন ভগবানকে কোলে পেয়েছেন। পূর্ণ আনন্দ প্রকাশের অতীত বলে অতীন্দ্রিয়বাদী কবি তা' প্রকাশ করতে পারেন নি। শুধু ইঙ্গিতে তার আভাস দিয়েছেন।

জয় জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন;
আগো রাণী ঐ এলো গিরি, রাণি গো!
গৌরীরে ল'য়ে॥
'কি করো শিখর-রমণি! গৃহ অন্তরে, মা!
তনয়া ছাখোনা আসিয়ে'॥
শুনিয়া জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী,
পুলকে পূর্ণিত হইয়ে।

ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থগিত নয়না,
রাণী ক্ষণে ক্ষণে ডাকে 'উমা' বলিয়ে ॥
বাহির প্রাঙ্গণে আসি, দূরে গেলো দুঃখরাশি,
উমা-শশিমুখ হেরিয়ে।
ত্রিগুণ জননী, অনায়াসে গিরি গেহিণী
কোলে নিলো ধরিয়ে ॥

কিন্তু মেয়ে তো আবার স্বামীর ঘরে যাবে। বিদায় তো দিতেই হবে। তাই বিজয়ার পদগুলিতে একটা বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি দিন তিন রাত্রি বাপের বাড়ী থেকে উমা আবার স্বামীর ঘরে চলেছেন। মা মেনকা তাই কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর হয়ে পড়েছেন। এই বিচ্ছেদ-ব্যথা অতীন্দ্রিয়বাদী কবি রামপ্রসাদ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এ বিচ্ছেদ-ব্যথা ভগবানের জন্য ভক্তের। অতীন্দ্রিয়ভাবের সার্থক পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতোক্ষণ না হ'ল বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিম-গিরি রাজ-রাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত শাক্ত-কবি কমলাকান্ত, কাঙাল ফিকির চাঁদ (হরিনাথ মজুমদার), দাশরথি রায়, ভক্ত-ভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, নবীন চন্দ্র সেন প্রভৃতি কবির লেখনীতে এই বিচ্ছেদের সুর অতি করুণভাবে ধ্বনিত হয়েছে। এর পরও আশ্চর্য হ'তে হয় যখন দেখি বাঙলার বিদ্রোহী সন্তান খ্রীষ্টান কবি মধুসূদন এই ভাবে ভাবিত হ'য়ে লিখলেন,—

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে!

উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার হ'বে ঘর, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

শাক্ত পদাবলীর এই ভাবধারা কবিয়াল, পাঁচালিকার প্রভৃতি এবং মধুসূদন, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, গিরিশ চন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করে শেষ পর্য্যন্ত কাজি নজরুল ইসলামে এসে সমাপ্তি লাভ করেছে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শাক্ত পদাবলী'—(অমরেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত) থেকে উক্ত পদ গুলির পাঠ গৃহীত হয়েছে।]

॥ ৮ ॥

অতীন্দ্রিয়বাদের রূপান্তর—তৃতীয় পর্যায়।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—(জন্ম—২১, মে, ১৮৩৫ ; মৃত্যু-২৪, মে ১৮৯৪ খ্রীঃ)।

মধুসূদনের মহাকাব্য সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটলেও বাঙলার বিদগ্ধ সুধীসমাজ তাঁর কাব্যরসে মশগুল হয়ে আছে, আবার হেম-নবীনের বীণার ঝঙ্কার বাঙালী মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে—এমন সময়ে বিরলে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যিনি কাব্যবীণায় নতুন সুর তুলেছিলেন, তিনিই বিহারী লাল। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে বিহারী লালের কবিপ্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি লাভ ঘটেছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে ছিলেন গীতিকবি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বিহারীলালের গীতিকবিতার শিল্পরীতি সম্পূর্ণ পৃথক। বিহারী লালের কবিপ্রতিভা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"যে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীতি কূজিত হইয়া উঠে নাই, সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।" সমকালীন কবিদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—"বিহারী লাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় নব্য শিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।

তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" [আধুনিক সাহিত্য।] রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় বিহারী লালের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। বিহারী লালের অন্তরে এক অকারণ বেদনা-বোধের সঙ্গে অনির্বচনীয় অনুভূতি মিশে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। এই ভাবটিতেই বিহারী লালের স্বকীয়তার নিদর্শন রয়েছে এবং ইহাই কবির অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা মিষ্টিক অনুভূতি। তাঁর এই অনুভূতির কাব্যরূপ বাঙলায় কাব্যসাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে এবং এই পথে

পদক্ষেপ করেছেন বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ। কবির এই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মূলে আছে—সৌন্দর্যদর্শন। বিশ্বসৌন্দর্যকে মনের গহনে টেনে এনে রূপে রসে একে সঞ্জীবিত করে ইচ্ছামতভাবে উপভোগ করাই ঐ সৌন্দর্যদর্শনের সার্থকতা। এরূপ দর্শনে আত্মসচেতনতার বিলুপ্তি ঘটে। তাই ঐ ধরণের মিষ্টিক কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে যেন খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বিহারী লালের কবিকর্মের মধ্যে 'মিষ্টিক' কবিতার এই ভাবটি পরিপূর্ণরূপে দেখা যায়, তাই পরবর্ত্তী কালে সুধীসমাজে তাঁর কবিকৃতির স্বীকৃতি মিলেছে।

সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী, নিসর্গসন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), ও সাধের আসন (১৮৮৯) বিহারী লালের কবিপ্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন। 'সঙ্গীত শতক' তাঁর কতকগুলি গান ও কবিতার সঙ্কলন। আপন জীবনের সব কথা এবং বন্ধু বান্ধবের জীবনের যে সব বিচিত্র ঘটনা তিনি জানতে পেরেছেন, তারই সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে 'বন্ধু-বিয়োগ' ও 'প্রেম-প্রবাহিনী'-তে। বস্তুতঃ কাব্যে এই আত্মভাবের প্রাধান্যই (subjectivity) তাঁর স্বকীয়তা। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে এই ভাবটিই প্রাধান্য লাভ, করেছিল। শ্রীমধুসূদন এবং তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে এভাব অনুপস্থিত ছিল। বিহারী লাল এ ভাবটির নবরূপ দিয়ে পরবর্ত্তীকালের গীতিসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তাই বিহারী লাল স্রষ্টা। কোনরূপ পালিশ না লাগিয়ে আত্মভাবের নগ্নরূপ প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল বিহারী লালে। তাই তিনি আধুনিক যুগের কবিগুরু। সমালোচকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'বন্ধু বিয়োগ', 'প্রেম-প্রবাহিনী' ও 'নিসর্গসন্দর্শন'-এর মধ্যে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রভাব দেখেছেন। অপর এক সম্প্রদায় তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, কীটস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের সৌন্দর্যদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এ দেশে গুপ্তকবির এবং পাশ্চাত্ত্য কবিদের ভক্তের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা বিহারী লালের কবিতার মাধুর্যে আকৃষ্ট হন নি। এর কারণ কি? আবার কবির জীবিতকালে তাঁর কাব্যগুলিও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি কেন? নিশ্চয়ই বিহারী লালের নূতন পথে ভ্রমণ করবার শক্তি সেকালে অনেকের ছিল না। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বিহারী লালের অলোকসামান্য প্রতিভার বিশ্লেষণ না করলে

কবিকে আরও কিছু দিন আলোচনার বাইরে থাকতে হ'ত। বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী ও নিসর্গসন্দর্শন-এর কতকগুলি কবিতাতে বস্তুপ্রাধান্য (objectivity) লক্ষিত হ'লেও নিসর্গসন্দর্শন-এর বহু কবিতায় এবং বঙ্গসুন্দরী কাব্যে আত্মভাবপ্রাধান্যই (subjectivity) মুখ্য স্থান লাভ করেছে। প্রকৃতি ও নারীকে তিনি নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। অতীন্দ্রিয়-ভাবাবেশে আবিষ্ট হ'য়ে প্রকৃতি ও নারীকে নিজসত্তার সঙ্গে এক ক'রে নিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের যে অচ্ছেদ্যবন্ধন আছে, প্রতিদিনের যে সম্পর্ক আছে, সেই বন্ধন ও সেই সম্পর্কের কথা সহজভাবে সহজ কথায় তিনি বলেছেন তাঁর কবিতায় ও কাব্যে।

'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কবি বিহারী লালের নূতন সৃষ্টি। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যেও এর ভাব অভিনব। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী থেকে কবির সারদা পৃথক। বিশ্বসৌন্দর্যকে মনের মধ্যে এনে তার সঙ্গে লীলা খেলা করবার জন্য তিনি সারদা দেবীর মানবীমূর্ত্তি এঁকেছেন। এই লীলা কবির মানস-লীলা এবং ইহাই বিহারী লালের অভিনব সৃষ্টি। এই দেবীর সঙ্গে বিভিন্নভাবে কবির লীলা চলেছে। সারদা দেবী কখন কবির কবিপ্রতিভার প্রেরণাদাত্রী ললাটিকা মেয়ে, কখন মহাশক্তি, আবার কখন প্রিয়তমা ভার্যা। কবির অভিনব অনুভূতির প্রকাশই বাঙলা সাহিত্যে এনেছে অতীন্দ্রিয়বাদের নব রূপায়ণ। আর সারদামঙ্গলের নানাস্থানে ঘটেছে তার অভিব্যক্তি। পরবর্তীকালে কবির এই ভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে।

ঈশ্বরকে জানবার বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস আদিম কাল থেকে চলে আসছে মানবসমাজে। আর তার জন্য নানা মত নানা পথের সন্ধানও দিয়েছেন সাধকেরা যুগে যুগে। পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পৃথক পৃথক মত বা পথের সন্ধান বলেছেন বিশ্ববাসীকে। কিন্তু সুন্দরকে মনের মণিকোঠায় স্থাপন করে রূপে, রসে সিক্ত করে তাকে চিরসুন্দররূপে গ্রহণ করে কখন জায়ারূপে, কখন জননীরূপে, আবার পর মুহূর্তে কন্যারূপে কল্পনা করবার অভিনব পদ্ধতি প্রথম দেখা গেল বিহারী লালে। এই নূতন সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়-বাদের ভূমিকায় বিহারী লালের নবতম অবদান। বিহারী লালের সারদা তাঁর উপাস্যা দেবী, তাঁর কাব্যলক্ষ্মী ; আবার ইনিই বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে চিরসুন্দরের সৌন্দর্য বিশ্বব্যাপী, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সামান্য অণু-পরমাণুতে পর্যন্ত যাঁর সৌন্দর্য বিরাজিত—সেই চির-

সুন্দরই বিহারী লালের সারদা। আর এই উপলব্ধিই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সারকথা।

সৌন্দর্যের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী কবির চেতন, অবচেতন ও ভাবোন্মাদ অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন রূপে। কবি যখন যেমন উপলব্ধি করেছেন, তখনই ঠিক তেমন ভাবেই কোনরূপ পালিশ না লাগিয়ে বলে গিয়েছেন আপন মনে স্বগত উক্তির মত। তাই তাঁর উপাস্যা দেবীকে হিমাদ্রি-শিখর পরে মানসনেত্রে যেই দেখলেন, অমনিই আহ্বান জানালেন। সময়টিও বড় মনোরম। হিমাদ্রি-শিখর পরে উষার আবির্ভাব হয়েছে। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তামসী নিশার অন্ধকার পালিয়ে গিয়েছে। উষার আলোতে দিক-চক্রবাল আলোকিত হয়েছে। তুষারমণ্ডিত হিমালয়শিখরের শুভ্র সৌন্দর্যের মধ্যে উপাস্যা দেবী সারদাকে দেখে কবি আহ্বান জানালেন,—

১

এস মা উষার সনে—
বীণাপাণি চন্দ্রাননে
রাঙা চরণ দু-খানি রাখ হৃদয়-কমলে!

(সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বিহারী লালের কাব্য সংগ্রহ।)

কবির প্রার্থনায় দেবী বীণাপাণি তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কবিও উদাত্ত কণ্ঠে সে সংবাদ জানালেন। দেবীর বর্ণনায় বললেন,—

২

কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদি-কমলে!
নধর নগনা লতা মগনা কমলদলে।
মুখখানি ঢল ঢল,
আলুথালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে!

৩

কপোলে সুধাংশু-ভাস
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে!

মাথা থুয়ে পয়োধরে
কোলে বীণা খেলা করে—
স্বর্গীয় অমিয়স্বরে জানিনে কি কথা বলে !

৪

ভাব ভরে মাতোয়ারা,
যেন পাগলিনী পারা
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগ্ধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা,
চাঁদের সুধার ধারা
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী !
তুমি সাধনের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে ! (ঐ, ঐ, ঐ)।

'চেতন অবস্থায়' উপাস্যা দেবী সারদাকে এইভাবে গ্রহণ করলেও দেবীর ঐ আনন্দরূপিণী করুণার ভাবটি স্থায়ীভাব লাভ করেনি কবিমানসে। এর পর কবিমানসের 'অবচেতন অবস্থা' এসেছে। এই অবস্থায় কবি তাঁর উপাস্যা দেবীকে গ্রহণ করেছেন কন্যারূপে। বলেছেন তাঁকে "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে"। এই "ললাটিকা মেয়ের" আবির্ভাব ঘটিয়েছেন তিনি মহামুনি বাল্মীকির ললাটদেশে। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তমসার তীরে কুটিরে বাস করেন সিদ্ধঋষি বাল্মীকি। একদা প্রভাতে তমসার তীরে ভ্রমণরত ছিলেন তিনি। এমন সময় কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চদম্পতির মধ্য হ'তে শবর-শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ নিপতিত হ'ল মুনির সম্মুখে। প্রভাতের আনন্দ মুহূর্ত মধ্যে মুনির মন থেকে বিদূরিত হ'ল। দ্রব হ'ল করুণহৃদয় মুনিমন। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে মহামুনি বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। এই অবস্থার মধ্যে মহামুনির ললাটে কবি বিহারী লাল ঘটালেন তাঁর উপাস্যা দেবী সারদার আবির্ভাব। দেবী বীণাপাণি আবির্ভূত হ'লেন মহামুনি বাল্মীকির ললাটে, আর সেই মহা আবির্ভাব দেখলেন মানসনেত্রে আমাদের কবি বিহারী লাল। এ দেখা সাধারণ দেখা নয়। এ হোলো অসাধারণ দর্শন। আর এই অসাধারণ দর্শনের জন্যই আসে অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতি। বিহারী লালের এই অবস্থার নাম 'অবচেতন অবস্থা'। অবচেতন অবস্থায় সাধারণ চেতন অবস্থার প্রায় বিলোপ ঘটে। চিত্তের ঠিক

চেতন অবস্থা নেই আবার চেতন অবস্থার একেবারে বিলোপও ঘটেনি; এই অবস্থাই আমাদের মতে অবচেতন অবস্থা। এই অবস্থায় কবি তাঁর উপাস্যা দেবীকে দেখলেন আর তার বর্ণনায় বল্‌লেন,—

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে!

১১

কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়, সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!

১২

কিরণ মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী স্বরূপসী,
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে;
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির,
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে। (ঐ, ঐ, ঐ)।

বিহারী লালের এই উপাস্যা দেবী সারদা আনন্দরূপিণী মূর্তিমতী করুণা। তিনি কবির জীবনসর্বস্ব। তিনি তাঁর মনের তৃপ্তি, নয়নের দীপ্তি। কমলার ধন-মানে অভিলাষী না হ'য়ে কবি তাঁর এই উপাস্যা দেবীর ধ্যানে মজে থাকতে চান। তাই কবি বলেছেন,—

৩২

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,—
অভিনব শান্তি রসে মগ্ন হয়ে রই!

যে ক' দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যেজিব তনু ও রাঙা চরণ তলে !

৩৩

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে ! (ঐ, ঐ, ঐ)।

কিন্তু এর পরেও দেবী সারদা অন্তর্হিত হ'য়েছেন। এমনই হয়। ভক্তের পরিপূর্ণ আকুলতার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। সেই ভাবটি কখনও কোন ভক্তের মধ্যে স্থায়ী হয় না। তারও ছেদ ঘটে। তখনই ভক্তাধীন ভগবানেরও অন্তর্ধান ঘটে। এর পর আসে ভক্তের মনে বিরহ। বিরহের দাবদাহে দগ্ধীভূত হয় ভক্ত। তখন আবার উপযুক্ত সময়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে ভক্ত হৃদয়ে।

দেবী সারদাও এক সময় অন্তর্হিত হয়েছেন বিহারী লালের নয়ন সম্মুখ থেকে। কবির মনে এসেছে তখন বিরহ। কবি করলেন বিলাপ।

১৯

হা দেবী, কোথায় তুমি !
শূন্য গিরি-ফুল ভূমি !
কোথায়—কোথায়—হায়—সারদা—সারদা !—
আর কেন হাস্য-মুখে
হানো উগ্র বজ্র বুকে !—
কি ঘোর তামসী নিশি। * * *

(— ঐ, ৪র্থ সর্গ, ঐ)।

সেই বিলাপের মধ্যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে কবির নেত্রপথে। কিন্তু বহু দূরে দেখছেন যেন আলোর বিস্ফুরণ। কবি দেখলেন,—

কায়াহীন মহাছায়া
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রূপিণী,

অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল,
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী !
—(ঐ, ৫ম সর্গ, ঐ)।

বিরহের দশমীদশায় উপস্থিত হ'য়েছেন কবি। জীবন যায় যায়। কাতরস্বরে তাই কবি উপাস্যা দেবীর কাছে জানিয়েছেন আকুল প্রার্থনা। একেবারে আত্ম-সমর্পণ।

১৩

হে সারদে, দাও দেখা !
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে—
শুনো না, শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়।—(ঐ, ৫ম সর্গ, ঐ)।

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় দেবী সারদা আবার আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর সম্মুখে। কিন্তু কবির তখন ভাবোন্মাদ অবস্থা। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা ও পরমহংস দেবের ভাবসমাধির প্রায় কাছাকাছি কবি বিহারী লালের এই ভাবোন্মাদ অবস্থা। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু শ্রীভগবানের আনন্দময় বিরাট প্রকাশ দেখতে পেতেন। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। ভক্তেরা তাঁকে নাম কীর্ত্তন শুনাতেন। তার পর তাঁর চৈতন্য লাভ হোত। পরমহংস দেবও ভাবসমাধির মধ্যে মাকে দর্শন করতেন। বিহারী লালও ভাবোন্মাদ অবস্থায় দর্শন করলেন তাঁর উপাস্যা দেবীকে। কিন্তু উপাস্যা-দেবীকে দেখছেন মাতৃভাবে নয়, এমন কি কন্যাভাবেও নয়। দেখছেন—প্রেয়সীরূপে। বৈষ্ণবেরা ভগবানকে নিয়েছেন কখনও প্রভু, কখনও পুত্র, কখনও সখা, কখনও পতি এবং সর্বশেষে পরপতিরূপে। শাক্তেরা নিয়েছেন কখনও মাতৃভাবে, আবার কখনও কন্যারূপে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভক্ত কবি বিহারী লাল তাঁর উপাস্যা দেবীকে ভাবোন্মাদ অবস্থায় নিয়েছেন প্রেয়সীরূপে। এখানেই বিহারী লালের বিশিষ্টতা। অতীন্দ্রিয়বাদের নূতন পথের সন্ধান দিলেন তিনি। এই হিসাবে বিহারী লাল সাধন মার্গের নূতন পথের পথ প্রদর্শক।

ভাবোন্মাদ অবস্থায় দেবীকে দর্শন করে কবি বলে উঠলেন,—

১৯

আহা কি ফুটিল হাসি !
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসি মুখখানি প্রেয়সী তোমার।
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার।
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে ?
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।

* * *

২২

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার।
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার।
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ-সাগর-মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু' নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায় !—(ঐ, ৫ম সর্গ, ঐ)।

অতীন্দ্রিয়বাদের যে নব রূপায়ণ ঘটলো বিহারী লালের সাধনায়, তার বিকাশ লাভ হোলো রবীন্দ্রনাথের সাধনায়। আর তার ফলে বাঙলা কাব্য সাহিত্যে এসেছে নব ভাবের জোয়ার, বিশ্বসাহিত্য সভায় বাঙলা সাহিত্য পেয়েছে গৌরবের আসন।

॥ ৯ ॥

অতীন্দ্রিয়বাদের রূপান্তর—চতুর্থ পর্য্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(আবির্ভাব—৭ মে, ১৮৬১ খ্রীঃ—তিরোভাব—৭ আগষ্ট, ১৯৪১ খ্রীঃ)। যে বিরাট প্রতিভা একদিন বিশ্বের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তকে স্তম্ভিত করেছিল, সেই রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এখানে শুধু সাধারণভাবে তাঁর প্রতিভার একদিকের আলোচনার চেষ্টা হ'বে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমলের কথা। কবির প্রথম জীবনের এই কাব্যগুলি পরবর্তী কালের কাব্যগুলির সহিত আদৌ তুলনীয় হ'তে পারে না, কিন্তু পরিণত বয়সের ফল দেখে তার রস গ্রহণ করবার সময় পাঠককে উপ্ত বীজ, তার অঙ্কুরোদ্গম এবং চারা গাছটির বিষয়ও স্মরণে আনতে হ'বে। পত্রপুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহের মধ্যেও শুষ্ক পত্র ও ভগ্ন শাখাও থাকে, কিন্তু সব মিলে ঐ বিরাট বনস্পতি বনের সৌন্দর্য্যবর্ধন করে, মানবের চক্ষুর শান্তি বিধান করতে সমর্থ হয়। সুতরাং—

দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
—(বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।—কড়ি ও কোমল)।

এই প্রতিভা কেমন করে চলার পথে চলতে চলতে—

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার। — (শা—জাহান।—বলাকা)।

অথবা

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই—
পবিত্র সদাই।—(চঞ্চলা।—বলাকা)।

অথবা

মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি

শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগে। (বলাকা।—বলাকা)।

—এই রূপ লাভ করলো তা' জানা রবীন্দ্রকাব্যরসিকদের একান্ত প্রয়োজন। জীবন-প্রভাত থেকে জীবন-সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিক্ষণে কবি-মানসে যে ভাবান্তর এসেছে, নিত্য নব নব রূপে, গন্ধে, বর্ণে, পুলকময় স্পর্শে, অমৃতময় হর্ষে—বৈচিত্র্যপূর্ণ সেই ভাবান্তরের কণিকামাত্র উপলব্ধি করতে পারলে যে কেহ বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে থাকতে পারবে না।

কবির জীবনী আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে—"জল পড়ে, পাতা নড়ে" থেকেই কবির কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর পরিবেশ যে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষে সাহায্য করেছিল, এ কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। শৈশবের শিক্ষারম্ভে—"জল পড়ে, পাতা নড়ে" তাঁর মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই প্রসঙ্গে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন,—

"আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কার ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কালের সঙ্গে মনের খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭ (জীবনস্মৃতি)।

কবিতার মিলের ঐ ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথের শিশুমনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সাত-আট বৎসর বয়সেই শিশু রবীন্দ্রনাথ পদ্য লিখতে আরম্ভ করলেন। যে বয়সে বালকেরা নেচেগেয়ে বেড়ায়, পৃথিবীর হাসি-কান্না যাদের মনকে মুহূর্তের বেশী দোলা দিতে পারে না, সেই বয়সে সাতকড়ি দত্ত মহাশয়ের—

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই॥"

এই দুই পংক্তির সঙ্গে বালক-কবি লিখলেন,—

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে॥"

—রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ—২৬, ১০ম খণ্ড, (জীবনস্মৃতি)।

সেই অতি শৈশবে শিশু রবীন্দ্রনাথ কেমন সুন্দর বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করতে পারতেন, তারও পরিচয় মিলেছে জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত একটি কবিতার মধ্যে।

আমসত্ত দুধে ফেলি' তাহাতে কদলী দলি',
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। —ঐ ; ঐ।

উপরি-উক্ত পংক্তি চতুষ্টয়ে শিশুকবি এক ভোজনবিলাসীর রসসমৃদ্ধ অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা রূপ লাভ করেছে প্রকৃতপক্ষে মানসী থেকে। মানসীর পূর্বপর্যন্ত কবিতাগুলির মধ্যে সম্ভাবনাপূর্ণ অঙ্কুরটি লক্ষ্য করার বিষয়। এই সময়কার কবিতাগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের প্রথম—উন্মেষ, দ্বিতীয়—বনফুল, তৃতীয়—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চতুর্থ—কবি-কাহিনী, পঞ্চম—রুদ্রচণ্ড, ষষ্ঠ—ভগ্নতরী, সপ্তম—ভগ্নহৃদয়, অষ্টম—বাল্মীকিপ্রতিভা, নবম—কালমৃগয়া।

কবিপ্রতিভার প্রথম পর্বের উন্মেষভাগে আমরা কবির খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতামাত্র পাই। শিশুকবির কাঁচা হাতের এই কবিতাগুচ্ছও সুন্দর। যৌবনের তারুণ্য এবং বার্ধক্যের পুণ্যজ্যোতি যেমন মানবমনকে আকৃষ্ট করে, শিশুর পদক্ষেপ তাহা অপেক্ষা কম আকর্ষণ করে না, বরং সকলে অবাক-বিস্ময়ে শিশুর এই গমনভঙ্গিমা দর্শন করে।

রবীন্দ্রনাথের এগার বৎসর বয়সের লেখা "পৃথ্বীরাজ-পরাজয়" —নামক কাব্যখানির উল্লেখ আমরা জীবনস্মৃতির মধ্যে পাই। "শৈশব-সঙ্গীত" নামক গাথা-কবিতাগুলিও এখন আর পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমা মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুখ্যাত গ্রন্থ "রবীন্দ্র জীবনী"-তে "ফুলবাল নামক একটি গাথা কবিতার পরিচয়ও দিয়েছেন। "পৃথ্বীরাজ-পরাজ কাব্যের পর দুই তিন বৎসর শিশুকবি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কবিতা ছাড়া ইংরা ও সংস্কৃত গ্রন্থের কিছু কিছু অনুবাদও করেন। বিচ্ছিন্ন কবিতার মে একটি কবিতা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র—১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্য বেনামীতে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কা ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা।

"অভিলাষ"

(দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত)

জন-মনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ।
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়। ....ইত্যাদি।

স্বদেশী যুগের প্রথম সূত্রপাত হয় সম্ভবতঃ "হিন্দুমেলা"-তে। অবশ্য এখানে স্বদেশপ্রীতির একটি গোপন উষ্ণ অনুভূতি ছাড়া আর যে কিছু হয়েছিল তা' আমাদের মনে হয় না। ঠাকুরপরিবারই ছিল এই "হিন্দুমেলা"র প্রাণকেন্দ্র। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ "হিন্দুমেলার উপহার" নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাই রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

কবিতাটি ১২৮১ সালের ১৪, ফাল্গুন ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বাঙলা 'অমৃত বাজার পত্রিকাতে' প্রকাশিত হয়। (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৮—ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়)।

(১)

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বতশিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়

(২)

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক পাতা।...ইত্যাদি।

দেশীয় সামন্তরাজাদের দাস-মনোবৃত্তি বালক রবীন্দ্রনাথের মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। তাঁদের মনোভাবের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনে বালক-কবি এক কবিতা লিখে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমেলা-তে পাঠ করেছিলেন।

দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।

অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ রবে।
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?···ইত্যাদি।

রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৭৯

কবি-ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' ও "পুরুবিক্রম" (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামক দুটি নাটকে বালক-কবি দুটি গান লিখে দেন। সরোজিনী নাটকের রাজপুত ললনাদের জহর ব্রত অবলম্বন করে চিতায় প্রবেশের সময় তাঁদের গান—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রইলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হ'বে॥—

(জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৪৭)।

১২৮৬ সালে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম" নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত গানটি দেশপ্রেমিকদের কণ্ঠে প্রায় সর্বক্ষণ ধ্বনিত হোতো।

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নিভয়।
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তা হলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
প্রকাণ্ড সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

কবির বয়স যখন তের-চৌদ্দ বৎসর সেই সময় স্কুলের পড়াশুনায় আর তাঁর মন বসল না। এই শিশু বয়সেই তিনি এদেশের গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। আর তার ফলেই তিনি স্কুলের পড়াতে বোধ হয় মন বসাতে পারেন নি। শিশু বয়স থেকেই এদেশের শিক্ষার গতানুগতিকতা তাঁর মনকে পীড়া দিয়েছিল বলেই শিক্ষা সংস্কার করতে পরবর্তী কালে তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাসম্বন্ধীয় তাঁর কল্পনা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, 'শিক্ষার বিকিরণ' নামক পুস্তিকাতে সেটি পাওয়া যায়। তার মধ্যেও এদেশের শিক্ষার ত্রুটি এবং তার প্রতিকারের উপায় তিনি বলে দিয়েছেন।

যা' হোক স্কুলের শিক্ষার প্রতি অনাসক্তি দেখে শিশু রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে কালিদাসের "কুমারসম্ভব" এবং সেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়াতে আরম্ভ করলেন এবং কবিও এই শিশু-বয়সে ঐ দুই বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ করে সকলকে চমৎকৃত করলেন। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের অকালবসন্ত ও মদনভস্মের স্বল্পাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

সংস্কৃত শ্লোক :—

কুবের গুপ্তাং দিশমুষ্ণ রশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীক নিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ ॥
অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিত নূপুরেন ॥
সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপাত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূত বাণে।
নিবেশয়ামাস মধুদ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥

অনুবাদ

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিকবালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।

নূপুর শিঞ্জনসহ সুন্দরীকুলের
চারুপদ পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোক কাঁধ হৈতে সর্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।
কচি কচি নবীন পল্লব উদ্গমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত--বাণ
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি।
ভারতী, ১২৮৪, মাঘ, রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৮২।

উন্মেষ ভাগের পর 'বনফুল' নামক আখ্যায়িকা কাব্য। মানসী থেকে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার রূপ লাভ হ'ল, তখনই জানা গেল যে অতঃপর কবির কবিতার বিষয়বস্তু হ'বে প্রকৃতি ও মানব। কিন্তু এই বনফুলের মধ্যেও সেই প্রকৃতি ও মানুষ বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্য তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালক-কবি যে কি পরিমাণে আয়ত্বে এনেছিলেন তার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গেছে। কালিদাস, সেক্সপীয়র এবং মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে এই বালক-কবি যে কিরূপ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা এই বনফুল কাব্যখানি পড়লেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বালক-কবির রচনার দোষ ত্রুটি আলোচনার বহির্ভূত; শুধু তাঁর নিসর্গপ্রীতি এবং মানুষের সুখ-দুঃখের, প্রেম-প্রীতির যে সহজ সরল ও নির্ভীক অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তারপর শকুন্তলার হরিণশিশু থেকে আরম্ভ করে মিরান্দা এবং কপালকুণ্ডলাকে যেন এই বালক-কবি অতি আপনার করে নিয়েছিলেন, আর সেই জন্যই এরা তাঁর লেখনীতে নবরূপ লাভ করেছে। এর পর ভাষা ও ছন্দের মধ্যে আছে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সুস্পষ্ট প্রভাব। পরবর্তীকালে বিহারীলালের মিষ্টিকভাবটি রবীন্দ্রনাথের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। বিহারীলালের সারদামঙ্গল রবীন্দ্রনাথকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে চর্যাপদকর্তা থেকে আরম্ভ করে শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের মিষ্টিকভাবও রবীন্দ্রনাথের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রীতির পরিচয় বনফুলের মধ্যে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কমলার পিতার শেষবিদায়ের প্রার্থনাতে বালক-কবির নিসর্গপ্রীতি ও মর্ত্য-প্রীতির পূর্ণ পরিচয় মেলে।

দিনকর নিশাকর গ্রহ তারা চরাচর
সকলের কাছে আমি লইব বিদায়।
গিরিরাজ হিমালয় ধবল তুষারচয়,
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ আবরণ,
অয়ি নির্ঝরিণী মালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা,
অয়ি উপত্যকে, অয়ি হিমশৈল-বন,
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।

বনফুলের মধ্যে বহুস্থানে বালক-কবির নিসর্গপ্রীতির পরিচয় মেলে। প্রকৃতি যে এই বালক-কবির মনে কত দূর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা' ভাবলেও আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তা' ছাড়া, এই কিশোর বয়সে বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি যে কত পড়েছিলেন আর স্বকীয়ভাবে সেগুলিকে কেমন করে আত্মসাৎ করেছিলেন তাও বিস্ময়ের বিষয়। বঙ্কিমের "কপালকুণ্ডলার" প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমে এক একটি উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন-না-কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে ঐ উদ্ধৃতিগুলি আহৃত হয়েছে। "বনফুলের" প্রথম পৃষ্ঠায় "শকুন্তলার" "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ" এই পংক্তিটি কবি উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন। শকুন্তলার প্রভাব "বনফুলের" মধ্যে যেমন বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই সেক্সপীয়রের "টেম্পেষ্ট" ও বঙ্কিমের "কপালকুণ্ডলার" প্রভাবও বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। বনবাসিনী কমলাকে নিয়ে বিজয় যখন গৃহে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, তখন কমলার বিদায়দৃশ্য শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হরিণ সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায়?
আয় পাখী, আয় আয় কার তরে র'বি হায়,
উড়ে যা উড়ে যা পাখী, তরুর শাখায়!

প্রভাতে কাহারে পাখী জাগাবি রে ডাকি ডাকি
কমলা! কমলা! বলি মধুর ভাষায়?
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে,
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটিরের দ্বার।

কালিদাসের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর কমলার চরিত্রে "মিরান্দা" ও "কপালকুণ্ডলার" প্রভাবও বড় কম নহে। বনফুলের কমলা বিজন বনবাসিনী। শকুন্তলা আশ্রমদুহিতা, মিরান্দা নির্জন দ্বীপে পিতা কর্তৃক প্রতিপালিতা আর কপালকুণ্ডলা বিজন বনে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিতা। শকুন্তলা স্বামী দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েও পরে মরীচি ঋষির আশ্রমে গৃহীতা হন, মিরান্দারও ফার্দিনান্দের সহিত মিলন হয়। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ হ'লেও সে স্বামিগৃহে মন বসাতে পারেনি, সংসারে থেকেও সে যেন উদাসিনী বৈরাগিনী। বেঁচে থাকার প্রতিও তার লিপ্সা ছিল না, মৃত্যুকেও সে ভয় করেনি। আবার নবকুমারের প্রতি কোন প্রকার অবিচারও সে করেনি।

শকুন্তলা, মিরান্দা ও কপালকুণ্ডলার মত কমলাও স্বামিগৃহে গিয়েছে, কিন্তু তার পরে তাদের সঙ্গে কমলার চারিত্রিক সাদৃশ্য নেই। কমলার চরিত্র ভিন্ন পথে গিয়েছে। কমলার পিতার মৃত্যুর পরে যখন প্রথম বিজয়ের সঙ্গে তার দেখা হোলো সেই দৃশ্যটির সঙ্গে রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চরিত্রের আশ্চর্য মিল আছে। কমলা যেন রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির স্ত্রী-সংস্করণ। বিজয়কে দেখে অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে—

কোথা হতে তুমি আজ আইলে পৃথিবী মাঝ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন?
তুমি কি তাহাই হ'বে— পিতা যাহাদের সবে
মানুষ বলিয়া আহা করিত রোদন?
কিংবা জাগি প্রাতঃকালে যাদের দেবতা বলে
নমস্কার করিতেন জনক আমার?
বলিতেন যার দেশে মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথায় কি নিবাস তোমার?

এমন করে যে বিজয় অভীষ্ট দেবতার মত কমলার সম্মুখে উপস্থিত হোলো, আমরা আশা করতে পারি তার সঙ্গে কমলার বিচ্ছেদ কোন কালেই আসবে

না। কিন্তু বালক-কবির কাছে সে দিন কবি কালিদাসের মানস-কন্যা শকুন্তলার পাতিব্রত্য স্থান পায়নি বা প্রাচীন কবিদের সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও ভোগ-বিরতিরও ঠাঁই মেলেনি। অবশ্য কপালকুণ্ডলার মত বনের প্রতি আসক্তি কমলার লোকালয়ে এসেও ছিল এবং এ আসক্তি তার কোন দিনও যায় নি। বিজয়কে দেখে কমলা যদিও অভিভূত হয়ে পড়েছিল এবং তার সঙ্গে তার বাড়ী এসেছিল, তবুও তাকে ভালোবাসতে পারে নি। ভালবাসতে যে কমলা পারেনি তার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই, যখন সে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে দেখল। ঠিক নীরদকে দেখেই কমলা তাকে ভালোবাসল। এখানে বালক-কবি প্রভাবিত হয়েছেন মাইকেলীয় প্রভাবে। মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা কাব্যের" "সোমের প্রতি তারা" পত্রিকাতে তারা সোমদেবকে সম্বোধন করে লিখছে—

গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।

নীরদকে ভালোবেসে তার কাছে কমলা যখন আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছে, তখন নীরদ তার প্রস্তাবে সম্মত হয় নি ; বরং তাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী থাক্‌তে বলেছে। কমলা তার উপদেশে কর্ণপাত না করে তার কাছে আপন হৃদয়দ্বার খুলে দিয়ে বলেছে—

বিবাহ কাহারে বলে জানিনা তো আমি—
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী।
এইটুকু জানি, শুধু এইটুকু জানি—
দেখিবারে আঁখি মোর ভালোবাসে যারে,
শুনিতে বাসি গো ভালো যার সুধাবাণী,
শুনিব তাহার কথা, দেখিব তাহারে।

বন্ধুবৎসল নীরদের হৃদয় কিন্তু কমলার প্রেমনিবেদনে গলে যায়নি। কমলার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে নীরদ যখন চলে যাবার উপক্রম করল, তখন কমলা তার পায় পড়ে হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেমের কথা ব্যক্ত করল। বন্ধুর অনুরোধ-এ নীরদ যে সেই স্থান ত্যাগ করছে কমলা একথা তার কাছ থেকে জানতে পেরে বলছে,—

কমলা তোমারে আহা ভালোবাসে বলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!

প্রেমেরে ডুবাব আজি বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এমন?
নিষ্ঠুর আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর্ ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?

কমলার ব্যবহারে বিজয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছিল, তাই বিশ্বস্ত বন্ধু নীরদকে সে বুঝতে পারেনি এবং সেই জন্যেই সে নীরদকে হঠাৎ হত্যা করে বসল। এর ফলে কমলা বিজয়কে আরও ঘৃণা করল এবং লোকালয় ছেড়ে আবার বনে চলে গেল। ছুরিকাহত মুমূর্ষু নীরদের হৃদয়ে বন্ধু বিজয়ের বিশ্বাসঘাতকতা বড় বেশী বেজেছিল। এখানে নীরদের ব্যথা আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয় আনাতোল ফ্রাঁসের "লাভ্ ইন্ এ ডেজার্ট" গল্পের সিপাহীর ছুরিকাহত বাঘের কথা। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতাকে নীরদ ক্ষমা করেছিল, কিন্তু কমলা পারেনি। কারণ বনের শান্ত প্রকৃতিতে সে প্রভাবিত হয়নি। অবশ্য এটা বালক-কবির বাস্তব মনোভাবের পরিচয়। কমলা বিজয়কে অভিশাপ দিয়েছে।

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক বিজয়ের মন!
বিস্মৃতি! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে!
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে!
বিষাদ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সম্মুখে তার নরকের বিষ!

এর পর বালক-কবি শ্মশানের ভয়ঙ্করত্বের বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নীরদের মৃত্যুর পর কমলার চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করেছেন, সেটি হয়েছে অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত। নীরদের চিতাবহ্নি নির্বাপিত হবার সাথে সাথে কমলা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আবার ঠিক সেই সময়ে তামসী নিশার ভীষণতা দূর করে দিয়ে পূর্ব দিকচক্রবালে কুমারী ঊষা রক্তিম অধরে মৃদু হাসি নিয়ে দেখা দিল। এখানকার বর্ণনাটিও বালক-কবির অপূর্ব কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।

ওই যে কুমারী ঊষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্বাশার স্বর্ণ তোরণে,

রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া !

উষার মৃদুপরশে কমলার চৈতন্য ফিরে এল। কিন্তু মন তার এখন ভিন্ন পথে চলেছে। বিজয়-সন্দর্শন তার প্রাণে এনেছিল প্রথম প্রেম, আর সেই প্রেমের পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল নীরদের প্রতি ভালোবাসায়। আর তার বিচ্ছেদ ঘটল নীরদের মৃত্যুতে। ভাঙা মনটিকে জোড়া দিবার আশায় কমলা তার পূর্ব আশ্রয়স্থল পিতার পরিত্যক্ত কুটিরে ফিরে এল। দেখল সেখানকার প্রকৃতি ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তাকে আর পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে দিল না। মনে তার শান্তি ফিরে এল না। সংসার তার শান্তিকে কেড়ে নিয়ে তার হৃদয়টিকে শূন্য করে দিয়েছে। সুতরাং কমলা যেন মহা-প্রস্থানের পথে চল্‌তে থাকল। ঠিক যেন বৈরাগী যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান। কিন্তু এই মহাপ্রস্থানের মধ্যেও কবি স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। এর পরের বর্ণনার মধ্যে কবি এক গভীর প্রশান্তি এনেছেন। কমলা হিমালয়শিখরে মৃত্যুতে অনন্ত সৌন্দর্যরূপিণী প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গেল।

অনন্ত প্রকাশ-মাঝে একেলা কমলা !
অনন্ত তুষার মাঝে একেলা কমলা !
আকাশে শিখর উঠে,
চরণে পৃথিবী লুটে,
একেলা শিখর-'পরে বালিকা কমলা !

আখ্যায়িকা কাব্য হ'লেও অপূর্ব কবিত্বের মাধ্যমে প্রণয়ের গতি ও সমাজের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন বালক-কবি 'বনফুল'-এর মধ্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি "কচ ও দেবযানী," "নষ্টনীড়," 'চোখের বালি,' 'বিচারক'-এর মধ্যে প্রণয়ের এই গতিটিকে রক্ষা করতে পারেননি।

বনফুলের পর ভানুসিংহের পদাবলী। অবশ্য বালক-কবি রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার কবিতাবলীর সন তারিখ ঠিক মত নির্ণয় করা কঠিন; একপ্রকার অসাধ্য বললেও চলে। কোন্ দিন এই বালক-কবি যে কোন্ কবিতা লিখেছেন তা' ঠিক করা অসম্ভব। তা' ছাড়া ভানুসিংহের পদাবলীর পদগুলি কবি দীর্ঘ দিন ধরে লিখেছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ চোদ্দ বৎসর বয়সে কবি প্রথম বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করে "ভানুসিংহ" এই ছদ্মনামে পদ লিখতে আরম্ভ

করেন, কিন্তু ১২৮৪ সালের প্রথম বর্ষের 'ভারতী'র আশ্বিন সংখ্যার পূর্বে কোন পদই প্রকাশিত হয়নি।

"ভানুসিংহের পদাবলী" লিখবার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। এই সময় অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং সারদা চরণ মিত্র "বৈষ্ণব পদাবলী" প্রকাশনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিশেষতঃ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগুলি বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। "বিদ্যাপতির রাধা" শীর্ষক প্রবন্ধে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যে সমালোচনা করেছেন তা ভক্ত হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এমন সুন্দর সমালোচনা এ পর্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়েনি। উপরি-উক্ত সংগ্রহপুস্তকে বিদ্যাপতির "ব্রজবুলি পদ"-এর ধ্বনিমাধুর্য বালক-কবিকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। এই ধ্বনিই বালক-কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে আকুল করে তুলেছিল। বৈষ্ণবী ভক্তির যে বীজ এই সময়ে কবির মনোভূমিতে উপ্ত হলো পরবর্তীকালে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। এর উপর এই বালক-কবি অক্ষয় চন্দ্রের কাছে শুনলেন আর এক বালক-কবি— চ্যাটারটনের গল্প। চ্যাটারটন বাল্যকালে ইংলণ্ডের প্রাচীন কবিদের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ করে কবিতা লিখে Rowley Poems নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। জনসাধারণের কাছে তিনি জানিয়েছিলেন যে Rowley ব্রিষ্টলের জনৈক অধিবাসী ছিলেন এবং পুথিতেই তাঁর কবিতাগুলি এ যাবৎ নিবদ্ধ ছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাগ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। পরে অবশ্য এই কবিতাগ্রন্থটি যে চ্যাটারটনের নিজের লেখা সকলেই তা' জানতে পারে। দ্বিতীয় চ্যাটারটন হ'বার ইচ্ছা থেকেই বালক-কবি রবীন্দ্রনাথের মনে "ভানুসিংহের পদাবলী" লিখবার প্রয়াস আসে। কিন্তু এহো বাহ্য। আসল কথা বৈষ্ণবী ভক্তি এবং বৈষ্ণবী সাধনা বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৈষ্ণব পদকর্তারা অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্ত সাধক। ভক্তিধর্মের চরম কথা তাঁদের পদাবলীর মধ্যে নিহিত আছে। এ আলোচনা বিস্তারিতভাবে এর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেননি। বৈষ্ণবী সাধনার বিশিষ্ট ধারাটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনার স্বরূপটি উদ্ঘাটন করাই আমাদের ইচ্ছা। বিশেষভাবে

আলোচিত হ'লে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে বাল্মীকি ও কালিদাসের বংশধর, সাধনার ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়বাদী বৈষ্ণব কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁর গুরু আর প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি বিহারীলাল তাঁর পথপ্রদর্শক।

বাল্যকালের রচনা হ'লেও এবং তাতে মৌলভাবের অভাব থাকলেও ভানুসিংহের পদাবলীকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে কবি প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশে অতীন্দ্রিয়ভাব কিভাবে কবিমানসে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাই হোলো এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় "ভানুসিংহের পদাবলী"-তে অতীন্দ্রিয়ভাবের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হ'য়েছে। এর আর সব পদ ছেড়ে দিলেও—

মরণ রে,

তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এবং

কো তুঁহু বোলবি মোয়।
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়।

এই পদ দুইটি শাশ্বত সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদিও বৈষ্ণব-বিনয়ের সঙ্গে জীবনস্মৃতিতে পরবর্তীকালে ভানুসিংহের পদাবলী প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"ভানুসিংহ যিনিই হোন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার ভাষা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুংটাং মাত্র।"—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ—৬৬ (জীবনস্মৃতি)।

রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর সমালোচনা পড়বার পরও কিন্তু পাঠকের ভানু-সিংহের পদাবলীর প্রতি অনুরাগ একটুও কমেনি। সুতরাং এই কঠোর সমালোচনা পাঠকের অনুরক্তির উপর আদৌ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর ভানুসিংহের পদালীর ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা যদি থেকেও থাকে, আন্তরিকতার অভাব ছিল না; আর ছিল না ধ্বনির অভাব। এও কি কম? এই আন্তরিকতা বা সাহিত্যে যাকে বলে সহৃদয়-হৃদয়-সম্বাদীভাব এবং ঐ ধ্বনি কবিতার ক্ষেত্রে যা অনেক খানি স্থান জুড়ে থাকে, তাকে অবহেলা করা যায় কেমন করে।

মেঘদূতের ভাবে ভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন "মেঘদূত" কবিতা লিখেছিলেন, ঠিক তেমনই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবে ভাবিত হয়ে এই ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন। এটি "মা নিষাদ"-এর মত আকস্মিক নয়। মলয়ের মৃদু পরশে যেমন পদ্মের পাপড়ি আস্তে আস্তে মেলতে থাকে, ঠিক তেমনই করে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব-পরশে বালক-কবির হৃদপদ্মের পাপড়ি মেলে ছিল। আমাদের এত কথা বলবার কারণ কি? কারণ এই যে, অতীন্দ্রিয়বাদী কবি রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদের পথে এই প্রথম পদক্ষেপ। আর এই অতীন্দ্রিয়ভাবটি রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট 'ভাব' বা "বাদ"।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবে এমনই ভাবিত হয়েছিলেন যে, বালক-কবি মানসবৃন্দাবনে শ্রীমতী ও গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তাই কখন্ তার শেলেটে লিখে ফেল্লেন,—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।

* * * *

দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে ;
আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যাম কো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

ভাব-সম্মিলনের এই পদটির তুলনা কোথায় ? তার পর ধ্বনি। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের ধ্বনি—বৈষ্ণব পদাবলীর ধ্বনি বাদ দিলেও—বালক-কবি কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন তাও দেখবার মত।

ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী ॥ ১ ॥
নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।

* * * *

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ ৩ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্ রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জম্ শীলয় নীলনিচোলম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ। ৫ম সর্গ। ১১শ গীত ॥

এখানে রাধাবিরহে শ্রীকৃষ্ণের আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বালক-কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর অকুলতা বর্ণিত হয়েছে। পড়লেই মনে হ'বে—কবি নিজেই শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হয়েছেন। ভাব-সম্মিলনের এই পদটির মধ্যে কবি সেই অতি অল্প বয়সে যেমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই তার মধ্যে তুলেছেন শ্রীগীতগোবিন্দের ধ্বনি-তরঙ্গ।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী—
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।
নীল আকাশে, তারকা ভাসে
যমুনা গাওত গান,

পাদপ মর মর, নির্ঝর ঝর ঝর
কুসুমিত বল্লীবিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা।"
চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢল ঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে।
ভনে ভানু অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

বৈষ্ণব কবিদের অতীন্দ্রিয়ভাবের সাধনা যে এই বালক-কবিকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছিল, ভানুসিংহের পদাবলী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবশ্য বালক-কবির অবচেতন মনে এই ভাব ক্রিয়াশীল থাকলেও তার বহিঃ-প্রকাশ ছিল না সব সময়। তাই এর পর কবির লেখনী হ'তে বেরিয়ে এল— কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড, ভগ্নতরী, ভগ্নহৃদয়, বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া। কাল-মৃগয়ায় এসে শেষ হোলো প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে—সন্ধ্যাসঙ্গীত, তৃতীয় পর্বে—প্রভাতসঙ্গীত, চতুর্থ পর্বে—ছবি ও গান, পঞ্চম পর্বে—প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্য কাব্য), ৬ষ্ঠ পর্বে—কড়ি ও কোমল, সপ্তম পর্বে—মায়ার খেলা (গীতি নাট্য)।

ভানুসিংহের পদাবলীর পর এ পর্য্যন্ত কবির মধ্যে অতীন্দ্রিয়ভাব সুপ্ত ছিল। মানসীতে এসে এই সুপ্তির ঘোর কেটে গেল। এল জাগরণ। এই সময় কবির বয়স ছাব্বিশ বৎসর। কবিমনের অস্থির ভাব কেটে গেছে এই

সময়। তার স্থানে এসেছে স্থৈর্য ও প্রশান্তি। মনের স্থৈর্য ও প্রশান্তির মধ্যে কবি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করেছেন তাঁর কবিতার অবলম্বন রূপে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হোলো প্রকৃতি ও মানব। কবি বুঝলেন—প্রকৃতি ও মানব এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর এই উভয়কে অবলম্বন করে আছে এক অখণ্ড সৌন্দর্য। কবি আরও বুঝলেন—এই সৌন্দর্যের মধ্যে আছে চিরসুন্দরের অধিষ্ঠান। এই চিরসুন্দরের উপলব্ধি এসেছে কবির রোমান্টিক উপলব্ধিতে। তার পর এই রোমান্টিক উপলব্ধি মিষ্টিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রমানসের অনুভূতি মহাবিস্ময়কর। কবিপ্রতিভার সাগরসঙ্গমে যে চিন্তাধারাগুলির মিলন ঘটেছে, তাহাও বিস্ময়কর। যে অখণ্ড সৌন্দর্য কবি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে দেখলেন, সেখানেই এলো রোমান্টিক অনুভূতি। ঐ অনুভূতির মধ্যে কবি অনুভব করলেন চিরসুন্দরকে। এখানে দেখা গেল কবি রূপকে অবলম্বন করে রূপসাগরে ডুব দিয়ে আশা করলেন অরূপ রতনকে। সীমার মধ্য থেকে অসীমকে উপলব্ধি করে, অন্তকে ছাড়িয়ে অনন্তে যেয়ে অনন্তের বংশীধ্বনি শুনতে চেয়েছেন। চেনা-অচেনার, আলো-আঁধারের মধ্যে কবির উদ্দেশ্য শুধু আনন্দরস পান। লুব্ধ ভ্রমরের মত নিশিদিন কবি শুধু গান গেয়েছেন গুন্ গুন্ রবে আর পান করেছেন আনন্দরস কণ্ঠভরে। মহা-বিস্ময়ে কবি চিরসুন্দরকে অন্তরে উপলব্ধি করছেন। সৌন্দর্য ও বিস্ময় কবি-হৃদয়কে করেছে উদ্‌বেল। সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের পটেলেখা ছবিতে—ছায়াবাণীর মত—কবি শুনছেন এক অলৌকিক গুঞ্জরণ—বিরহ-মিলনের স্বপ্নময় কাহিনী, যেন মর্ত্যে স্বর্গীয় সঙ্গীত।

আলো-আঁধারের, চেনা-অচেনার রোমান্টিক জগতে অলৌকিক গুঞ্জরণ শুনতে শুনতে যে মুহূর্তে বিরহ-মিলনের স্বপ্নময় রাজ্যে উপস্থিত হয়ে কবি শুনলেন স্বর্গীয় সঙ্গীত অমনি রোমান্টিকভাব মিষ্টিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবে পরিণত হোলো। রবীন্দ্র কবিমানসের এই ভাব দুরধিগম্য। বস্তুরূপকে প্রচ্ছন্ন রেখে, কখন হঠাৎ ভাবরূপ দান করলেন, উদারা মুদারা ছেড়ে হঠাৎ তারায় সুরপঞ্চমে কবি গান ধরলেন। রবীন্দ্রমানসের এই ধারা পরিবর্তন বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার।

রবীন্দ্র কবি-মানসের এই অতীন্দ্রিয়ভাব আলোচনায় আসবে কবির জীবন-দেবতাবাদ। জীবনদেবতাকে দেখেছেন কবি তিন ভাবে। প্রথম জগন্ময় (objective), দ্বিতীয়—মন্ময় (subjective), তৃতীয়—তন্ময় (creative)।

জগন্ময়ভাবে কবির জীবনদেবতা সর্বভূতে বিরাজমান ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্মকে কবি দেখেছেন অনলে অনিলে নভোনীলে সাগরে ভূধরে বিপিনে জলদের গায় শশীসূর্যে তারকায়—এক কথায় পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণুতে। প্রকৃতির মধ্যে মানবের মধ্যে কবি দেখেছেন পরমব্রহ্মকে, দেখেছেন নারায়ণকে, দেখেছেন সত্য শিব সুন্দরকে। ঔপনিষদিক ঋষিরা যেমন ব্রহ্মের প্রকাশ দেখেছেন সর্বত্র, তেমনি রবীন্দ্রনাথও সর্বত্রই দেখেছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। তাই তিনিও ঋষি। বৈষ্ণবদের শান্ত দাস্য ও বাৎসল্য ভাবের সাধনার সঙ্গে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের এই জগন্ময়ভাবের সাধনা তুলনীয়। মন্ময়ভাবে কবি জীবনদেবতাকে দেখেছেন আত্মার আত্মীয়ভাবে। জীবনদেবতা কবির পর নয়, একেবারে আপন জন। একেবারে তিনি-আমি এক। দুয়ের স্থান নেই সেখানে। কবি আপন অন্তরে জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করে কখন তাঁকে কাব্যলক্ষ্মী, কখন প্রিয়তম, কখন মানসসুন্দরী, কখন প্রিয়তমা, কখন দেবী, কখন মহারাণী, কখন স্বামী, মহারাজ, সুন্দর—এমনি নানা ভাবে গ্রহণ করেছেন। সাধক মহাভাবের মধ্যে ডুবে গেলে যেমন সম্বিত থাকে না, এও ঠিক সেই অবস্থা। কবি যেন একেবারে বৈষ্ণব সাধক। বৈষ্ণব সাধকদের সখ্য ও মধুর ভাবের সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্ময় ভাবের সাধনা তুলনা করা যেতে পারে। আবার তত্ত্বময়ভাবে কবি জীবনদেবতাকে দেখেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে। জীবনদেবতা এখানে রহস্যময় চলমান মহাশক্তিধর পুরুষপ্রবর। তাঁরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে পৃথিবীর সব কিছু গতিশীল। অবশ্য এই চলায় বিরতিও আছে। আবার চলা ও থামার মধ্যে একটা ছন্দ ও মিল আছে যা কখনও ভেঙে যায় না।

রবীন্দ্রমানসের একটি বিশেষ ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সবিশেষ ভাব থেকে নির্বিশেষ ভাবে পরিক্রমণের মধ্যে। এই ভাবপরিবর্তনই রোমান্টিক ভাব হ'তে মিষ্টিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবে ভাবিত হওয়া। পরিচয়ের রাজ্য থেকে কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে অপরিচয়ের রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে কবি নির্বিশেষ আনন্দ রস আকণ্ঠ পান করছেন আর তারই ফলশ্রুতিতে আমরা শুনছি এক স্বর্গীয় সঙ্গীত, দেখছি এক অভিনব রূপ, ভ্রমণ করছি কবির সঙ্গে কবিকল্পনার স্বপ্নরাজ্যে। স্বপ্নরাজ্য হ'লেও স্বপ্নের মত তা অলীক নয়। বাস্তব ভিত্তির উপরে ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এখানেই কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। আর এই বিশিষ্টতাই রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার অভিনব অবদান।

এই ভাবের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'মানসী'র 'অহল্যার' প্রতি কবিতায়। আমাদের এই বিরাট বিশ্ব যে চৈতন্যময়ী জননীস্বরূপা কবি এই ধারণার-বশবর্তী হয়ে এই কবিতা লিখেছেন। সন্তান জননীর সত্তা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে আর সেই সন্তান হয় জননীর অপার স্নেহের অধিকারী। আমরাও বিশ্বজননীর সন্তান। তাঁর পরিপূর্ণ স্নেহ আমরা সর্বদাই লাভ করি। এই বিশ্ব তাই জড় নয়, চৈতন্যময়ী, প্রাণময়ী, স্নেহময়ী, করুণারূপিণী আর আমরা তাঁর স্নেহধন্য।

শাপমুক্ত অহল্যাকে গ্রহণ করে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বিশ্বজননীর অপার স্নেহ উপলব্ধির এই নব প্রণালী রবীন্দ্র প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। বিশ্ব-সাহিত্যে এই নব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব। এই পরিকল্পনায় বিশ্বকবি একম্ অদ্বিতীয়ম্। স্থিরবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবি এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের এই সুন্দরী পৃথিবী নির্জীব বা চেতনাহীন নহেন, আমাদের স্নেহময়ী জননী তিনি। আমাদের দুঃখে কষ্টে তিনি উদাসীন থাকেন না। তিনি সন্তানস্নেহব্যাকুলা, স্নেহ-মমতায় বিপুলা। কবি তাই শাপমুক্ত অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করছেন,—

—আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মামাঝে?

ধরিত্রীর মধ্যে চৈতন্যময়ী স্নেহময়ী জননী-রূপ দেখে ধন্য হয়েছেন কবি। এখানেই কবি রোমান্টিক ভাব হ'তে মিষ্টিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবে ভাবিত হয়েছেন।

এই ভাবের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়—'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। পুরীতে সমুদ্র দেখে কবির মনে হয়েছে সমুদ্র আদি জননী। বসুন্ধরা তাঁর একমাত্র কন্যা। আর পৃথিবীর লক্ষ কোটি জীব ঐ বসুন্ধরার সন্তান। মহাসমুদ্রের যে গম্ভীর ধ্বনি প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে ঐ ধ্বনি আর

কিছু নয়, ঐ ধ্বনি দেবতার কাছে একমাত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলা জননীর কাতর প্রার্থনা। সমুদ্রকে সম্বোধন করে কবি তাই বলছেন—

—তাই তন্দ্রা নাই আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

মহাসমুদ্রের এই অপার স্নেহের পরিচয় কিভাবে কবি পেয়েছেন তাও জানিয়েছেন ঐ কবিতার মধ্যে। যখন মহাসমুদ্রের গর্ভে বসুন্ধরার সৃষ্টি-সম্ভাবনা হয়েছিল, যখন ভ্রূণরূপে বসুন্ধরা মহাসমুদ্রের গর্ভে ছিল, তখন পৃথিবীর লক্ষ কোটি প্রাণীও ঐ অজাত ভুবনভ্রূণের মাঝে ছিল। কবিও ঐ সঙ্গে ছিলেন। তাই তিনি মহাসমুদ্রের ঐ স্নেহের পরিচয় পেয়েছেন। কবি তাই বলেছেন,—

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

'সোনারতরীর' 'বসুন্ধরা'-কবিতায় ঐভাব আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। 'বসুন্ধরা' সমস্ত জীবের জননী। ভ্রূণরূপে জীব যখন জননী জঠরে অবস্থিতি করে, তখন জননীর সমস্ত ভাব-ভাবনা ঐ ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বসুন্ধরা তাঁর সমস্ত সন্তানকে সমানভাবে ভালবাসেন। মানব পশুপক্ষী লতা-গুল্ম কীটপতঙ্গ অণুপরমাণুতে তাঁর সমান স্নেহ। সর্বব্যাপী তাঁর সেই বিরাট স্নেহ। পৃথিবীর জন্মলগ্নে কবিও ভুবন-ভ্রূণের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তার পর বহু দিন অতিবাহিত হ'লে পৃথিবী জেগে উঠলো সমুদ্রের গর্ভে। বহু বৎসরে বন্ধ্যা পৃথিবী হয়ে উঠলো সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। আবির্ভাব হোলো পৃথিবীর বুকে লক্ষ কোটি প্রাণী মানব-মানবী, যারা ছিল তাঁর গর্ভে। সেখানে অবস্থিতি কালে তাঁরা জেনেছিল ধরিত্রীর স্নেহ-প্রেম, ব্যথা-বেদনা কতখানি সঞ্চিত আছে তাঁর ঐ লক্ষ কোটি সন্তানের জন্য। কবি জননী ধরিত্রীর গর্ভে বাসকালে জননীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বিশ্বের লক্ষ কোটি প্রাণীকে ভালবাসবার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে বাস করে নিজ ভালোবাসা সকলকে জানাবার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে আবার পৃথিবীর গর্ভে আশ্রয় লাভ করতে চাইছেন। তা'হ'লে তিনি তেজঃরূপে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সঞ্চারিত করে নিজের স্নেহ প্রেম, ব্যথা-বেদনা সকলকে জানাতে সমর্থ হ'বেন। আবার অপরের স্নেহ-প্রেম, ব্যথা-বেদনাও তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন। এইভাবে বিশ্বের সকল নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা-গুল্মের আত্মীয় হ'তে বাসনা করে কবি 'বসুন্ধরা'-কে উদ্দেশ করে বলছেন,—

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে, ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত। বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,

শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে।

কবি উপলব্ধি করেছেন—তিনি বহু বর্ষ পৃথিবীর সঙ্গে মিশে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সবিতৃমণ্ডল প্রদক্ষিণ করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গে মিশে থাকবার ফলে তাঁর বুকের উপরও তৃণ জন্মেছে, ভারে ভারে ফুল ফুটেছে। তাই কবি বলেছেন,—

———আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।

এই সবিশেষ ভাবটি পরিণতি লাভ করে নির্বিশেষ ভাবে রূপায়িত হয়েছে, 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতায়। ভাস্বর ভাস্করকে কবি গ্রহণ করেছেন জ্যোতির কনকপদ্মরূপে জ্যোতির্ময়ের প্রতীকরূপে। জ্যোতির্ময় পরম ব্রহ্ম সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। তাঁর সক্রিয় অবস্থা থেকেই সৃষ্টির আরম্ভ। সেই সক্রিয় অবস্থাই সবিতৃদেব। ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। সবিতৃদেবও তেজোরূপে সর্বজীবে অধিষ্ঠিত। তাই পরমব্রহ্মের প্রতীক সূর্যই সৃষ্টির মূল, সূর্য থেকেই সৃষ্টি। সূর্যের তেজই সমস্ত নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা-গুল্ম, এক কথায় প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে বিরাজিত। এই তেজই সব কিছুর মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে তাকে করেছে প্রাণবন্ত। যে দিন সূর্যদেব এই তেজঃ যার কাছ থেকে সংহৃত করে নেন, সেই দিনই সে আমাদের নয়নসমুখ থেকে চলে যায় অন্য কোথা, অন্য কোন স্থানে—নতুনভাবে আবির্ভাবের জন্য। এই সূর্য-রহস্য জেনেছেন কবি। তাই বলেছেন,—

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমোনম।

তমিস্রসুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তম
সে বংশী আমারি চিত্ত ; রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরি,
নির্ঝরে কল্লোল—
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি—
জীবনহিল্লোল ॥

এইভাবের পরিণতি লাভ করেছে এই 'সাবিত্রী'-কবিতার শেষ স্তবকে। এখানে সবিতৃদেবকে কবি গ্রহণ করেছেন পরমব্রহ্মরূপে, পরমাত্মারূপে। পরিণামে যেমন জীব লীন হয় পরমব্রহ্মে, জীবাত্মা মিশে যায় পরমাত্মার সঙ্গে, ঠিক তেমনই কবিও আকূতি জানিয়েছেন সবিতৃদেবরূপ পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে। প্রারম্ভে যে সবিতৃদেব হ'তে তিনি উদ্ভূত হয়েছেন আবার পরিণামে তাঁহাতেই মিশে যেতে চেয়েছেন অর্থাৎ যেখান থেকে তিনি এসেছেন কাজ শেষে সেখানেই যাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। কবি তাই আকুল ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন,—

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
বুকে লও তারে।
শান্তি—অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি—উৎসধারে।
সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে ॥

আবার সৌন্দর্যদর্শনের মধ্যেও রবীন্দ্রমানসে রোমান্টিকভাব মিষ্টিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবে পরিণতি লাভ করেছে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ-এর 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার মধ্যে কবি সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর নতুন অনুভূতির সংবাদ জানিয়েছেন আমাদিগকে। কবি এখানে বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন যে, সৌন্দর্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজমান। তাঁকে দর্শন করতে প্রয়োজন মর্মচক্ষু। চর্মচক্ষে বিশেষ সৌন্দর্য দর্শন করা যায়। কিন্তু নির্বিশেষ

সৌন্দর্য দর্শন করবার ক্ষমতা চর্মচক্ষুর নেই। এই নির্বিশেষ সৌন্দর্য দর্শন করবার অধিকারী একমাত্র মর্মচক্ষু। সুরদাস তাই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে চর্মচক্ষুর বিনাশ চেয়েছেন। আর চেয়েছেন তার পরিবর্তে মর্মচক্ষু।

এই সর্বপ্রথম কবি উপলব্ধি করলেন যে, পরম সত্য নিহিত আছে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যসম্ভোগের মধ্যে। ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যসম্ভোগই অতীন্দ্রিয়বাদ। সুরদাসের প্রার্থনার মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের কথাই বলেছেন কবি। প্রধানতঃ নারীসৌন্দর্যকে অবলম্বন করে তিনি এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য পরিবেশন করেছেন। অন্ধ কবি সুরদাস তাই রবীন্দ্রনাথের অবলম্বনীয় হয়েছেন। এখানে সীমা হ'তে অসীমে, রূপ হ'তে অরূপে, অন্ত থেকে অনন্তে যাত্রা চলেছে। এই যাত্রাতে কবি অতীন্দ্রিয় আনন্দ আস্বাদন করেছেন।

বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ এই যাত্রার বৈশিষ্ট্য। কবি তাই নারী সৌন্দর্য আশ্রয় করেছেন যাত্রার অবলম্বনরূপে। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার প্রতিমা হোলো নারীসৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্য সামনে রেখে হৃদয়-অর্ঘ্যে মর্মচক্ষুর দ্বারা চলেছে পূজা। কবি-পূজারী আত্মনিবেদন করেছেন দেবীর চরণে।

নারীসৌন্দর্য স্বভাবতই মানবচক্ষু আকর্ষণ করে। চক্ষু তাই মানবকে সর্বনাশের পথে অগ্রসর করে দেয়। যে চক্ষু মানবের পরম সম্পদ, যে চক্ষু আলোর পথে চলতে মানবের পরম সহায়, সেই চক্ষুই আবার মানবের পরম শত্রু হয়। নারীর যে দৈহিক সৌন্দর্য, সেই দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে ইন্দ্রিয়াসক্ত এই চক্ষু। বাসনাঘন চক্ষু তাই মানবের পরম শত্রু। কবি তাই সুরদাসের মাধ্যমে ঐ বাসনাঘন চক্ষুর বিনাশ কামনা করে বলেছেন,—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।
লও, বিঁধে দাও বাসনাঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে মর্মতলে,
নির্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ
তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমারি হোক্।

বাস্তবিকপক্ষে কামনাঘন চর্মচক্ষুতে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই দৃষ্ট হয়। যে অনন্ত সৌন্দর্য বিরাট বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, সেই অনন্ত সৌন্দর্য কামনাঘন ইন্দ্রিয়াসক্ত চর্মচক্ষে পতিত হয় না। পরন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য মনে শুধু কামেরই উদ্রেক করে। আর এই কামই মানবকে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়। এমন কি উপাস্যাদেবীর দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যেও সুরদাসের কামদৃষ্টি নিপতিত হয়েছিল। নারীর এই সৌন্দর্যই পুরুষ কামনাঘন দৃষ্টিতে দেখতে সতত লালায়িত থাকে, আর এখানেই ঘটে সর্বনাশ। অথচ নারীর এই সৌন্দর্য তো শাশ্বত সৌন্দর্য নয়। যা শাশ্বত নয়, যা নিত্য নয়, যা জরার অধীন সে সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্য আদৌ লালায়িত হওয়া উচিত নয়। সুরদাস এই বুঝে দেবীর কাছে আঁখির বিনাশ চেয়েছেন। আঁখির বিনাশ হ'লে পর এই বিশাল পৃথিবীর বাস্তব সৌন্দর্য চোখের সমুখ থেকে লুপ্ত হ'বে। অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল, বাসন্তী সৌন্দর্য, নদীর স্বচ্ছ জল, সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি, শস্যক্ষেত্রের বিচিত্র শোভা, সুনীল গগনতল, প্রাতঃ সূর্যের অরুণাভা, চকিততড়িত সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্রধনু, শারদীয়াজ্যোৎস্না—এ সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখের সমুখ হ'তে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। তবু সেই চর্মচক্ষুর বিনাশ ইচ্ছা করে সুরদাস উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—

লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ চিত্রপটে।

চর্মচক্ষুর বিনাশ হ'লে পর ক্ষণিকের জন্য জগৎসংসার অন্ধকার বলে মনে হ'বে। আর মর্মচক্ষুর দ্বার খুলে গেলে পর বিশ্বব্যাপী যে অনন্ত সৌন্দর্য বিরাজমান, যে সৌন্দর্যের পরিবর্তন নেই, সেই শাশ্বত নিত্য সৌন্দর্য চোখের সামনে ফুটে উঠবে। তখন সেই মর্মচক্ষুতে দেখা যাবে—জগৎ আলোময়, সে আলোর মধ্যে কোন কালো নেই, সে আলো ম্লান হয় না। সে আলো ভাস্বর দীপ্তিতে চিরবিরাজমান। বিশ্বব্যাপী এই অনন্ত সৌন্দর্য, এই চির অম্লান আলো রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে আবির্ভূত হ'লে পর তিনি সুরদাসের প্রার্থনায় তারই রূপ দিয়েছেন। সৌন্দর্যকে তিনি কামনাঘন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন,—

গিয়েছিল দেবী সে ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ করো একেবারে।

চর্মচক্ষু বিনষ্ট হ'লে পর মর্মচক্ষুর দ্বার উদ্ঘাটিত হ'বে। তখনই ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত সৌন্দর্য মর্মচক্ষুতে ধরা পড়বে। সেই নিত্য সৌন্দর্যের পরিবর্তন নেই, সে সৌন্দর্য অক্ষয়, অব্যয়। সেই সৌন্দর্যই চিরসুন্দরের সৌন্দর্য, জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি। এই সৌন্দর্য দর্শনেই লাভ হয় অতীন্দ্রিয় আনন্দ। সৌন্দর্যের সেই রূপসাগরে ডুব দিলে অরূপরতন লাভ হয়। অতীন্দ্রিয়বাদের সার্থকতাই সেখানে। সেই শাশ্বত সৌন্দর্যের সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন—

> সে নব জগতে কালস্রোত নাই পরিবর্তন নাহি
> আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন রবে চাহি।

সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নির্বিশেষ রূপের পরিচয় আছে 'চিত্রা' কাব্য গ্রন্থের 'উর্বশী' কবিতায়। রবীন্দ্রমানসের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এই কবিতায়। রবীন্দ্র কবিমানসের সৌন্দর্যানুভূতির চরম বিকাশ ঘটেছে উর্বশীতে। বস্তুতঃ বস্তুনিরপেক্ষ শাশ্বত (Abstract and Absolute) সৌন্দর্যই হোলো উর্বশী। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উর্বশীকে তাঁদের আলোচনার অঙ্গীভূত করেছেন। আর ঋগ্‌বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই উর্বশীকে গ্রহণ করেছেন সৌন্দর্যের সারাৎসাররূপে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে উর্বশী-পুরুরবার বর্ণনা আছে।

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির অলৌকিক শক্তি দেখে প্রকৃতির মধ্যেই দেবতার সন্ধান পেয়েছিলেন। বেদের সূক্ত সম্যক প্রণিধান করলেই এই সত্যই উপলব্ধি হয়। আবার এই দেবগণকে মানবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ করাতেই ছিল তাঁদের আনন্দ। তাই ঋষিকবিরা তাঁদের সেই আনন্দ বেদের ছন্দে তার রূপ দিয়ে লাভ করেছিলেন চরম আনন্দ। এই রূপায়ণে তাঁরা অরূপকে এনেছিলেন রূপের মধ্যে। অসীমকে সসীমে অনন্তকে অন্তের মধ্যে এনে তাঁরা লাভ করেছিলেন ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বৈদিক ঋষিরা যে সৌন্দর্য দর্শন করলেন, তার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই উর্বশীর সৃষ্টি। অরূপকে রূপের মধ্যে এনে তার রূপ সাগরে ডুব দিয়ে আবার অরূপরতন লাভ করবার মানস ছিল তাঁদের। উর্বশী-পুরুরবার বিবরণ তারই প্রমাণ।

সৌন্দর্য উপভোগের বাসনাই ঋষিকবিদের মনে পর্যবসিত হোলো সৌন্দর্য সম্ভোগের ইচ্ছাতে। সৌন্দর্যসম্ভোগ থেকেই আবার আসে ভোগ-

বিরতি। ভোগবিরতির মধ্যেই ঐ অরূপরতন লাভ হয়। এখানে ঐ সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশী রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় এসেছে,—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িতপদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উর্বশী মানসসম্ভবা। ইনিই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মর্মচক্ষুতে দর্শন করে মানসলোকে অতীন্দ্রিয়রাজ্যে এনে এর সঙ্গে অতীন্দ্রিয় আনন্দ উপভোগ করা যায় মাত্র। এ সৌন্দর্য দেহ-কামনার উর্ধ্বে। ইহাই অমৃত। বস্তুতঃ রূপাতীত বস্তুনিরপেক্ষ শাশ্বত সৌন্দর্য মানসে উপভোগই করা যায় শুধু। উর্বশী যদি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ রাজ্যে সাধারণ মানবী হয়ে ধরা দেয়, যদি সাধারণ মানবীর মত ঐ উর্বশী মানবের সম্ভোগের পাত্রী হয়, তবে তার পরিণতি বিষ। উর্বশীর এক হাতে তাই সুধাপাত্র ও অন্য হাতে বিষভাণ্ড থাকে।

ঋগ্‌বেদের ঐ সূক্তেই পাওয়া যায়—পুরুরবা ইলা বা 'পৃথিবীর পুত্র। সুতরাং মানবমাত্রেই পুরুরবা। আর মানবমাত্রেই তো সৌন্দর্য সম্ভোগ-লিপ্সু। তাই পুরুরবা ব্যক্তিবিশেষ হয়েও ব্যক্তিনির্বিশেষ। এই পুরুরবা সৌন্দর্যের সারাৎসার উর্বশীকে মানবীমূর্তিতে সম্ভোগ করতে আকুল হয়ে উঠেন। বৈদিক রসিক ঋষিকবিও ছন্দোবন্ধে তাই ধরিয়ে দিলেন উর্বশীকে পৃথিবীর জ্যেষ্ঠসন্তান পুরুরবার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে। এখানেই এল ট্রাজেডি। যিনি ছিলেন অধরা, ধরা পড়লেন তিনি। কিন্তু অধরাকে কি ধরে রাখা যায়? তাই উর্বশীকেও রাজা পুরুরবা ধরে রাখতে পারলেন না। রাজার মনে এল বিষম বিরহ। বিরহ-ই বিষ। এই বিষের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত—
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা॥

উর্বশীর সুধাপাত্রের সুধা তিনিই পান করবার অধিকারী যিনি সৌন্দর্যকে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে অতীন্দ্রিয় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। শাশ্বত সৌন্দর্যকে ভাবরাজ্য থেকে টেনে এনে বাস্তবে সম্ভোগ করতে চাইলে অভিশপ্ত হ'তে হয়। এ অভিশাপ সর্বকালের। মানুষ উর্বশীর হাতের সুধাই চায়, কিন্তু তার সম্ভোগবাসনা হয়ে উঠে প্রবল, সে তখন পায় উর্বশীর হাতের বিষ-ভাণ্ডের বিষ।

অনন্তযৌবনা উর্বশীর কিন্তু বালিকা বয়সও ছিল। যেদিন মহাসমুদ্রের গর্ভে এই বিশাল পৃথিবীর সৃষ্টিসম্ভাবনা হয়েছিল, সেদিন সেই সমুদ্রগর্ভস্থ ভুবনভ্রূণের মধ্যে উর্বশীরও অস্তিত্ব ছিল। পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীও বেড়ে উঠেছে, সেই পৃথিবী যেদিন যৌবনবতী হয়ে শ্যামলা হ'ল, উর্বশীও সেদিন অনন্তযৌবনা হয়ে আবির্ভূত হ'ল শ্যামলা পৃথিবীর উপর। রবীন্দ্রনাথ সেইরূপের প্রশস্তি গেয়ে বললেন,—

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা,
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা॥

ঋগ্‌বেদের এই উর্বশীকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রূপ দিয়েছেন। প্রত্যেকেই আপন সৃষ্টির মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। মহাভারতে মহামুনি ব্যাস উর্বশী-পুরূরবার আখ্যায়িকা তাঁর মত করে লিখেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিক্রমোর্বশী নাটকে

আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। হরিবংশ ও পদ্মপুরাণেও উর্বশী-পুরুরবার কাহিনী আছে। মহাকবি মধুসূদনও তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকায় তাঁর কল্পনার প্রাসর্যের পরিচয় দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'উর্বশীর বিদায়' প্রবন্ধেও তাঁর প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন।

সৌন্দর্যলোকে নন্দনকাননে যিনি সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করেন, সেই উর্বশীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভার প্রধানা নর্তকী নিযুক্ত করেন। দেব-সভায় উর্বশীর নৃত্য দেবতারা উপভোগ করেন। অপ্সরা উর্বশীর রূপমোহে মুগ্ধ হন না তাঁরা। কিন্তু দেবকার্যে যে নরেন্দ্র স্বর্গে আহূত হ'তেন, দেবসভায় উর্বশীর ছন্দান্বিত নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়তেন তিনি। অথচ সৃষ্টির আদিম বসন্তপ্রাতে এই অনন্তযৌবনা উর্বশীর সৌন্দর্যে পৃথিবীর মানুষ মোহমুগ্ধ হ'তেন না। সহজভাবেই ঐ সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। কালস্য কুটিলা গতি। তাই কালের পরিবর্তনে মাটির মানুষ সৌন্দর্যকে আর সহজভাবে উপভোগ করতে পারে না। রক্তমাংসের সঙ্গে পুরুরবার মত সৌন্দর্যের সারাৎসার উর্বশীকে সম্ভোগ করতে চায়। আবার ভোগবাসনাতে সৌন্দর্য কলুষিত হয়। তাই উর্বশীকে ভোগ করতে চাইলে সে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। বিশ্বের প্রতি তৃণলতাগুল্মের অণুতে অণুতে সৌন্দর্যের মধ্যে আছে অনন্তযৌবনা উর্বশী। এই বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য অনুভববেদ্য। এর মধ্যেই অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ হয়। আধুনিক যুগের মানব এই আনন্দ কামনা করে না। কারণ তারা প্রত্যেকে পুরুরবা। পুরুরবার মত তাই তারা হারিয়ে ফেলে সুন্দরী উর্বশীকে। তাই তাদের হাহাকারের ধ্বনি ধ্বনিত হয় দিকে দিকে।

আদিম যুগ আর ফিরে আসবে না। কারণ সৌন্দর্যের প্রতি মানবের কামগন্ধহীন দৃষ্টি যে নাই। যুগপৎ আশা-নিরাশার দোল-দোলনায় কবি-মন হয়েছে দোলায়িত। কবি তাই জানিয়েছেন,—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে ॥

মানসী পর্বে রবীন্দ্রমানসে যে ভাবের জোয়ার এসেছে সেই জোয়ারে একই সময়ে কবিমনে অনুভূত হয়েছে সৌন্দর্যানুভূতি ও ঈশ্বরানুভূতি। সৌন্দর্যের মধ্যে কবি যেমন দেখেছেন চিরসুন্দরের অধিষ্ঠান, তেমনই আবার তারই মধ্যে এক স্বর্গীয় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। মনে এসেছে জীবন-জিজ্ঞাসা। মেলেনি তার সদুত্তর। অতঃপর কবি শান্তি লাভ করতে চেয়েছেন। তিনি পরে সম্যক উপলব্ধি করেছেন যে প্রেমেই শান্তি। বিশ্বব্যাপী প্রেম যদি হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়—তবে সমগ্র মানুষকে ভালোবাসা যায়। আর তাতেই শান্তি। কিন্তু এই অনন্ত প্রেম কি কবি-হৃদয়ে আছে? মানসীর নিষ্ফল কামনার মধ্য দিয়ে কবি তাই জানতে চেয়েছেন। কবি জানতে চেয়েছেন,—

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর!
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?

মানুষের মধ্যেই যে তাঁর অবস্থিতি। তাঁকে পেতে হ'লে ভালোবাসতেই হবে মানবকে। তা ছাড়া আর পথ নেই। এই ভাবই তো অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। সংশয়ের মধ্যে কবির জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর মিলেছে। তিনি বুঝেছেন—নিস্পৃহভাবে মানবকে ভালবেসে জীবনপথে অগ্রসর হলে শান্তি লাভ হবে। তাই বললেন,—

নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই ॥

এই ভাবের আরও বিকাশ ঘটেছে এই কাব্যের 'অনন্ত প্রেম' কবিতার মধ্যে। কবির জগন্ময়ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির অঙ্কুর 'নিষ্ফল কামনা'-তে দেখা গেছে। অনন্ত প্রেমের মধ্যে প্রেমময় ভগবানের নিত্য প্রেম জীব ও শিবের মধ্যে, নর ও নারায়ণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। পরমাত্মা নিত্য, জীবও নিত্য, আর এই দুয়ের যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ হোলো প্রেম। সুতরাং প্রেমও নিত্য। পরমাত্মা অনন্ত প্রেমময়, তাই প্রেমও ভগবানের মত অনাদি অনন্ত। এই অনাদি অনন্ত প্রেম নিত্যকাল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিরাজিত। তাই

যুগে যুগে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে চলেছে। প্রেমের এই সত্যরূপ উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ নূতন পথের দিশারী। জন্মজন্মান্তরের যে প্রেম, সে প্রেম মনের মধ্যে সুপ্ত থাকে, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলেই তা জাগ্রত হয়। এই প্রেমানুভূতি অপূর্ব। তাই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলেই মনে হয়—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

এই প্রেমানুভূতির বিকাশ ঘটেছে 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী' কবিতায়। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত আছে, আছে উষার রক্তিম রাগে, তরুলতা গুল্মে, পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণুতে—সেই সৌন্দর্যকে আজন্মসাধন-ধন মানসসুন্দরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি আপন মনোমন্দিরে। আর তার পরই চলেছে মানসবিহার। সেই সঙ্গে লাভ হয়েছে অপার আনন্দ। এই আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এ আনন্দের তুলনা হয় না। সৌন্দর্যকে মনের মধ্যে এনে তাকে হৃদয়েশ্বরীরূপে মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে তার সঙ্গে প্রেমালাপ করে আনন্দ লাভ করার তুলনা কোথায়? এটাই কবির মন্ময়ভাবের সাধনা। বৈষ্ণবদের মধুরভাবের সাধনার সঙ্গে শুধু এর তুলনা করা যেতে পারে।

বৈষ্ণবদের সাধনা হোলো প্রেমসাধনা। এই প্রেমসাধনা চলেছে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের মাধ্যমে। ভক্তমাত্রেই রাধা আর প্রেমময় ভগবান সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত আপন প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে মানস অভিসারে চলেছে প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য। আর 'মানসসুন্দরী'-তে সৌন্দর্যরাণীকে প্রিয়তমা সাজিয়ে তার সঙ্গে চলেছে কবির মানসবিহার। আর তার ফলশ্রুতিতে লাভ হয়েছে কবির অতুল অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই সৌন্দর্যরাণীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন,—

এসো, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—মৃণালপরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে।

কিন্তু ইনি তো ক্ষণিকের নন, ইনি চিরন্তনী। তাই একেই বলেছেন কবি কত না আবেগ ভরে—

অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধো-চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে,
সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি।

কিন্তু বালকবয়সে কবি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে যে ভাবে দেখেছেন, যেভাবে চলেছিল তাঁর মানসবিহার—যৌবনে তার পরিবর্তন হয়েছে। এখন তাঁর বাল্যের খেলার সঙ্গিনী হয়েছেন তাঁর মর্মের গেহিনী।

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু! সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা।

মানসসুন্দরীকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সে কবি করেছেন ভিন্ন ভাবের লীলা। এর মধ্যে নেই নগ্ন কামনার উগ্র ক্ষুধা, আছে শুধু ইন্দ্রিয়াতীত কাম-গন্ধহীন বিমল আনন্দ। এই মানসসুন্দরীকে নিয়ে কবি জন্ম জন্মান্তরেও লীলা খেলা করবার বাসনা করেছেন।

মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো নীরব ভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী?

মানসসুন্দরীর সঙ্গে পরজন্মের কবির কেমনভাবে লীলা চল্‌বে তারও আভাষ দিয়েছেন কবি। যদি মানসসুন্দরী পরজন্মে সত্যসত্যই মূর্তিমতী হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় আর যদি সেই পরজন্মে কবির সঙ্গে তার দেখা হয় তা' হ'লে কী অবস্থা হবে। কবি বলেছেন সে কথা।

জানি, আমি জানি, সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখাচোখি
সেই পরজন্মপথে, দাঁড়াব থমকি—
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা।

এই অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতির আরও বিকাশ ঘটেছে 'সোনার তরীর' 'ঝুলন' কবিতায়। আঁধার গগন, সঘন বরষার প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার অট্টহাসির মধ্যে কবির সঙ্গে মিলন ঘটেছে তাঁর পরাণ বধূর। এই মিলনও সেই মানসবিহার। এখানেও সেই মন্ময়ভাবের সাধনা। মানসসুন্দরী বিদেহী হয়েও এখানে সেজেছেন কবির পরাণ-বধূ। ঝুলন খেলা খেলতে গেলে যে অরূপকে রূপের মধ্যে আনতে হবে। তাই কবি চেয়েছেন.

আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ-বধূর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর.
করি' লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্॥
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল,
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্॥

কিন্তু 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য় কবি তাঁর মানসসুন্দরীকে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ সাগরের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। এখানে আবার তাঁর মানসসুন্দরী নিয়েছেন সক্রিয় ভূমিকা। এর পূর্বে কবির ভূমিকা ছিল সক্রিয় আর মানস-সুন্দরী ছিল নবোঢ়া বধূ। এখানেও সেই মন্ময়ভাবের সাধনা। বৈষ্ণবদের রাধা যেমন মাঝে মাঝে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, এখানে মানসসুন্দরীর

ভূমিকা তদনুরূপ। অবশ্য এখানেও নির্বাক্ মানসসুন্দরী কবির নিষ্কাম প্রেমের সঙ্গিনী মাত্র। ঐ সুন্দরীর সোনার তরীর যাত্রী হয়েছেন কবি গন্তব্য স্থান না জেনেও। জানবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে জেগেছে মনে। কিন্তু ঐ সোনার তরীর চালিকার কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাননি কবি। একেবারে কিছু পাননি তাও নয়। পেয়েছেন কবি ঐ সুন্দরীর অঙ্গুলিসঙ্কেত। তাই কবির জিজ্ঞাসা—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে।

আবার 'চিত্রা' কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় মন্ময়ভাবের সাধনাতে নব রূপায়ণ ঘটেছে। এখানে কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী কাব্যলক্ষ্মীরূপে রূপ নিয়েছেন। তিনি কবিকে করেছেন কবি-সম্রাট। কবির মস্তকে পরিয়ে দিয়েছেন গৌরবমুকুট। পুষ্পের মালা দুলিয়েছেন কবির কণ্ঠে। আর রাজটিকা পরিয়ে দিয়েছেন কবির ললাটদেশে। সেই দেবী তাঁর রাজআস্তরণে কবির সমস্ত দীনতা ক্ষুদ্রতা ঢেকে দিয়েছেন, যেন সেগুলি কারও চোখে না পড়ে ; কবি যেন তুচ্ছতার উপরে থেকে মহনীয় বরণীয় থাকেন। কবি আপন সৌভাগ্যের বর্ণনায় তাই বলেছেন,—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট, পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ আস্তরণে।

এই কাব্যের 'সাধনা' কবিতায় কবি দেবীর কাছে জানিয়েছেন তাঁর আকুল প্রার্থনা। বৈষ্ণব কবিদের 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলির সঙ্গে এই কবিতাটির তুলনা হতে পারে। পরিপূর্ণ বৈষ্ণববিনয়, বৈষ্ণবদৈন্য এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি যেন একালের বিদ্যাপতি। যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কবি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মালা লাভ করে শুধু বাঙালীর নয়,ভারতবাসীর নয়,এশিয়াবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন —কবি সেই সকল সাধনাকেও বলেছেন 'ব্যর্থ্য সাধনখানি'। কাব্যলক্ষ্মী বা দেবী সরস্বতীর সাধনায় যুগে যুগে পৃথিবীর বহু কবি সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁদের কাব্যবীণার তারে তারে কতই না সুমধুর ঝঙ্কার উঠেছে, সেই ঝঙ্কারে পৃথিবী মুগ্ধ হয়েছে। তাঁদের কবিখ্যাতি অনন্ত কাল কীর্তিত হবে পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে। কবিরও ইচ্ছা ছিল তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের মত কাব্যবীণা বাজিয়ে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করবেন, কিন্তু তাঁর যে সাধ ছিল সে সাধ্য ছিল না; তাই তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। বিশ্ববাসীকে তিনি আনন্দ দিতে পারেননি, তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। দেবীর কাছে তাই তাঁর আকুল প্রার্থনা—

> তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল
> কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল—
> একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল করুণামানি
> সব হ'তে তবে সার্থক হবে ব্যর্থ সাধনখানি।

'চিত্রা' কবিতায় বিশ্বব্যাপিনী বিচিত্ররূপিণী এই দেবীই কবির অন্তরে বিরাজিত থেকে কবিকে দিয়েছেন অকূল শান্তি। কবি মুগ্ধ সজল নয়নে দেবীকে দর্শন করে ভক্তি গদ গদ চিত্তে গেয়ে উঠলেন,—

> অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তরব্যাপিনী।
> একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
> একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
> একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
> চারিদিকে চির যামিনী।
> অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
> একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
> নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি—
> তুমি অচপল দামিনী।

'আবেদন' কবিতায় কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মী বা দেবী সরস্বতীর ভৃত্যরূপে মালাকর হতে চেয়েছেন। মন্ত্রী সেনাপতি বা উচ্চরাজ কর্মচারীর পদ তাঁর কাম্য নয়। তিনি ভৃত্য হয়ে দেবীর সেবা করতে চান। কবি এখানে জগন্ময়ভাবের সাধক। বৈষ্ণবদের দাস্যভাবের সাধনার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। বৈষ্ণবদের দাস্যভাবের সাধনার মূল কথা—যেন সেবায় রত থাকতে পারি। এখানেও কবি তাঁর দেবীর সেবক হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি হবেন দেবীর মালঞ্চের মালাকর। কবিতার মালা গেঁথে তিনি দেবীর সর্ব অঙ্গ সাজিয়ে দেবেন। বস্তুজগতে—যেখানে অর্থই একমাত্র কাম্যবস্তু, সেখানে হয় তো এই মাল্যরচনা অকাজের কাজ। কিন্তু কর্মজগতের বাইরেও আছে আনন্দ-জগৎ। সেই জগতে অর্থ মূল্যহীন। অর্থ তো কোন দিন মানবকে আনন্দ দিতে পারেনি, দিয়েছে শুধু ক্ষণস্থায়ী ভোগসুখ। কিন্তু কবির কবিতায়, কবির কাব্যে আছে—শত শত আনন্দের আয়োজন। যুগ যুগ ধরে মানব তাই কাব্যরস আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করে। ভোগ-সুখ এই আনন্দের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। কবিতার মালা গেঁথে কাব্যলক্ষ্মীকে সাজিয়ে দেওয়াতে কবির লাভ হয় চরম আনন্দ। কবি তাই আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন দেবীর কাছে—

প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল চরণঅঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।

যুগে যুগে পৃথিবীর সমস্ত কবিই কাব্যলক্ষ্মীকে এই ভাবে সাজিয়ে যে আনন্দ পেয়েছেন সেই আনন্দই হয়েছে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অন্য পুরস্কার এই পুরস্কারের কাছে তুচ্ছ।

'বিজয়িনী' কবিতায় কবি করেছেন 'মধুরভাবের' সাধনা। বৈষ্ণবদের মধুরভাবের সাধনার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। 'রাধা' বৈষ্ণবদের

আরাধনার ফলশ্রুতি। আর এখানে কবির কাব্যসাধনার ফলশ্রুতি হোলো অচ্ছোদসরসীনীরে স্নানরতা সেই বিজয়িনী নারী। সৌন্দর্যকে নারীরূপে কল্পনা করে সেই নারীকে নিয়ে চলেছে কবির মানসবিহার। এই মদন-বিজয়িনী নারী উর্বশীর একটি নবতম সংস্করণমাত্র। তাই এর সৌন্দর্য নিষ্কামভাবে উপভোগ করে আনন্দ লাভ করা যায়। মদন এর কাছে পরাভূত হয়। সেই পরাভবের বর্ণনায় কবি বলেছেন—

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানুপাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময় ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে ॥

'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি সেজেছেন প্রিয়তমা, আর তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর ঘটেছে রূপান্তর। দেবী এখন কবির 'জীবনদেবতা'-র রূপ নিয়েছেন। এখানেও চলেছে মন্ময়ভাবের সাধনা। বৈষ্ণবদের মধুর ভাবের সাধনার প্রভাব এখানে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। কবি সাধ্বী নারী আর জীবনদেবতা তাঁর প্রাণবঁধু। কবির হৃদয়মন্দির শুধু ঐ প্রাণবঁধুর জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেখানে আর কিছুর স্থান নেই। জীবনদেবতার অতি প্রিয় আবাস হল কবির হৃদয়মন্দির। কবি তাঁর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা সবই অর্পণ করে দিয়েছেন তাঁর জীবনদেবতাকে। প্রাণবঁধুর কাছে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে কবির মনে এসেছে জিজ্ঞাসা। কবি তাই জিজ্ঞাসা করেছেন,—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?

কবির জীবনে আছে স্খলন-পতন-ত্রুটি। সে সব ত্রুটি তাঁর প্রাণবঁধু ক্ষমা করতে পেরেছেন কি ? তাই জিজ্ঞাসা,—

কি দেখিছ, বঁধু, মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি ?

কবির স্থিরবিশ্বাস তাঁর জীবনদেবতা তাঁর সমস্ত ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেছেন। তাই নূতন করে তাঁর সঙ্গে মিলনের আশায় বলেছেন,—

জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীনজীবনডোরে॥

'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় জীবনদেবতার দুই মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও ঐ মন্ময়ভাবে মধুর রসের সমাবেশও ঘটেছে। জীবনদেবতা রাত্রে প্রেয়সীর ও প্রভাতে দেবীর বেশে এসেছেন কবির কাছে। কবিও জীবনদেবতাকে রাত্রে প্রেয়সীর রূপে গ্রহণ করেছেন, আবার প্রভাতে তাঁকে দেবী বলে সম্ভ্রম জানিয়েছেন। ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। কবি জানিয়েছেন,—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে॥

'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে॥' 'সিন্ধুপারে' কবিতায় জীবনদেবতা সেই নূতন বিবাহ ঘটিয়েছেন। এখানেও সেই মন্ময়ভাবের মধুর রস সৃষ্টি হয়েছে। সিন্ধুপারে কবিতার প্রথম দিকে জীবনদেবতা কবির কাছে এসেছেন অবগুণ্ঠনে ঢাকা রমণীমূর্তি ধরে। তিনি চড়েছেন এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে। তাঁর ইঙ্গিতে কবি চড়লেন সেখানে দণ্ডায়মান এক ধূম্রবর্ণ অশ্বে। বিদ্যুৎবেগে তাঁদের ঘোড়া ছুটে উপস্থিত হোলো সিন্ধুতীরে অবস্থিত এক রহস্যময় পুরীতে। সেখানকার এক গুহাগৃহ মধ্যে অবগুণ্ঠিতা নারীর সঙ্গে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মণিপালঙ্ক উপরে অমল শয়ন পাতা। সেখানে—

নাহি কোনো লোক, নাইকো প্রহরী, নাহি হেরি দাসদাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃতবদনে বসিলা শয্যা-'পরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।

তারপর সেই নারীর কনকদণ্ড আঘাতের শব্দ শুনে এলেন সেখানে এক বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্বা হাতে। এলো সেখানে—

পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাতনারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ-বা চামর, কেহ-বা তীর্থজল।

এর পর বৃদ্ধ বিপ্র গণনা করে বললেন,—'এখন হয়েছে লগ্ন কাল!'

শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়ালো একটি কথা না বলি
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে—
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।

গুণ্ঠিতা নারীর সঙ্গে কবির বিবাহ কার্য শেষ হয়ে গেলে বৃদ্ধ বিপ্র চলে গেলেন। তার পর এক সখী হাতে দীপ লয়ে তাঁদের দুজনকে নিয়ে গেল অন্য এক ঘরে—যেখানে ছিল—

কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত,
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্নরচিত মত,
পাদপীঠ-'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ,
আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখি নি শুধু।'

—তার পর সত্য প্রকাশিত হল।

সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা'! কহিনু নয়নজলে।

এর চেয়ে অতীন্দ্রিয় মিলন আর কী হতে পারে। এ মিলন এর পূর্বে দেখা গিয়েছে শুধু বৈষ্ণব কবিদের ভাবসম্মিলনের পদগুলিতে। বিশ্বসাহিত্যে এ ভাব দুর্লভ। সূফি-সাহিত্যে এর বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' কবিতাটি বৈষ্ণব কবিদের পূর্বরাগের পদের সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীমতী যেমন কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে পড়তেন, সেইরূপ 'শুভক্ষণে'র নারী প্রিয়তম রাজার দুলালের জন্য অধীর। এই নারীর হৃদয়-দুয়ারের পাশ দিয়ে রাজার-দুলালরূপ তাঁর জীবনদেবতা চলে গেলেও তিনি তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেন নি। তার হৃদয়ে এসেছে আকুলতা, কিন্তু উপায়! উপায় নেই। কবি নিজেই ঐ নারী আর রাজার দুলাল তাঁর জীবনদেবতা। কবির হৃদয়দুয়ার অতিক্রম করে তাঁর জীবনদেবতা চলে গেলেন, কিন্তু তিনি ফিরেও দেখলেন না প্রিয়তমারূপিণী কবিকে। প্রস্তুতি-পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি বলেই বোধ হয় রাজার দুলালরূপী জীবনদেবতা চলে গেলেন। তিনি যে চলে যাবেন তাঁর দিকে চোখ চেয়ে না দেখে কবি তা জানতেন। কবি তাই বলেছেন,—

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

'বালিকা বধূ' কবিতায় কবি সেজেছেন বালিকা বধূ আর তাঁর জীবন-দেবতা তাঁর বর, তাঁর বঁধু। কবি একেবারে নবীনা বালিকা বধূ। সংসার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই তাঁর। স্বামী কী বস্তু বালিকা বধূ তা' জানে না, তাই সে ভাবে তিনি তার 'খেলিবার ধন'। সত্যই তো, ভগবান সম্বন্ধে ভক্তের ধারণা আর কতটুকু। কবি তাই বলেছেন,—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

বালিকা বধূ যেমন ঘরসংসারের কাজ বোঝে না, যখন যেমন মনে হয় তখন তেমন কাজ করে, ভক্ত কবিও তেমনি নিখিল বিশ্বের অনন্ত রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ. তিনি তাঁর জীবনদেবতার কাজ করছেন মনে করে যখন মনে যেমন ইচ্ছা জাগে তখন ঠিক তেমন কাজ করেন। নিশি দিন পরাণপণ করি তিনি তাঁর জীবনদেবতার কাজ করে চলেন, কিন্তু মনে তাঁর শুধু সংশয় জাগে এ বুঝি হল না। তখন—

খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার, 'পালিব পরাণপণে
যাহা কহে গুরুজনে।'

এমনি করে তাঁর কত শুভক্ষণ চলে যায়, জীবনদেবতার আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেন না। শুধু তাঁর দুর্দিনে—

তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া, হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে॥

কিন্তু কবির স্থিরবিশ্বাস—বালিকা বধূর সমস্ত ত্রুটি ও অনভিজ্ঞতা মেনে নিয়ে বর যেমন তার জন্য ঘর সাজিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি তাঁর জীবনদেবতা তাঁর পতন-স্খলন-ত্রুটি মেনে নিয়ে তাঁর সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই তিনি বলেছেন,—

ওগো বর ওগো বঁধু,
জান জান তুমি ধূলায় বসিয়া এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরই তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবনমধু
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

এই দুই কবিতাতেই মন্ময়ভাবের মধুর রস সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'আগমন' কবিতায় কবি তাঁর জীবনদেবতাকে দেখেছেন জগন্ময়ভাবে আর কবি হয়েছেন বৈষ্ণব কবিদের মত দাস্য ভাবে ভাবিত। ভক্তের মনোমন্দিরে কখন যে ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে ভক্ত তা' আদৌ জানে না। যখন সে সজাগ থাকে তখন হয় না তাঁর আবির্ভাব। তখনও যে সময় হয় নি, সজাগ থাকলে কী হবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই মহারাজের আবির্ভাব ঘটবেই, প্রস্তুত অপ্রস্তুতের প্রশ্নই থাকে না সেখানে। বিদুর তো প্রস্তুত ছিল না, আর প্রস্তুত থাকবার সঙ্গতি তার কোথায়। তবু ভগবান হঠাৎ তার ঘরেই হয়েছিলেন অতিথি।

ভক্তিই সব স্থান পূর্ণ করে দেয়। শুদ্ধাভক্তির উপর কিছু নেই। এর বলেই ভগবানের দর্শন পাওয়া সহজ হয়। কবি তাই বলেছেন,—

ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা।

তত্ত্বময় ভাবের সাধনায় কবির জীবনদেবতা রহস্যময় চলমান মহা শক্তিধর পুরুষপ্রবররূপে কবিহৃদয়ে সমুপস্থিত। ইনি বিশ্বনিয়ন্তা, সৃষ্টি ও লয়ের কর্তা। এই ভাবের প্রকাশ হয়েছে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি পর্বে বৈষ্ণবী সাধনার পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল কবির উপর। অবশ্য বৈষ্ণবী সাধনার প্রভাব প্রথম লক্ষিত হয়েছিল তাঁর কৈশোরে যখন তিনি ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন। সে প্রভাব সর্বদাই তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। জীবনদেবতা প্রসঙ্গে নানাভাবে তা' আলোচিত হয়েছে। বলাকা পর্বে কবির অধ্যাত্মবাদের রূপান্তর ঘটেছে, আর তার ফলে তাঁর জীবনদেবতারও পরিবর্তিত রূপ পাওয়া গেল। জীবনদেবতা এখন সৃষ্টি ও লয়ের কর্তা মহাশক্তিধর পুরুষ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০। ১০ অঃ

—হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা)।

শ্রীভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা হলেও তিনি মানবের মত সাধারণ ভাবে কর্ম করেন না। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে প্রাণীমাত্রেই চালিত হয়। তিনি সকলকে যেমন চালান, তারাও ঠিক তেমনই চলে। তিনি যন্ত্রী আর প্রাণী মাত্রেই যন্ত্র। যন্ত্রীর ইচ্ছাতেই যন্ত্র চলে। যন্ত্রের নিজের ইচ্ছায় সে চলতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রীই কর্তা। শ্রীভগবানও তাই গীতায় বলেছেন,—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩। ১১অঃ

তত্ত্বময়ভাবের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতাকে ঠিক উক্ত ভাবেই গ্রহণ করেছেন। শ্রীভগবানরূপী কবির জীবনদেবতা নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি-লয়, জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-জন্মান্তর, রূপ-রূপান্তরের আবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছেন। পরিবর্তনের একটা স্রোত চলেছে নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটছে তার রূপান্তর। এ শুধু ক্ষণিকের নয়; এই আবর্ত অনন্ত কাল ধরে চলেছে

তাঁর ইচ্ছাতে। আর তাই তো সত্য। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই তো সব হয়। তাঁরই ইচ্ছায় আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাপুঞ্জের রূপ ধরছে আবার আবর্তনের স্রোতে তারা কোথায় বুদ্‌বুদের মত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বিরাট কালস্রোতকে উদ্দেশ করে বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতায় কবি তাই বলেছেন,—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে :
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মত।

তাঁকে পাওয়ার জন্যই এই আবর্তন। সৃষ্টির পর লয়, জন্মের পর মৃত্যু, জন্ম-জন্মান্তর, রূপ-রূপান্তর এই তো নিয়ম। তাঁকে পাওয়ার মূলে এই যাত্রা, এই আবর্তন। তাই—

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই—
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণ স্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।

সৃষ্টি-লয়, জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-জন্মান্তর, রূপ-রূপান্তর সেই স্রষ্টার নিয়মাধীন। সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা মুহূর্তের জন্যও ভঙ্গ হয় না। চলা ও থামার মধ্যে একটা

ছন্দ ও মিল আছে, যা' কখনও ভেঙে যায় না। 'বলাকা'র 'জীবন-মরণ' কবিতাতে কবি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

শ্রীভগবানের এই লীলা অনন্ত কাল ধরে চলেছে। নাই এর বিরাম-বিরতি। 'বলাকা'র 'তুমি-আমি,' কবিতায় এর সুন্দর রূপ ফুটিয়েছেন কবি।

যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথায় কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া,
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া॥
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে॥

ব্রহ্ম হতে জীবের সৃষ্টি আবার সেই ব্রহ্মতেই জীব লয় পেয়ে যায়। এই হল ভগবানের লীলা। অনন্ত কাল তাঁর এই লীলা চলেছে। এই অনুভূতিই ব্রহ্মানুভূতি। ব্রহ্মানুভূতিতেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি।

দিবার পশ্চাতে ধরিত্রীর বুকে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। আর সেই সন্ধ্যার সঙ্গে আসে শান্ত নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রকৃতি থাকে যেন স্বপ্নাবিষ্ট। এই অবস্থায় সে প্রকাশ করতে চায় তার মর্মকথা। কিন্তু পারে না প্রকাশ করতে সেই কথা। ব্যর্থতায় গুমরিয়া গুমরিয়া ওঠে সে। বার বার দিনের পর আসে রাত্রি। কিন্তু প্রকৃতি তার মর্মকথা প্রকাশ করতে পারে না। প্রকৃতির এই বার্থতার বেদনা অনুভব করেছেন কবি। 'বলাকা' কবিতায় সেই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন তিনি।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে,
অন্ধকার গিরিতটতলে—
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে পারে না স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥

কিন্তু তার পরেই হংসবলাকার পাখার ঝাপ্টায় প্রকৃতির সেই মর্ম কথাটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল কবির কাছে। শেষ স্তবকে কবি তাই বলেছেন,—

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম, আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে।'

আপন অন্তরে অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরের মানবের বাণী শোনার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি আছে বিশ্বসাহিত্যে তা' অতুলনীয়।

তত্ত্বময়ভাবের সাধনায় বিশ্বমানবের বাণীর মধ্যে কবি তাঁর জীবনদেবতার বাণীই শুনেছেন। সে বাণী শুধু এই মর্ত্যের নয়, সে বাণী মর্ত্য পার হয়ে চলে গেছে 'অন্ত কোথা, অন্ত কোন্ খানে।'

পরিশিষ্ট (ক)

গ্রন্থপঞ্জী (বাঙলা)

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঈশোপনিষৎ—মাধব দাস সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত।

উজ্জ্বল নীলমণি—রূপ গোস্বামী।

ঋগ্‌বেদ।

কড়চা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী।

কড়চা—গোবিন্দদাস কর্মকার।

কড়ি ও কোমল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষ্ণ কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (ডাঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত)।

খেয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌরপদ তরঙ্গিনী—উদ্ধবদাস।

চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ (নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত)।

চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস (মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন দত্ত।

চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।

চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনস্মৃতি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

তন্ত্রের আলো—মহেন্দ্রনাথ সরকার।

ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী—১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন।

বনফুল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়।

বীরাঙ্গনা কাব্য—মধুসূদন দত্ত।

বেণী সংহার—ভট্টনারায়ণ।

বৈষ্ণব পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সম্পাদিত।

বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণম্।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীরূপ গোস্বামী।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাভারত—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত।

মানসী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেঘনাদবধ কাব্য—মধুসূদন দত্ত।

রঘুবংশ—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।

রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র রচনাবলী—শতবার্ষিক সংস্করণ।

রামায়ণ—T. K. Krishnamacharyya-সম্পাদিত।

শাক্ত পদাবলী—অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত।

শ্রীগীতগোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ঐ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ (সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত)।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্—দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন সম্পাদিত।

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত)।

সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী।

সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হরিভক্তি বিলাস—সনাতন গোস্বামী (পুরীদাস সম্পাদিত)।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

[গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত ব্যক্তি, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও স্থান ইত্যাদির সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা।]

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ভ

ম

য

র